তোমারই নাম কর্ণ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৭২ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
দেবদত্ত নন্দী

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বাংলা পুস্তক প্রকাশনার
জগতে দুই কান্ডারী

শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার

ও

শ্রীসুধাংশুশেখর দে

সুহৃদবরেষু

TOMARI NAM KARNA

(A Mythological Novel on Karna's Tragedy of Life

By

Dr. DIPAK CHANDRA

সমালোচনা গ্রন্থ

মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য

বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা

সম্পাদনা

হরিবংশ

মনোজ বসুর রচনাবলী (১-৪)

মনোজ বসুর কবিতা

১

যমুনার ডান পাড় এবং দৃশদ্বতী নদীর বাম পাড়ের মধ্যে অবস্থিত বিশাল প্রান্তর ধু-ধু করছে। কোথাও গাছপালার কোনো চিহ্ন নেই। বালি আর কাঁকরে রাঙানো তৃণশূন্য প্রান্তর অনন্তকাল ধরে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে আছে। খোঁচা খোঁচা কিছু ঘাস অস্তিত্বের সঙ্গে লড়াই করে কোথাও কোথাও টিঁকে আছে। দুই স্রোতস্বিনীর মধ্যবর্তী খোলামেলা দিগন্তবিস্তৃত এই প্রান্তরটি আদর্শ রঙ্গভূমির উপযুক্ত স্থানরূপে নির্বাচিত হলো।

হস্তিনাপুর থেকে জায়গাটির দূরত্ব খুব বেশি নয়। রাজপ্রাসাদের শিখর চূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রান্তরটিকে অশ্বক্ষুরাকৃতি দেখায়। উঁচু সমতলভূমির খাড়া পার ক্রমে ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীর দিকে। নীল বারিরাশির সঙ্গে মিশেছে যেন। দিগন্তের গায়ে মিশে যাওয়া নীল আকাশ আর জংলা ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গেছে তার অস্তিত্ব।

এই প্রান্তরের একটা অতীত আছে। বহু যুদ্ধের সাক্ষী এই প্রান্তর। এর প্রতি ধূলিকণা জানে কত শ্বেতকায় বিদেশী আর্য জাতির সাথে কৃষ্ণকায় এদেশীয় অধিবাসীদের বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে এখানে। এই প্রান্তরের চারপাশে শিবির করে থাকত তারা। আর প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করত। কথিত আছে, সেকালের দৈত্যাকার সেই সব মানুষদের পদভারে এবং অশ্বক্ষুরের চাপে গাছপালা নির্মূল হয়ে গেছে। বহু বীরের রক্তে এ মাটির রঙ লাল হয়ে গেছে। সাদা কালো মানুষের বাইরের খোলস। ভিতরটা সবার সমান রাঙা। লাল মাটি যুগ যুগান্ত ধরে এই কথাটিই যেন বলছে। কিংবদন্তী হলো ; এখানে যুদ্ধ হয়েছে অনেক। কিন্তু প্রতিপক্ষদ্বয়ের কেউ কাউকে হারাতে পারে নি। পরাজয়ের কলংক নিয়ে

কোনো পক্ষই ফিরে যায় নি। বিবাদ-বিদ্বেষ দু'পক্ষ নিজে থেকে মিটিয়ে ফেলে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়েছে। প্রান্তর সম্পর্কে এই লৌকিক গল্পের কথা মনে রেখেই আচার্য দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রকে কৌরব ও পাণ্ডব দুই ভ্রাতৃদ্বয়ের অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষার জন্যে এই স্থানে রঙ্গভূমি গঠনের পরামর্শ দিলো।

রণকুশলী শিল্পী ও স্থপতি দ্বারা স্থানটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করে মহড়ার উপযোগী রঙ্গভূমি নির্মাণ করা হলো। সমগ্র চত্বরটি অনেকগুলি ভাগে ভাগ করা হলো। যুদ্ধ শাস্ত্রানুসারে অস্ত্রাগার, অশ্বশালা, হস্তিশালা, রথাগার, সারথীদের গৃহ, অতিথিদের বাসস্থান, রাজপরিবারের জন্যে গৃহ, দর্শনীয় স্থান প্রভৃতি নির্মাণ করা হলো। গোটা প্রান্তরটা একটা রমণীয় নগরের রূপ গ্রহণ করল। দর্শকদের বসার আসনের সুবন্দোবস্ত করা হলো রঙ্গ-ভূমিতে। সাধারণ দর্শক, অতিথি-অভ্যাগত, রাজপরিবারের আত্মীয়-স্বজন, রাজপুরুষ এবং অন্তঃপুরচারিণী প্রত্যেকের জন্যে পৃথক পৃথক আসন এবং স্থান নির্দিষ্ট করা হলো। মহড়া দর্শনে কারো কোনো ব্যাঘাত না হয় সেজন্যে সর্বস্তরের দর্শকদের আসন উপর থেকে নিচের দিকে ঢালু হয়ে মাটিতে মিশেছে।

আচার্য দ্রোণ রাজকুমাদের অস্ত্রপরীক্ষা সাড়ম্বরে করতে দিকে দিকে দূত পাঠাল। নিমন্ত্রণ ও প্রচার করে যথাসময়ে ফিরল তারা।

কর্ণের কানেও পৌছল সে সংবাদ। কিন্তু বুঝতে পারল না, এত ঘটা করে কৌরব ও পাণ্ডব রাজকুমারদের অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন কী? আচার্য দ্রোণের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার নয়, তবে একটা কিছু ঘটবে রঙ্গ-ভূমিতে।

কর্ণের বয়স এখন পঁচিশ। এই বয়সে কৌতূহলটা একটু বেশি হয়। এক-বার মনে জানার আগ্রহ জাগলে যতক্ষণ নিবৃত্ত না হয় ততক্ষণ থামতে চায় না। মনের ওপর কৌতূহল হিমালয়ের ভার হয়ে চেপে বসল। অনেক পুরনো কথা তার মনে পড়ল। ঘটনা পুরনো হয়ে গেলেও তার দাগ মন থেকে মুছে যায় না। বরং দাগটা ক্ষতের মতো দগ্‌দগ্‌ করে। ভুলতে দেয়

না ক্ষতের কারণটা। অনেককাল আগের সেই ক্ষত দাগটা বুকের ভেতর স্মৃতির দীপ্ জ্বেলে দিলো। চোখের তারায় দেখতে পাচ্ছিল একখানা ছোট্ট সাধারণ রথ বাতাস কেটে সাঁ সাঁ করে ছুটছে। আর, সে রথ চালকের কোল ঘেঁষে বসে অশ্বের লাগাম ধরে আছে। পিছনের আসনে পিতা অধিরথ। তার চোখের দৃষ্টি শূন্য। কেমন বিমর্ষ দেখাচ্ছিল তাকে। দশ বছর আগের একটি দৃশ্য দেখছিল কর্ণ। খুব বেশি দিনের ঘটনা নয় বলেই স্পষ্ট নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল।

তূণ থেকে একটার পর একটা তীর তুলছে কর্ণ, আর ধনুকে জুড়ে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করছে। দূরের একটি গাছের কোটর ছিল তার নিশানা। আশ্চর্য! একটি তীরও তার বাইরে দিয়ে গেল না। সব কটি শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করল। ঠিক ঐ সময় দ্রোণ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে বালকের এ হেন নিশানা দেখে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু বালক নির্বিকার। তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই! নিজের মনে এবং খেয়ালে গাছের গায়ে একটার পর একটা তীর সাজিয়ে লিখল আপন নাম কর্ণ। বিস্ময়ে চমৎকৃত হলো দ্রোণ। মুগ্ধ অভিভূত গলায় ডাকল তুমি কর্ণ
কর্ণ তখন উড়ন্ত শকুনকে বিদ্ধ করার জন্য লক্ষ্য স্থির করছিল। দ্রোণের আচমকা ডাকে সে ঘাড় ফেরাল না। একটুও চমকাল না। কিংবা হাত কেঁপে গেল না। উড়ন্ত শকুন ঠিকই শরবিদ্ধ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। সাফল্যের গৌরব তৃপ্তি নিয়ে কর্ণ মুখ ফেরাল।
অচেনা প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ কেমন একটা অদ্ভুত মুগ্ধতা নিয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। কথা বলার ব্যগ্রতায় ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক। চোখে মুখে উচ্ছল খুশির বন্যা। হাসি হাসি মুখখানিতে স্বর্গের পবিত্রতা।
ব্রাহ্মণ বিস্ময় বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে কর্ণকে দেখছিল। কর্ণ উৎসুক দুটি চোখের সামনে কেমন যেন একটু বিব্রতবোধ করল। ভেতরে প্রবল একটা সংকোচ তাকে লজ্জায় আড়ষ্ট করে রাখল। কয়েকটা মুহূর্ত এইভাবে

কাটার পর অস্ফুট স্বরে বলল : দ্বিজবর আপনি কি আমায় ডাকলেন? আপনাকে তো আমি চিনি না। আগে দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না। অথচ, আপনি আমাকে চেনেন। বোধহয়, জানেনও। এ তো ভারি আশ্চর্য!

দ্রোণ হাসি হাসি মুখ করে বলল : প্রত্যেক মানুষ নিজের পরিচয় নিজে বহন করে। কর্মই মানুষের পরিচয়। তোমার একাগ্রতা আমাকে অভিভূত করেছে। তীর নিক্ষেপের মুন্সিয়ানা দেখে অবাক হয়ে গেছি। গাছের গায়ে সুন্দর হস্তাক্ষরের মতো একটির পর একটি তীর দিয়ে তোমার নাম লিখলে। তাইত জানতে পারলাম, তুমি কর্ণ। তোমার গুরু কে?

কর্ণ গর্বিত কণ্ঠে শুধাল—পিতা অধিরথ।

চম্পাপুরীর এক সামন্ত রাজা অধিরথ আমার অনুরাগী এবং শিষ্য। তুমি কি তার পুত্র?

কর্ণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকল। অস্ফুট স্বরে বলল: আপনি আচার্য দ্রোণ। আমার কী সৌভাগ্য! চরণ ধূলি দিয়ে ধন্য করুন।

অধিরথের কাছে তোমার গল্প শুনেছি।

আচার্য আমার খুব ইচ্ছে আপনার কাছে অস্ত্রবিদ্যা শেখা। ঈশ্বরের বোধ হয় সেরকম ইচ্ছা। আপনি আমায় কৃপা করুন।

বালকের ব্যাকুলতা দ্রোণের অন্তরে স্নেহ সঞ্চার করল। প্রণত কর্ণের মাথায় স্নেহের হাত রাখল। বলল : ঈশ্বরের আশীর্বাদ তুমি পেয়েছ। তোমাকে করুণা করার কে আমি? তুমি নিজেই কৃতী সন্তান। গুরুর প্রয়োজন তোমার কতটুকু? বৎস, কেউ কাউকে কিছুতে শেখাতে পারে না। শিক্ষার্থী নিজের চেষ্টায়, অধ্যবসায় নিজেই শেখে। গুরু কেবল মাঝখান থেকে বাহবা পায়।

কাঁচুমাচু মুখ করে কর্ণ দ্রোণের দিকে চেয়ে রইল। দুই চোখে নিবিড় ব্যথা ঘনিয়ে উঠল। ধরা গলায় অস্ফুট স্বরে বলল : সামান্য সারথীর পুত্র আমি, অনুনয়ের শুধু আছে অধিকার। আপনি রাজগুরু! রাজার সারথী পুত্র যদি প্রার্থনা করে সামান্য দান, সে কি পূরণ করা খুবই কষ্টের?

দ্রোণ কয়েকমুহূর্ত কী যেন গভীরভাবে চিন্তা করল। তারপরে আস্তে আস্তে বলল : বৎস, তুমি শিষ্য হলে আমিও আনন্দিত হব। কিন্তু বড় ভয় করি নিজেকে। ভীষণ ভয়।

কর্ণের ভুরু কুঞ্চিত হলো। সবিস্ময়ে উচ্চারণ করল : ভয়। কার ভয়? কিসের ভয়?

দ্রোণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল : বৎস, মনকে দেখার কোনো দর্পণ নেই। সেরকম কোনো দর্পণ থাকলে দেখতে পেতে আমার এ বুকে কত দুঃখ, অনুতাপ, অনুশোচনা জমে আছে। আমার অপরাধ, অবিচার, নিষ্ঠুরতাকে আমিই পারি না ক্ষমা করতে। নিষ্ঠুর অপরাধের গ্লানিতে মন আমার ভারাক্রান্ত। এ গ্লানি কোনোদিন কাটবে না আর! চাঁদের কলঙ্কের মতো লেগে থাকবে আমার সকল কর্মে।

দ্রোণের কোনো কথাই বুঝতে পারল না কর্ণ। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকল। কেমন এক অবুঝ অসহায়তা তার দুই চোখে। বলল : আচার্য, আমাকে শিষ্য করতে আপনার অসুবিধের কোনো কারণ বুঝি না।

দ্রোণ একটু বিব্রতভাবে বলল : আমার অসুবিধেটা কোথায়, তোমাকে বোঝানোর নয়। একান্তই আমার। সত্যিই তোমার জন্যে সময় দেওয়াটা কঠিন।

আচার্য, রাজকুমারদের অনুশীলন দেখেই আমি শিখে নেব। ঠিক পারব।

কর্ণের আগ্রহ দ্রোণকে মুশকিলে ফেলল। বিব্রতভাবে বলল : কর্ণ, তুমি অবুঝ হয়ো না। তোমার মতো এক বালক অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে আমাকেই তার গুরু করল। অথচ, আমি তার কিছু জানলাম না। পাছে প্রত্যাখ্যান করি, তাই নিজের কুল ও বংশ পরিচয়ের কথা ভেবে আমার সাথে সাক্ষাৎ করল না। কিন্তু আমার বিগ্রহ স্থাপন করে গুরুরূপে নিত্য পূজা করত। আমার মর্মর মূর্তির সামনেই অনুশীলন করত। নিজের চেষ্টায় ঐ বয়সেই একজন বড় যোদ্ধা ও তীরন্দাজ হয়ে উঠল। আমার শিষ্যদের ভেতর নিষাদ পুত্রের সমকক্ষ কেউ ছিল না। তবু তার জন্যে একটু গর্ব

হলো না। আচার্য হয়ে অকুণ্ঠচিত্তে তার কৃতিত্বকে প্রশংসা করতে পারলাম না। সামান্য সৌজন্যটুকু দেখাতে ভুলে গেলাম।

উদাস বিষণ্ণ চোখ দুটিকে দিগন্তের দিকে প্রসারিত করে দ্রোণ কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে রইল। আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল : জান, তার অস্ত্রশিক্ষার জন্যে আমাকে কিছুই করতে হয় নি। তার শেখা বিদ্যায় আমার কোনো অবদান নেই। নিজের চেষ্টায় সে কৃতী হয়েছে। তবু এ কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করল না। নিজের অর্জিত বিদ্যা গুরুর পায়ে অঞ্জলি দিলো।

কর্ণ আর ধৈর্য ধরতে পারল না। সরল বালকের মতো বলল : আমার সব শেখা বিদ্যা আপনার পায়ে অর্পণ করলাম। কথাগুলো বলেই সে দ্রোণের পা স্পর্শ করল।

দ্রোণ মুহূর্তে কেমন হয়ে গেল। মনটা ভীষণভাবে নাড়া খেল। বুকের ভেতরে প্রবল একটা অস্বস্তিতে সে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল। কয়েক বছর আগের একটা দৃশ্য তার চোখের তারায় ভাসছিল। নিষাদ যুবক একলব্য মাটিতে দু'হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বসে আছে, আর তার শান্ত স্নিগ্ধ মুগ্ধ দুটি চোখের নিবিড় চাহনি দ্রোণের চোখের ওপর স্থির। মুখে প্রসন্ন হাসির আভা। আর দ্রোণ দু'আঁখি রক্তজবা করে চেয়ে আছে তার দিকে। দ্রোণের চোখে আগুন জ্বলছিল। একলব্যের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

কৃষ্ণাঙ্গ যুবক একলব্যকে শিষ্য বলে স্বীকার করতে দ্রোণের আর্যত্বের অভিমানে লাগল। তার অগোচরে একলব্যের এভাবে শিষ্য হওয়ার স্পর্ধাটা সহ্য হলো না। তার নাম গৌরব ও খ্যাতি নিয়ে এক নিষাদ যুবক তার বীর্যাবর্তের ভাবমূর্তি গড়ছে এই স্পর্ধা এবং ধৃষ্টতাকে দ্রোণ মার্জনা করতে পারল না। হৃদয়টা সহসা তার কঠিন হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণের ক্ষমা, দয়া বলে কিছু ছিল না অন্তরে। ক্ষাত্রতেজের দম্ভে, ক্রোধে, তার ভেতরটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। কণ্ঠস্বর গেল বদলে। আচরণটা আর ব্রাহ্মণের মতো

গুরুর মতো থাকল না। কঠিন গলায় ভর্ৎসনা করে বলল : যুবক, তোমার অস্ত্রশিক্ষার গুরুদক্ষিণা কি দেবে ?

নিষাদ যুবক অকম্পিত স্বরে বলল : গুরু আমার ধ্যান, জ্ঞান, মন্ত্র। আমার যা কিছু, সবই তাঁর কৃপায় পাওয়া। গুরুকে আমার অদেয় কিছু নেই। এমন কি এই তুচ্ছ জীবনটা গুরুর সেবায় উৎসর্গ করতে পারি।

দ্রোণের অধরে বিচিত্র হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। ভীষণ নিষ্ঠুর দেখাল তাকে। মনে মনে বলল : নিষাদ বালক কপট বিনয় দেখিয়ে তুমি মন ভেজাতে পারবে না। তারপর একলব্যের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘাতকের মতো বলল : তোমার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলটি গুরু দক্ষিণা চাইলে দিতে পারবে ?

যুবক কথা বলল না। নিঃশব্দে হাসল। তারপরেই এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। একবার দ্রোণের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ধারাল তীরের ফলা দিয়ে অক্লেশে নিজের হাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি ছিন্ন করে দ্রোণের পদতলে রাখল। রক্তে রাঙা হয়ে গেল মাটি। তবু যুবকের মুখে একটুও বিকৃতি নেই। যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন নেই। মুখে অনির্বচনীয় হাসি। যুবকের দুঃসাহস এবং গুরুভক্তি দেখে দ্রোণ হতবাক হলো। হৃদয় অনুশোচনায় ভরে গেল। ক্রোধের বশে সে এ কী করল। নিষাদ যুবকের বাকী জীবনটার কথা ভেবে তার ভেতরটা শিউরে উঠল। অনুতাপের জ্বালাটা বুকের তলায় তুষের আগুনের মতো জ্বলতে লাগল। একটি মানুষের স্বার্থের জন্যে, তার সুখ ও সন্তোষের জন্যে নিজের মনের আগোচরে একটা বড় অপরাধ করল।

কর্ণের ডাকে দ্রোণ সম্বিৎ পেল। ঘোর লাগা কেমন একটা আচ্ছন্নতায় তার দুই চোখ থমথম করছিল। কর্ণের মুখের ওপর নির্লিপ্তভাবে চেয়ে রইল। নিজের মনেই আস্তে আস্তে বলল : বৎস, আমি গুরুর মতো আচরণ করতে পারি নি তার সাথে। নিজেকে তাই আমি বিশ্বাস করতে ভয় পাই। এই ভয়ের জন্যে তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই।

কর্ণ হতাশ গলায় বলল : আচার্য, আমাকে নিরাশ করলে কি আপনার

খুব সুখ হবে।
আমার মনস্তাপ আর বাড়িয়ো না।
আচার্য, আপনার দয়া পেলে আমি এক অন্য কর্ণ হতে পারতাম। কিন্তু আপনার নিষ্ঠুরতা আমাকে নিষাদ যুবকের মতো নিস্ফলের হতাশার দলে রাখবে। এতে আপনার কষ্ট হবে না।
দ্রোণ সহসা বিব্রত বোধ করল। বলল : বৎস, আমাকে দুর্বল করে দিও না। একটু ভাবার অবসর দাও।
দ্রোণের মনের ভেতর অন্য এক প্রতিকূল স্রোত যে তার দিকেই বইতে শুরু করেছিল বালক হলেও কর্ণ তা অনুভব করতে পারল। দ্রোণের হন্তদন্ত হয়ে চলে যাওয়ার দৃশ্যটা তার মনে গেঁথে রইল। নিরাশ হওয়ার আপাত দুঃখে তাকে ভীষণ বিমর্ষ লাগল। বুকের ভেতর থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো। নিজেকে বড় একা আর অসহায় মনে হলো। বেঁচে থাকাটাই তার কাছে নিরর্থক হয়ে গেছে। ব্যর্থ হয়ে বাঁচার মতো কষ্ট আর নেই। সেই কষ্টটা কর্ণ অন্তরে প্রথম অনুভব করল।

অধিরথ একদিন কর্ণকে নিয়ে দ্রোণের আশ্রমে হাজির হলো। সেদিনটা কর্ণের স্পষ্ট মনে আছে। উল্লাস-উত্তেজনায় বুকটা সাগরের মতো উদ্বেলিত হলো। কল্পনায় কত অসম্ভব সব চিন্তা করল। নিজের স্বপ্নের মধ্যে কর্ণ এমন মজে ছিল যে রথ দ্রোণের আশ্রমে কখন পৌঁছল টের পেল না। অধিরথের ডাকে সে চমকাল! নিশি পাওয়া মানুষের মতো কেমন একটা আচ্ছন্নতা নিয়ে রথ থেকে নামল। গাছপালা ঢাকা ছায়াবৃত আশ্রমের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল।
অস্ত্রশিক্ষার অনুশীলন চলছিল তখন। রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদে শোভিত হয়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণের নির্দেশ মতো লক্ষ্য বিদ্ধ করছিল, কেউ অন্য যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে তার প্রয়োগ কৌশল শিখছিল। কর্ণের স্নায়ুতে স্নায়ুতে উত্তেজনার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। ভেতরটা উতরোল হলো অস্ত্রের ঝনঝনায়।

কেবল একজন শিক্ষার্থী কর্ণের দৃষ্টি কেড়ে নিল। নিজের কাছে তার বিস্মিত জিজ্ঞাসা : কে ঐ অদ্ভুত দর্শনীয় রাজকুমার ? ও কে ?

মুগ্ধ বিস্ময়ে অপলক চেয়ে রইল কর্ণ। মনে হলো, ঐ শিক্ষার্থী শর নিক্ষেপ করছে না, শরবৃষ্টি করছে। বাতাস অধীর হয়ে যেন ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। সূর্যের আলো পড়ে তীরের ফলাগুলি ঝকঝক করছে। মনে হচ্ছিল সাদা বকের মতো মেঘের গায়ে গা ভাসিয়ে তীরগুলো উড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদেই তীরগুলো আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মতো টপ টপ করে দ্রোণের চারপাশে পড়তে লাগল। দ্রোণকে ঘিরে একটি বৃত্ত তৈরি হলো। আশ্চর্য একটি শরও দ্রোণকে স্পর্শ করল না। আর দ্রোণ এক গভীর তৃপ্তি সুখের মধ্যে ডুবে গিয়ে যেন দু'চোখ বুজল।

কর্ণ এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হলো। মনে হলো, এ বিদ্যার কাছে তার শিক্ষা কিছু নয়। নিজেকে তার বড় দীন মনে হলো। অপলক দু'চোখে তার মুগ্ধ বিস্ময় থমথম করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর অস্ফুট স্বরে ফিসফিস করে অধিরথকে প্রশ্ন করল : পিতা ওই রাজপুত্র কে ?

অধিরথ বলল : উনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। আচার্য দ্রোণের সবচেয়ে প্রিয়-তম শিষ্য। পাছে অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ হয় তাই আচার্যের তীক্ষ্ণ নজর তার প্রতি। একবার এক কৃষ্ণকায় নিষাদ যুবকের শৌর্য-বীর্য, কৃতিত্ব আচার্যের চিন্তার কারণ হলো। পাছে ওই যুবক অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় তাই তার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি গুরুদক্ষিণা নিলেন। বৃদ্ধাঙ্গুলি গেলে তীরন্দাজের থাকল কি ?

কর্ণ আশ্রম সংলগ্ন রঙ্গভূমির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল : আচার্য বোধহয় এঁর কথাই আমাকে বলতে চেয়েছিলেন। একটা দুর্লভ প্রতিভাকে হত্যা করার জন্যে তিনি কিন্তু অনুতপ্ত।

তথাপি, অর্জুনের ওপরে কারো স্থান নেই।

কর্ণ বলল : থাকার কথাও নয়। অর্জুন, অর্জুনই। তার বিকল্প বোধহয় সত্যি হয় না। তবু অর্জুন হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

আচার্যের কথা শুনে মনে হয়েছে, তোমার ভেতর তিনি প্রতিভার সন্ধান পেয়েছেন। নইলে কেন বললেন, অধিরথ আমার একটু দাক্ষিণ্য পেলে কারো প্রতিভা যদি সূর্যের মতো দীপ্ত হয়, তাহলে নিষ্ঠুর কালো মেঘের মতো তার দীপ্তিটুকু আড়াল করে দিয়ে আমি কি সুখী হব ভাবছ? প্রতিভার সমাদর করা এবং তার গৌরব বাড়ানো একজন আচার্যের কর্তব্য। তোমার পুত্রকে তালিম দিলে একদিন সে কিছু করতে পারে। তুমি তাকে নিয়ে এস। আজ তোমার সেই সৌভাগ্যের দিন।

পিতা, আমার মনের ভেতর আগের সেই আশ্চর্য আনন্দ, আর উৎফুল্ল ভাবটা আর নেই। কেবলই মনে হচ্ছে একটা কিছু ঘটবে আমার জীবনে।

অধিরথ কিছু না বুঝেই হঠাৎ উৎফুল্ল হলো। বলল : ঘটবে বলেই তো এখানে আসা।

বনান্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে ওরা নিজেদের মধ্যে নিম্নস্বরে কথা বলছিল। কর্ণ হতাশ গলায় বলল : পিতা। মনের সব উৎসাহ হঠাৎ নিভে গেল।

অধিরথ বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। বলল : তার মানে? ও-সব মনের ব্যাপার। নতুন জায়গায় এলে অমন ভয় ভাব সবার থাকে।

আমি ভয় পাইনি। ভয় বলে আমার কিছু নেই। কেবল মনের ভেতর কোনো সাড়া পাচ্ছি না। অর্জুনের জন্যে আচার্য একলব্যের মাতা বিরল ভক্তের ডান হাতের আঙুল যখন গুরু দক্ষিণা গ্রহণ করেন, তখন তাঁর কাছে শেখার কিছু থাকে না। তিনি কখনই আমাকে অর্জুনের সমকক্ষ কিংবা তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে দেবেন না।

এ তোমার অকারণ আশংকা। সূর্যের মতো তোমার অফুরন্ত তেজকে ধরে রাখা কিংবা গোপন করার সাধ্য কারো নেই। ভগবানেরও না। আমি তাঁর ভীষণ কাছের মানুষ। তোমার প্রতি সতর্ক যত্ন ও দৃষ্টি অবশ্যই তাঁর থাকবে।

পিতা কারো অনুগ্রহে বড় কিছু পাওয়া যায় না। চিত্তের দৈন্যে শক্তি ক্ষয় হয়। আত্মদৈন্যও এক ধরনের মৃত্যু।

হাসল অধিরথ। বলল : পুত্র, আচার্যের অন্তঃকরণে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। একলব্যের সঙ্গে যা করেছেন তা আর কারো সাথে হবে না এ আমি হলপ করে বলতে পারি। সুস্থ প্রতিযোগিতার এক বাতাবরণ তৈরি করা তাঁর উদ্দেশ্য। গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের বিক্রম ভীম অপেক্ষা বেশি। ধনুর্বিদ্যায় অর্জুনের সমকক্ষ সে নয় কিন্তু যুধিষ্ঠির এবং অন্য পাণ্ডবদের তুলনায় সে অনেক বেশি কৃতী। পুত্র, প্রত্যেকের গ্রহণ ক্ষমতা কিংবা দক্ষতা একরকম হয় না। কিছু পার্থক্য থেকে যায়। সেজন্যে গুরুর কোনো দোষ নেই। তাছাড়া যে ভালো এবং কৃতী তার প্রতি একটু বেশি টান থাকা কোনো অন্যায় নয়। এজন্যে গুরুকে পক্ষপাতিত্বের অপবাদ দেওয়াও ঠিক নয়। তুমি অকারণে সংশয় করছ। চল, আমরা আচার্যের সাথে দেখা করি। তাহলেই তোমার ভয় দূর হবে। ভ্রান্তি কাটবে।

আশ্রমের নতুন পরিবেশে কর্ণ নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিল না। এখানে তাকে দিনযাপনের পরীক্ষা দিতে হচ্ছিল প্রতিদিন। রাজপুত্রদের সঙ্গে একটা আশ্চর্য দূরত্ব রক্ষা করে চলতে হয় তাকে। অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার বেলাতেও ছিল এই দূরত্ব। আচার্যের কাছে আসার জন্যে সে আরো বেশি অনুশীলনে মন দিলো। খুব দ্রুত সাফল্য এবং দক্ষতাকে বাড়িয়ে তুলল। তবু দ্রোণের কাছে পৌছনো গেল না। পাহাড় যে দূরে সেই দূরে রয়ে গেল। কর্ণ নিজেকে প্রবোধ দিলো। পাহাড় কবে কাছে আসে? সে যেখানে থাকে, সেখানেই থাকে। কিন্তু যে কাছে যেতে চায় তাকেই এগোতে হয়। তাকেও যেতে হলো। আচার্য দ্রোণের ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণের মধ্যে পাহাড়ের মতো একটা অমোঘ হাতছানি আছে। সেই আকর্ষণটা যে ঠিক কি কর্ণ ভালো বোঝেও না। তবু তার একটা প্রভাব আছে মনে। সেটুকুই তার কাছে যথেষ্ট। একটা নতুন জায়গায় নিজের স্থান করে নিতে একটু সময় লাগে। অনেক পরীক্ষা দিতে হয়, মানিয়ে নিতে হয়। তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। কর্ণ ঐ বয়সে এই সত্য অনুধাবন করল। বাস্তব অবস্থা

আর পরিবেশ থেকে মানুষ শেখে। সেই শেখাটাই খাঁটি। অবোধ মনকে এই-ভাবেই প্রতিদিন প্রবোধ দিয়ে নিজে অভিমান মুক্ত হতো। অনাহূত হয়ে আচার্য দ্রোণের কাছে যায়, তাঁর নির্দেশ প্রার্থনা করে। তাঁর পরামর্শ নেয়। দ্রোণ নিজে থেকে কখনও তাকে কিছু দেয় নি, কিংবা করে নি। প্রবল বাসনার তাগিদেই সে নিজের মতো কাজ করে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে আচার্যের অনুমতি নিয়ে রাজকুমারদের সঙ্গে অনুশীলন করত। পরীক্ষা দিত এবং বেশ সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতো। কর্ণ বেশ বুঝতে পারত তার মধ্যে এক অনন্ত সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে। তবু আচার্য তাকে একটু সমাদর করল না। তাঁর এই অনাদর উপেক্ষা তাকে তীরের মধ্যে বিদ্ধ করে। নিজেকে বড় বঞ্চিত আর দুর্ভাগা মনে হয়। অপমানের তাপে ফর্সা মুখখানা রাঙা হয়ে যায়। আগুনের মতো গনগন করে।

মাঝে মাঝে তার মনের ভেতর প্রবল ঝড় ওঠে। পিতা অধিরথের কথাগুলো তখন অশান্ত মনের নানাবিধ প্রতিক্রিয়ার একমাত্র সান্ত্বনার বাণী হয়ে তার মনের অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। 'বৎস! তুমি শিক্ষার্থী হয়ে এসেছ এখানে। শেখার জন্যে অনেক মূল্য দিতে হয়। ধৈর্য, নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা, অধ্যবসায়, আগ্রহ, এ সবের পরীক্ষা প্রতি মুহূর্ত শিক্ষার্থীকে দিতে হয়। এ নিয়ে শিক্ষার্থীর কোনো মান-অভিমান থাকা উচিত নয়। এখন তোমার অনুশীলনের কাল। এ-সময় একে আচার্যের অবহেলা কিংবা ঔদাসীন্য বলে মনে করবে না কখনও। এ তোমার বিনয়ের পরীক্ষা, আগ্রহের পরীক্ষা। বৎস, এই সব পরীক্ষার একটা মূল্য আছে। জীবনের ক্রমবিকাশের পক্ষে অনেক কিছুই অপরিহার্যভাবে মানুষের জীবনে আসে। আগে থাকতে তার সবটা বোঝা যায় না। বাহ্যতঃ তার কোনো মানে থাকে না। তবু জীবন বিকাশের সোপান তারা। সোপানকে বাদ দিয়ে কি আর ওপরে ওঠা যায়? পুত্র, অবুঝ হবে না কখনও। কোনো অবস্থাতেই বেশী উতলা হয়ে পড় না। মনে রাখবে, জীবনের সব কিছুরই একটা মানে আছে, প্রয়োজন আছে। গাছেরা নিঃশব্দে মাটির মধ্যে শেকড় চারিয়ে দেয় নিজের অস্তিত্বকে

শক্ত আর মজবুত করে ধরে রাখার জন্যে। কিন্তু গাছ মাটির অভ্যন্তরের শেকড়ের সেই রহস্যের খোঁজ রাখে না। তেমনি মানব জীবন বিকাশের শেকড় সারা জীবনময়। তার চারপাশের পরিবেশ, অবস্থার মধ্যে সে শাখা প্রশাখা মেলে দিচ্ছে নানাভাবে তুমি আমি তার খোঁজ রাখি কি? অথচ গাছের শেকড়ের মতোই অদৃষ্ট নিভৃতে এবং নিঃশব্দে তোমাকে মেলে ধরার জন্যে তার শেকড় ছড়িয়ে যাচ্ছে জীবন বিকাশের মাটির নীচে। আমরা কেউ তা দেখতে পাচ্ছি না। আশ্চর্যের কথা তার শেকড়ের রস নিয়ে আমাদের ইচ্ছে-গুলো, সাধগুলো সব পরিপুষ্ট হয়; পূর্ণতা পায়। সুতরাং খোলা মনে স্রোতের শেওলা হয়ে অনন্তগতির সাথে ভেসে যাও। ভাসতে ভাসতেই একদিন সাগরে পৌঁছে যাবে। অনন্ত চলাই জীবনের পরিণাম! তাই বলি, কী পেলে আর পেলে না তার হিসাব কর না। পাওয়া, না পাওয়া দুটোই ভাগ্যের দান বলে মেনে নাও। মনে রেখো তুমি ঘুমোলেও তোমার ভাগ্য ঘুমোয় না। ভাগ্য জেগে থাকে। কালচক্রের মতো সুখ দুঃখের চক্রে নিয়ত আবর্তিত হচ্ছে তার জীবন। তাই কোনো জীবনেই চিরস্থায়ী দুঃখ কিংবা চিরস্থায়ী সুখ বলে কিছু নেই। সুখ-দুঃখ, হাসি, কান্নার ভেলায় আমরা ভেসে চলেছি অবিরাম।'

অধিরথের কথাগুলো তার বুকের ভেতর সব জমানো অভিমান, দুঃখ গলিয়ে দিত। যত দিন যেতে লাগল কর্ণ কেমন বদলে যেতে লাগল। মুখে কঠিন ব্রত ও কর্তব্য পালনের দায়িত্বের গাম্ভীর্য এঁটে বসল। সেই গাম্ভীর্যের সঙ্গে সাফল্যের এক ধরনের দুর্বোধ্য প্রত্যয় তৃপ্তিও মিশে রইল।

একটা একটা করে বছর ঘুরে গেল অনেকগুলো। কিন্তু কর্ণ দ্রোণের মনো-ভাব বদলাতে পারল না। চেষ্টা করেও তার মনের নাগাল পেল না। মনের অনেকখানি অর্জুন জুড়ে ছিল সন্দেহ নেই। কর্ণের হাজার সাফল্যে ও কৃতিত্বে সে আসন নড়বার নয়। শক্তিমান বিধাতারও বোধহয় নাড়া-নোর শক্তি নেই।

অর্জুন সম্পর্কে আচার্যের অদ্ভুত দুর্বলতার কথা সব শিক্ষার্থীই জানে।

কিন্তু এই দুর্বলতার উৎস কোথায় কেউ জানে না। আচার্য পুত্র অশ্বত্থামাও নয়। সেজন্যে অশ্বত্থামার মনে নিয়ত ক্ষোভ ছিল। পিতার ঔদাসীন্য এবং অবহেলার জন্যে সে শুধু অর্জুনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারল না, এই দুঃখটা কিছুতে ভুলতে পারে না। অথচ, পিতার একটু দাক্ষিণ্য পেলে সে হতো আচার্যের সব শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। শুধু অর্জুন তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। কিন্তু এ জন্যে অর্জুন নয়, পিতাই অপরাধী। কোনো পিতা পুত্রের প্রতি এ রকম বিমাতৃসুলভ আচরণ করে না। পুত্রের সাফল্য এবং কৃতিত্বের চেয়ে শিষ্যের স্বার্থ যে কোনো পিতার কাছে বড় হতে পারে এটা জানা ছিল না অশ্বত্থামার। অর্জুনকে তুষ্ট করার জন্যে পিতা তার মনের দরজায় খিল এঁটে পুত্রকেও বঞ্চিত করল। অর্জুন নিশ্চয়ই কোনো যাদু জানে। তাই পিতাকে পুত্রের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। অশ্বত্থামা বুঝে নিয়েছিল অর্জুন তার পথের কাঁটা, একমাত্র শত্রু। অর্জুনের প্রতি অশ্বত্থামার বিদ্বেষ ক্ষোভ যত বাড়তে লাগল ততই বুকের ভেতর ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠল। অর্জুনের মতো হতে না পারার জ্বালা তাকে প্রবল অর্জুন বিদ্বেষী করল। শুধু অশ্বত্থামা নয়, সব শিক্ষার্থীই অর্জুনকে ঈর্ষা করে। আর সেজন্য দায়ী আচার্য নিজেই।

কর্ণের অন্তরেও অর্জুনকে নিয়ে নানা বিপরীতমুখী মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। কিন্তু সকলের ঊর্ধ্বে ছিল আপন পৌরুষের প্রতি তার প্রবল আস্থা। কর্ণ ভাগ্য মানে না। ব্যক্তি নিজেই তার ভাগ্যের স্রষ্টা। ভাগ্য নিয়ে কেউ জন্মায় না, ভাগ্য মানুষ তার কর্মফল দিয়ে তৈরি করে। যে যেমন কর্ম করে তার ভাগ্য তেমন হয়। কর্ণের কাছে ভাগ্য দুর্বলের আত্মসান্ত্বনা। তাই কোনো হীনমন্যতায় কর্ণের অন্তর ক্লিষ্ট হয় নি। ঈর্ষার বৃশ্চিক জ্বালায় কখনও অস্থির হয় নি তার চিত্ত। আচার্য দ্রোণের শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র কর্ণ ই অর্জুনকে কোনো ঈর্ষা করত না। কারণ তার মনে হতো ঈর্ষা একমাত্র সমকক্ষেরই শোভা পায়। তাই, দ্রোণের অর্জুন প্রীতি নিয়ে কোনোদিন তার মাথাব্যথা ছিল না। বরং, আচার্যের এই সমাদর লাভের যোগ্য বলে

মনে হয়েছে অর্জুনকে। একে আচার্যের পক্ষপাতিত্ব বলে মনে হয় নি তার। অন্য শিষ্যদের সম্মুখে দ্রোণ অর্জুনের কৃতিত্বের প্রশংসা করে কার্যতঃ তাদের উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন।

কর্ণের এই সব যুক্তি ও প্রবোধের কড়া সমালোচক আচার্যপুত্র অশ্বত্থামা। কর্ণের নিস্পৃহ, নিরাসক্ত মনোভাব অশ্বত্থামাকে মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত করে তুলত। আর তখনই রেগে গিয়ে বলত : অর্জুনের প্রতি পিতার দুর্বলতার কোনো অর্থ বুঝি না। পাছে অর্জুন অসন্তুষ্ট হয় তাই আলাদা করে আমাকে অস্ত্রবিদ্যা শেখানো বন্ধ করে দিলো। পুত্রের প্রতি পিতার দুর্বলতা ও স্নেহ-টুকু সে কেড়ে নিল। পিতার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে রাত্রদিন ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে লেপ্টে থাকত। আমার সঙ্গে পিতার ব্যবধান গেল বেড়ে। পিতাপুত্রের মধ্যে একটা প্রাচীরের মতো সে দাঁড়িয়ে রইল। অর্জুনের এই শত্রুতার অর্থ বুঝি না। আর তুমি প্রতিদিন চোখের উপর সব দেখছ, জানছ, তবু পিতা এবং অর্জুনের স্তুতি করছ। পিতা হয়েছেন বলেই তাঁর কোনো দোষ নেই, তিনি যা করছেন ঠিক করছেন এরকম ভাবার কোনো মানে নেই। যা সত্য তা বলার অধিকার সকলের আছে। ছোট-বড় এই পার্থক্য থাকবে কেন?

কর্ণ মৃদু হেসে বলল : তবু বলব, আচার্যের চাওয়াটা সত্যি তোমরা কেউ বুঝতে চাওনি। আমার মর্মের গভীরে তাঁর মনের কথাটা টের পাই।

অশ্বত্থামা ভুরু কুঁচকে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বলল : তোমার ভাবের কথা শুনতে ভালো লাগে না।

দুর্যোধন ব্যঙ্গ করে বলল : কর্ণ, তোমার জন্যে আমার করুণা হয়। নতুন এসেছ, তাই এখানকার অনেক কিছুই জান না। লোভীর মতো স্বপ্ন দেখছ। ভাবছ, স্তুতি করে আচার্যের কৃপাধন্য হবে। অর্জুন থাকতে তোমার সে আশা পূর্ণ হবে না। গুরু যখনই বুঝবেন তুমি অর্জুনের প্রতিপক্ষ এবং তার স্থান গ্রহণ করতে চাইছ অমনি ছিন্নবস্ত্রের মতো তোমাকে পরিত্যাগ করবে। নিজপুত্রের প্রতিভাকে যিনি অর্জুনের স্বার্থে বলি দিতে পারেন

তাঁর কাছে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করা মরীচিকা মাত্র।
কর্ণের অধরে পূর্ববৎ সেই মধুর হাসিটি লেগেছিল। বলল : বন্ধু, একজন মানুষের মনের কথাটা বুঝতে গেলে গভীরে যেতে হয়। তার জন্যে চাই সময়, যুক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ, নিরপেক্ষ বিচার। ক্রোধের বশে, কিংবা পূর্বধারণা নিয়ে আচার্যের উদ্দেশ্য তোমরা বুঝবে না। আসলে আমাদের এই বয়সে উত্তেজনা ভালো লাগে। উত্তেজনার তাপে গা সেঁকে নেওয়ার একটা আলাদা আমেজ আছে।
অশ্বত্থামা বলল : পাছে পিতা তোমাকে আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে বলে তাই তুমি সত্য বলতে ভয় পাচ্ছ। চাটুকারিতা করে তুমি তার মনোরঞ্জন করছ। কিন্তু তাতে তোমার কোনো আশাই পূর্ণ হবে না। বন্ধু, পুত্র হয়ে আমি যা আদায় করতে পারিনি, তুমি তা পারবে, ভুলেও মনে স্থান দিও না। তাতে দুঃখ পাবে।
দুর্যোধন বলল: তোমার সঙ্গে আচার্যের বোঝাপড়ার দিন খুব বেশি বাকি নেই। অর্জুনের সঙ্গে তোমার প্রচ্ছন্ন রেষারেষির ব্যাপারটা আর গোপন নেই। অর্জুন ঈর্ষা না করলেও তুমি তো তার চেয়ে বড় হতে চাও। এটাই তোমার অপরাধ। একদিন এই ভুলের দাম দিতে হবে। যে কোনো দিন তৈরি থেক।
কর্ণ তবু হাসে। নির্ভয়ে বলল : তোমরা আমাকে দুর্বল করতে পারবে না। তোষামোদ কিংবা চাটুকারিতা করে কোনো কিছুই পাওয়া যায় না। নিজের আত্মদৈন্যই শুধু প্রকাশ পায়। অন্যের চোখে নিজেকে ছোট করে কোনো কাজ কখনো করব না। তবে, আচার্যের প্রতি আমার একটা অন্যরকম শ্রদ্ধা আছে। কেন জানি না, আমার মনে হয়, শিক্ষার্থীদের মনের অভ্যন্তরে প্রতিযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজটি বপন করার জন্যে তিনি জেনে-শুনে পারস্পরিক রেষারেষির একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করছেন। আর এজন্যে অর্জুনকে আদর্শ শিক্ষার্থীরূপে বেছে নিয়েছেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে দ্রুত যোগ্যতা বাড়িয়ে তুলুক, সাফল্য অর্জন করুক.

দক্ষতার ব্যবধান কমিয়ে আনুক এটাই বোধহয় আমাদের কাছে তাঁর একমাত্র চাওয়া। তাঁর সব শিক্ষার্থী এক একজন অর্জুন হয়ে উঠুক এটাই তাঁর চাওয়া।

সেদিন দুর্যোধন খুব হেসেছিল। তার সেই অদ্ভুত হাসির শব্দটি কানে লেগে রইল। একা থাকলে হাসির সেই ধ্বনি শুনতে পায়। সংশয় বাড়ে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকে মন। নানাবিধ মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়া ঘটতে থাকে বুকের অভ্যন্তরে।

একদিন তার সব ধারণা মিথ্যে করে দিয়ে দ্রোণ বলল বৎস, অনেকদিন ধরেই কথাটা বলব বলব করে বলা হয়ে ওঠে না। আজ তোমাকে বলার সময় এসেছে। তুমি যেভাবে দ্রুত সব বিদ্যা আয়ত্ত করলে তাতে আমি অবাক হয়ে গেছি। তোমাকে আমার আর কিছু শেখানোর নেই।

কথাটা কর্ণের কানে তীরের ফলার মতো বিঁধল। আহত অভিমানে তার বুকটা টনটন করতে লাগল। আচার্য সম্পর্কে মহৎ অনুভূতিগুলি তখনই কাঁচের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হলো। কিন্তু শান্ত নিরুদ্বেগ চিত্তে কর্ণ তার মনের অভ্যন্তরের তুফানকে শাসনে রাখল। শান্তভাবে বলল . আচার্য আমার কোনো আচরণে কি ক্ষুব্ধ হয়েছেন ?

দ্রোণ ভুরু কুঁচকে কর্ণের দিকে চেয়ে রইল। বলল তুমি লোভী। বড় তাড়াতাড়ি সব পেতে চাও। তোমার ব্রহ্মাস্ত্র বিদ্যা শিক্ষার অভিলাষ আমাকে বিচলিত করছে।

আচার্য কোনো মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে প্রার্থনা করিনি। মানুষের জীবনটা বড় ছোট। বিধাতার মতো অনন্ত সময় তার নেই। তাই জীবনের সব পাওয়া তাড়াতাড়ি করতে চাই। অপেক্ষা করা মানেই পিছিয়ে পড়া শুধু।

পাছে অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র বিদ্যা শিখে নেয়, তাই গোপনে তুমি আমার কাছে এসেছ।

আচার্য সত্যের অপলাপ সহ্য হয় না। অর্জুন ও আমার অস্ত্রপরীক্ষা কোনোদিন হয় নি। উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তার যাচাইয়ের একটা প্রার্থনা করে-

ছিলাম শুধু। পরীক্ষায় যে বড় এবং শ্রেষ্ঠ হবে তাকেই আপনি ব্রহ্মাস্ত্র বিদ্যা-শেখান, এই ছিল প্রার্থনা। এতে আমার অন্যায় কি হলো ? অকুণ্ঠ প্রার্থনা ও অভিলাষ ব্যক্ত করা যদি অপরাধ হয়, তা-হলে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

তার কোনো প্রয়োজন হবে না।

জানতাম। অর্জুনের শিক্ষা ব্যাপারে আচার্যের কোনো কুণ্ঠা নেই। তার প্রার্থনাও অপরাধ নয়! আমার ছোট্ট মিনতি আচার্যকে বিরূপ করে। এটাই আশ্চর্য কথা। আরো অদ্ভুত হলো, আমার সব শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে আচার্য আমাকে আশ্রম ছাড়তে বলছেন।

দ্রোণ শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল: সকলের জন্যে সব বিদ্যা নয়। বিশেষ বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে যোগ্যতা ও গুণ আবশ্যক তা সবার সমান থাকে না। যেমন, দিব্যাস্ত্র বিদ্যার শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ধীর, স্থির সংযত চিত্তের হতে হবে। ঈর্ষা, ক্রোধ, অসন্তোষ, অসহিষ্ণুতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা এবং বিচারবোধ যার ভেতর আছে, কেবল তার এই শিক্ষা গ্রহণের অধিকার আছে। আশ্রমের শিক্ষার্থীদের ভেতর একমাত্র অর্জুনের উক্ত গুণগুলি আছে।

কর্ণের অধরে বিচিত্র হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। বলল: অর্জুন আচার্যের নয়নমণি। তার প্রতি আপনার অগাধ স্নেহ কারো অবিদিত নয়। অর্জুনের গুরুকৃপার ভাগ্য ভালো, মানে, যশে, গৌরবে, শ্রেষ্ঠত্বে অর্জুনের চেয়ে কেউ বড় হোক এটা আচার্য কোনোদিন চায় নি। এ কথাটা অন্যেরা জানলেও আমি বিশ্বাস করতাম না। আজ আমার ভুল ভাঙল। বিশ্বাস হারানোর দুঃসহ কষ্টে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে।

কর্ণ তোমার দুঃখের কোনো হেতু নেই। ধনুর্বিদ্যায় অর্জুনের পরেই তোমার স্থান। এত বড় সাফল্যের পরেও এই পরিতাপ তোমার শোভা পায় না।

আচার্য, একে আমার সাফল্য মনে করি না। অর্জুনকে যখন ছাড়িয়ে যেতে পারব তখনই বলব সফল হলাম। আমার প্রত্যাশা পূর্ণ হলো।

দ্রোণ ভুরু কুঁচকে গলা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে বিরক্তি প্রকাশ

করে বলল : হুম্। অর্জুনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টাও করলে, পেরেছ কি ?

আচার্য, একটু চাইলে বা যত্ন নিলে আমি, অশ্বত্থামা এবং আরো অনেকেই অর্জুনের সমকক্ষ হতে পারতাম। কিন্তু—

দ্রোণের ভেতরটা একটু চমকাল। বলল : এ তোমার ঈর্ষার কথা।

ঈর্ষা করে কি লাভ ? ঈর্ষায় কেউ কিছু পায় না। অতৃপ্তির সুতীব্র জ্বালা ভোগ করতে হয় শুধু। তাতে নিজের কষ্ট এবং দুঃখটাই বাড়ে। ওতে আমার আগ্রহ নেই। আমি চাই জয়। বিরাট সাফল্য। অর্জুন আমার উদ্দীপনা। আমার বুকে কেউ যদি প্রেরণার দীপ জ্বালিয়ে থাকে সে অর্জুন। ঈর্ষা করে দীপ নিভিয়ে অন্ধকার গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়ানো কোনো মানে হয় না।

মানুষ নিজেকে খুব সামান্যই চেনে। অন্তরের গভীরে কোন্ স্রোত বইছে ওপর দেখে তো তার পরিমাপ হয় না।

আচার্য, আমাকে মার্জনা করবেন। মানুষ নিজের অজান্তে তার মনের অভ্যন্তরের গভীর কথাটা হঠাৎ-ই প্রকাশ করে ফেলে। নিজের সংকট দিয়ে অন্যের সমস্যাকে বিচার করার প্রবণতা মানুষের চিরকালের। নিজের মনের আয়নায় অন্যের মুখ দেখতে পায় বলেই অজান্তে জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে।

দ্রোণ ক্রুদ্ধ হলো। মুখখানা তার আগুনের মতো গন গন করতে লাগল। একটা অসহ্য উত্তাপে তার ভেতরটাও তপ্ত হয়ে উঠল। রুক্ষ কণ্ঠে বলল : তোমার স্পর্ধা আমাকে অবাক করছে।

আচার্য, আবার মার্জনা ভিক্ষা করে বলি, সত্যকে সত্য বলাটা স্পর্ধা নয়। অর্জুন আমার সমকক্ষ নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীও নয়। যোগ্যতার বিচারে কে বড় ছোট তার পরীক্ষা আমাদের কোনোদিন হইনি। আপনার আশীর্বাদ পেলে অর্জুনের চেয়ে অনেক বড় হতে পারি আমি।

দ্রোণ অপলক চোখে কর্ণের দিকে চেয়ে রইল। মনে মনে তারিফ করল তাকে। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। বিস্ময়টা নিজের অজান্তেই কটাক্ষপাতে

পরিণত হলো। বিদ্রূপ করে বলল : বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাওয়া মানুষের স্বভাব। তুমি নিজেকে বড় বেশী কৃতী মনে কর। এই অহংকার তুমি ত্যাগ কর।

আচার্য, আপনি বলেছেন, আমিত্বের সম্যক উপলব্ধিকে সোঽহম্ বলে। আমিত্ব অহংকার নয়, আত্মোপলব্ধি। আমিত্ব মানে আত্মশক্তির বিকাশ ও অভ্যুদয়।

অপমানে দ্রোণের চোখ মুখ রাঙা হলো : কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠস্বরে বিরক্তি এবং অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল। বলল : তর্ক করা তোমার স্বভাব। নিজের সম্পর্কে তোমার প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী করে,কিন্তু তুমি, যত দিন যাচ্ছে দাম্ভিক এবং দুর্বিনীত হচ্ছ। তোমাকে এ আশ্রমে রাখা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

আচার্য এ পর্যন্ত আমার আচরণ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ আপনার মুখে শুনিনি। জীবনের এক সৎকর্ম মুহূর্তে আমার বিনয় সম্পর্কে আপনার সংশয় ও কটাক্ষপাত আমাকে মর্মাহত করছে। অথচ, কিছুদিন আগেই এক তাপস বালকের মস্তক আঘাত করে বলেছিলেন, কর্ণের মতো নির্ভীক এবং বিনয়ী হও। আপনি বলেছেন বিনয় চরিত্রের মাধুর্য, ব্যক্তিত্বের অলংকার। বিনয় মানে আত্মদীন হওয়া নয়। বিনয় হলো ব্যক্তিত্বের শান্ত এবং নম্র প্রকাশ। বিনয় হলো ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্য এবং গর্ব হলো তার অহং। সম্যক জাগার অন্য নাম অহং।

কর্ণের মুখের ওপর দ্রোণের দু'চোখ স্থির হয়ে রইল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল। আত্ম প্রত্যয়ের আবেগে তার দুই চোখ জ্বল জ্বল করছিল। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অহং'র অহংকার যুক্ত না হলে তারুণ্যের দীপ্তি খোলে না। সত্তার সঙ্গে গর্ব এবং আত্মোপলব্ধি, পৌরুষ যুক্ত হলে সে যে কত সুন্দর হয় কর্ণের মধ্যে দ্রোণ তাকে প্রথম দেখল। দেখে শ্রদ্ধা হলো। একটা আলাদা আকর্ষণ সে আদায় করে নিল। নিজের মর্যাদা এবং গৌরব রক্ষার প্রশ্নে কর্ণ যা বলল তার ভেতর সত্যি কোনো দম্ভ ছিল না। সত্তার বিনীত মহিমা তার

ব্যক্তিত্বকে জ্যোতির্ময় করে রেখেছিল। দ্রোণ সহসা কথা খুঁজে পেল না। যুগপৎ মুগ্ধতা এবং তীব্র অসহিষ্ণুতায় তার ভেতরটা অশান্ত হয়ে উঠল। মুখ চোখ পাথরের মতো স্তব্ধ ও নিশ্চল। নিস্পৃহ গলায় বলল: আমার মন এখন ভালো নেই। তুমি যাও।

কর্ণ যেতে যেতে দ্বারের কাছে থমকে দাঁড়াল। নিঃশব্দ হাসি তার অধর প্রান্তে লেগে রইল। কিছুক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। থমথমে গলায় বলল: আচার্য, আমার আচরণ যদি আপনাকে ক্ষুব্ধ করে থাকে তা হলে মার্জনা করে আমাকে অপরাধ মুক্ত করবেন। আপনার কাছে আমার অনেক প্রত্যাশা। অনেক শেখার এখনও বাকি। আপনার করুণা পেলে আমি এক অন্য একলব্য, এক অন্য অর্জুন হতে পারি। আপনার নিষ্ঠুর অবহেলা পেলে আমি শুধু ক্ষয় হয়ে যাব, ধ্বংস হয়ে যাব। কর্ণের মৃত্যু হবে। আমাকে খুব হতাশ হতে দেখলে কিংবা আমার প্রতিভার মৃত্যু দেখলে আপনার কি সুখ হবে? একবারও কি অন্তর অনুতাপে বিদ্ধ করবে না? একলব্যের মতো কর্ণকে মনে পড়বে না? এতদিনের সব স্মৃতি মুছে যাবে?

দ্রোণ নীরব। জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে নিশ্চল অন্ধকার। দ্রোণ কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। ঘরে দীপ জ্বলছিল। কর্ণের ছায়াটা দীর্ঘ হয়ে দ্রোণকে ছাড়িয়ে জানলার বাইরে গিয়ে পড়ল।

কর্ণ কয়েকটা মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। উত্তরের প্রতীক্ষা করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল: আচার্য, চলে যাব বলে আসি নি। এমন করে মাথা হেঁট করে চলে যাওয়াটা বড় অপমানের, ভীষণ যন্ত্রণার। গুরু-শিষ্যর মধুর পবিত্র সম্পর্কের ফাঁকটুকু একটা তিক্ত ঘটনার স্মৃতি দিয়ে ভরা থাকার মতো আত্মগ্লানি আর কিছু নেই।

দ্রোণের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। প্রস্তরীভূত হয়ে গেছিল। দ্রোণ যদি কর্ণের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে দেখতে পেত দ্রোণের দু'চোখের কোণ বেয়ে মুক্তোর মতো নিটোল অশ্রুবিন্দু তার গণ্ডদেশে গড়িয়ে পড়ছে।

পাছে কর্ণ তার দুর্বলতা টের পেয়ে যায় তাই সে নড়ল না। কোনো সাড়া দিলো না।
কর্ণ বেশ একটা অপমান নিয়ে দ্রোণের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। দু'ফোঁটা জলবিন্দু গুরুর আশীর্বাদের মতো ঝরে পড়ল তার পিঠে। তাতেই ভেতরটা কেঁপে গেল। মনে হলো, বুকের ভেতর কী যেন সব গলে গেল। হঠাৎই কর্ণ তার পায়ের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। চোখের জলে দ্রোণের পা দুটো ভিজে গেল।
দ্রোণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ভেজা গলায় বলল : পুরুষ মানুষকে ভেঙে পড়তে নেই। সব রকম প্রতিকূল অবস্থা জয় করতে হয় পুরুষকে।
কথাগুলো শুনে কর্ণ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বুকটা আশংকায়, আশায় কাঁপছিল। এরকম নির্লিপ্ত এবং উদাসভাবে দ্রোণের কথা বলার একটাই অর্থ হয়। আর সে অর্থ কর্ণের কাছে অস্পষ্ট নয়। তাই বুকটা হঠাৎ এমন নিথর হয়ে গেল।
খুব অল্পক্ষণের জন্যে সে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর নিজের মনে বলল, যেখানে সহানুভূতি নেই, বিচার বিবেচনা নেই, আছে নিষ্ঠুর পক্ষপাতিত্ব আর নিষ্করুণ বঞ্চনা, সেখানে মানুষের করুণা চাওয়া বড় অপমানের। তাই কোনো কথা না বলে সে দ্রোণের কুটির থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো। খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াতে বড় মুক্ত লাগল। ভীষণ হাল্কা বোধ হলো। নিজের ভেতর যে নিত্যকালের মানুষটা আছে এই মুহূর্তে কর্ণের কাছে তা পরম মূল্যবান হয়ে উঠল।
চারদিকে ঘর কালো অন্ধকারে মোড়া। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না কেবল আকাশের তারারা উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। গভীর প্রত্যাশা নিয়ে। পথ ভোলাদের পথ দেখানোর জন্যে হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে ধ্রুবতারা। এই অনুভূতিটা কর্ণের বুক প্লাবিত করে গেল। অমনি মুক্তির উল্লাসে তার ভেতরটা গান গেয়ে উঠল। এই আকাশে আমার মুক্তি তারায় তারায়।

কর্ণ সে রাত্রি ঘুমোতে পারল না। চিন্তার দ্বন্দ্ব তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। তপোবনের চত্বরে একা অস্থিরভাবে পায়-চারি করতে লাগল। তার চিন্তিত মুখেররেখায় আত্মজিজ্ঞাসার তীক্ষ্ণতা। নিজেকেই প্রশ্ন করল : তবে কি ভুল করলাম ? আচার্যের কাছে ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার অভিলাষ ব্যক্ত করে কি ঠিক করি নি ? আরও একটু প্রতীক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু সময় কোথায় ? মানুষের জীবনে সময় বড় কম। এক জীবনে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন তার পূরণ করে যেতে হয়। সব কিছু যে তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারে সে লাভবান হয়। শুধু এই ভেবেই দিব্যাস্ত্র বিদ্যা শিক্ষার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল। আচার্যের ক্ষুব্ধ হওয়ার মতো কিছুই বলে নি।

বার বার ভাবতে চেষ্টা করল কর্ণ, সত্যিই কি বড় লোভী সে ? প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হতে আচার্যকে মনের কথাটা অকপটে বলা বোধ হয় ঠিক হয় নি ? ঈশ্বর জানেন, তার আবেদনে অর্জুনের প্রতি কোনো বিদ্বেষ ছিল না। ত্রিভুবনে অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা প্রতিপক্ষ তাঁর হাত দিয়ে তৈরী হোক আচার্য কোনোদিনই তা চান না। আচার্যের এক অদ্ভুত চিন্তাধারা ? অর্জুনের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব বড় দৃষ্টিকটু শিক্ষার্থীদের প্রতি কোনো আচার্যেরই এরকম বৈষম্য থাকা উচিত নয়। আচার্য হলেও, কর্ণ বলতে বাধ্য, কাজটা আদৌ ভালো করেন নি তিনি।

কিন্তু কোনো চিন্তাই তার মনে স্থায়ী হলো না। যুক্তির স্রোতে ভেসে গেল চিন্তা প্রবাহ। কর্ণের সামনে কালপুরুষের, বীরপুরুষের মতো রণং দেহি মূর্তি দাঁড়িয়ে। অসংখ্য নক্ষত্র পুঞ্জের মধ্যে সে একা নির্ভয়ে গোটা আকাশটাকে শাসন করছে। তার নির্ভীক, দৃপ্ত ভঙ্গিমাটি কর্ণের ভীষণ ভালো লাগল। অপলক চোখে সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হলো, প্রতিকূল অবস্থা নির্ভয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি প্রত্যেকের অভ্যন্তরে থাকে। কারো সাহায্যে নয়, তার নিজেকেই একা সেই শক্তি জাগাতে হয়। নিজের অভ্যন্তরের যে শক্তির কথা যে জানে না, জীবন সংগ্রামে সে বাঁচতে শেখে নি।

প্রতিকূল অবস্থাকে যে নিজের চেষ্টায় জয় করতে শেখে না তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। কথাগুলি তার বুকের ভেতর ঢেউ দিয়ে গেল। কাল-পুরুষকে ঘিরেই তার চিন্তাটা পাক খেতে লাগল।

২

মেলায় যেমন লোকে দল বেঁধে ছোট তেমনি হস্তিনাপুরের রাজাদের অস্ত্র প্রদর্শনী দেখতে বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল। লোকে লোকারণ্য হলো রঙ্গভূমি। তিলঠাঁই জায়গা রইল না।

নানারঙের সুদৃশ্য পতাকায়, বাহারী পত্রে পল্লবে এবং পুষ্পে পথ এবং রঙ্গভূমি সজ্জিত করা হলো। সুদৃশ্য চন্দ্রাতপে ঢাকা হলো দর্শকদের আসন। পুষ্প, চন্দন, অগুরু নির্যাস এবং ধূপের গন্ধে গোটা রঙ্গস্থল হলো সুবাসিত। মৃদু মৃদু বাদ্যযন্ত্র বাজছিল। তার সুমিষ্ট শব্দে কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে রইল দর্শক। তবু কথার বিরাম ছিল না। কোলাহল থেমে ছিল না। শুভ ক্রিয়া কর্ম ও আচার অনুষ্ঠান করতে যত বিলম্ব হচ্ছিল ততই ব্যগ্র ও কৌতূহলী দর্শকের উত্তেজনা বাড়ছিল।

আমন্ত্রিত রাজা এবং তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরাও প্রদর্শনীতে উপস্থিত হলো। সকলের মনে একটা প্রশ্ন বারংবার উঁকি দিতে লাগল, কৌরব ও পাণ্ডব রাজপুত্রদের অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষাকে সর্বজন সমক্ষে টেনে এনে তাকে প্রদর্শন করে তোলার সার্থকতা কোথায়? কূটবুদ্ধির গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেল তাদের বাস্তব বিশ্লেষণ। তবু একটা সন্দেহ অনেকটা মনে ঝুলে রইল। দুটি পরিবারের আভ্যন্তরীণ কলহ বিবাদ গৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বোধ হয় আর আঁটছে না। তাই অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষার মতো একটা নিয়মমাফিক ব্যাপারকে কেন্দ্র করে তা বাইরে বেরিয়ে পড়ল। প্রদর্শনীর খোলা ময়দানে গৃহ বিবাদের জের টেনে এনে তাকে একটা রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হলো এখানকার দেখার ঘটনা। দুই পরিবারই এই প্রদর্শনীকে সামনে রেখে একটা রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে চাইছে এ নিয়ে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের

মধ্যে বিস্তর গবেষণা হলো। কিন্তু কেউ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না। তবে, একটা ব্যাপার সকলের কাছে পরিষ্কার যে, পাণ্ডব ও কৌরবদের গৃহ বিবাদের ওপর কে কিরকম নজর রাখছে এবং কার কি ধরনের আগ্রহ সেটুকু এই প্রদর্শনী থেকে টের পাওয়া সম্ভব হবে। এ-ছাড়া রাজকুমারদের যোগ্যতা, দক্ষতা, সমর কুশলতা বিচার করে কোন্ রাজা কার পক্ষ অবলম্বন করবে, ভবিষ্যতে এবং কে কাকে সমর্থন করবে এই প্রদর্শনী থেকে তার একটা নির্ভুল হিসেব পাওয়া ভীষ্ম, শকুনি, বিদুর, দ্রোণের মতো ব্যক্তিদের কিছু কঠিন কাজ নয়। সম্ভবতঃ সেরকম কোনো গোপন সংকল্প নিয়ে উদ্যোক্তারা একটা কিছু করতে চাইছে এটা স্পষ্ট।

কোলাহল, আলোচনা, গল্প, থেমে থাকল না।

সহসা বিশাল শিঙা ধ্বনি হলো। অমনি গোটা প্রাঙ্গন ঘিরে দাঁড়ানো পুরনারীরা একসাথে শঙ্খধ্বনি করল। গুর্ গুর্ করে মেঘ ডাকার মতো দুন্দুভি বেজে উঠল। মানুষের কলরব, কোলাহল চাপা পড়ে গেল উদ্দাম বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কারের তলায়।

কোলাহল থেমে গেল। দর্শকবৃন্দ উদগ্রীব হয়ে চেয়ে রইল রঙ্গভূমির ক্রীড়াস্থলের দিকে। সেখানে একটি বিশাল মঞ্চের ওপর বসে আছে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহারাণী গান্ধারী, পাণ্ডু পত্নী কুন্তী, দেবব্রত, বিদুর, আচার্য দ্রোণ এবং কৃপাচার্য। মঞ্চের আসন থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন আচার্য দ্রোণ। পরিধানে তার রক্তবর্ণের পট্টবস্ত্র। গায়ে লাল উত্তরীয়, গলায় পুষ্পমাল্য, ললাটে চন্দনের তিলক। আচার্য মঞ্চের সম্মুখভাগে এগিয়ে এসে সমাগত দর্শককুলকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। তারপর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসন থেকে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন। এ রণাঙ্গন সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত। বীরত্ব প্রদর্শন করে, যে কেউ শ্রেষ্ঠ বীরের শিরোপা গ্রহণ করতে পারে। এ রণাঙ্গন কারো প্রাকার অধিকৃত নয়। শুধুমাত্র রাজকুমারেরা অস্ত্র প্রদর্শন দেখাবে না যে কোনো ক্ষত্রিয় বীর, অকুণ্ঠচিত্তে অস্ত্র প্রদর্শনীতে রাজকুমারদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করে নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে দর্শক-

দের পরিতৃপ্ত করুক এবং পুরস্কার গ্রহণ করুক এটাই তাদের কাছে আমাদের সকলের একমাত্র চাওয়া।

জনতা ও দর্শকবৃন্দ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জয়ধ্বনি দিলো।

এহেন ঘোষণায় অবাক হলো। বিদুর। চমকে উঠল আচার্য দ্রোণ। পাছে আশাভঙ্গে ছাই হয়ে যাওয়া মুখখানা কেউ দেখে ফেলে তাই কুন্তী মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে মুখ ঢাকল। বিশিষ্ট দর্শকের আসনে উপবিষ্ট নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ যারা কৌরব ও পাণ্ডবের পারিবারিক বিবাদ ও কলহের রাজনৈতিক পিরণতি দেখতে এসেছিল তারাও হতাশ হলো হঠাৎ। ধৃতরাষ্ট্রের ঘোষণার ফলে, প্রতিযোগিতা এখন আর কৌরব ও পাণ্ডব রাজপুত্রদের মধ্যে সীমা-বদ্ধ রইল না। প্রতিযোগিতা হলো অবাধ এবং উন্মুক্ত। এর সঙ্গে দুটি পরিবারের মধ্যে মর্যাদা লড়াইয়ের আর কোনো সম্পর্ক থাকল না।

দর্শকের আসনে উপবিষ্ট কর্ণের মনে কোথায় যেন একটা সংশয়ের কাঁটা বিঁধে রইল। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। সাধারণ দর্শকদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে সে দ্রোণকে দেখছিল। ভেতরে উদ্বিগ্ন অস্থিরতাকে আচার্য দ্রোণ কিছুতে গোপন করতে পারছিল না। ব্যস্ত দুটি চোখ দর্শকদের মধ্যে কাকে যেন ভীষণ খুঁজছিল। অনেকক্ষণ খুঁজল।

উচ্চরবে শিঙা বাজছিল। দুন্দুভির নির্ঘোষে রঙ্গভূমি গমগম করতে লাগল। রক্তের মধ্যে আহ্বানের সাড়া পড়ে গেল প্রতিযোগিবৃন্দের। বুকের ধুক্-ধুক্ শব্দ যেন দামামা হয়ে বাজতে লাগল। একে একে অশ্বপৃষ্ঠে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে পাণ্ডব ও কৌরব রাজকুমারেরা প্রবেশ করল। দর্শকদের উল্লাসে এবং জয়ধ্বনিতে রঙ্গভূমি উত্তাল হলো। প্রতিযোগিদের শিরায় শিরায় রক্তের উষ্ণ প্রস্রবণ বয়ে গেল। তাদের সুকুমার লাবণ্যদীপ্ত মুখশ্রীর রঙ সহসা বদলে গেল। চোখের মণি দুটি প্রতিদ্বিন্দ্বিতায় ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল।

আরম্ভ হলো রাজকুমারদের অস্ত্র প্রদর্শনীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

ঘোষণা যাই হোক, অস্ত্র পরীক্ষার প্রদর্শনী হচ্ছিল মূলতঃ কৌরব ও পাণ্ডব রাজকুমারদের মধ্যে। ঘোষণা থাকলেও বহিরাগতদের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগই ছিল না।

কর্ণ তন্ময় হয়ে দেখছিল। অর্জুনের কলাকৌশল প্রদর্শন সত্যিই অভূতপূর্ব। তার দু'আঁখিতে লেগে রইল সেই দৃশ্য। নিজের অজান্তে বারংবার মনে হতে লাগল অর্জুনকে সর্বজনসমক্ষে শ্রেষ্ঠ-অস্ত্রধরের শিরোপা দেবার উদ্দেশ্যেই আচার্য দ্রোণ অস্ত্র পরীক্ষার এক অভিনব প্রদর্শনী করেছে। অর্জুন সম্পর্কে আচার্যের চিরন্তন পক্ষপাতিত্বের কথা মনে হলে তার বুকের ভেতর ঝড় ওঠে। একদিন অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার আশংকায় তাকে গুরুগৃহ ত্যাগ করতে হয়েছিল। মনে মনে শপথ করেছিল অর্জুনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ফিরবে। তার সব গর্ব খর্ব করে শান্ত হবে সে। কিন্তু সেই সুযোগ তার জীবনে কোনোদিন আসবে কিনা জানত না কর্ণ। তবু অর্জুনই তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়ে দেবার সংকল্প নিয়ে সে বন, নদী, পাহাড় অতিক্রম করে মহেন্দ্রগিরি পর্বতে পৌছল। অস্ত্রকুলগুরু আচার্য পরশুরামের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে বলল : অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা অভিলাষী আমি। দেহ শিক্ষা গুরুদেব।

পরম কৌতুকে পরশুরাম তার দিকে অপলক চেয়ে রইল। ঠোঁটের কোণে টেপা হাসি। সস্নেহে বললেন : বৎস, কে তুমি? অকুণ্ঠ আত্মপ্রত্যয় নিজের অভিলাষকে এমন অকপটে নির্ভয়ে প্রথম দর্শনে কেউ কখনো বলে নি। কোথা থেকে পেলে এই অধিকার?

কর্ণ আপাতত মরিয়া। বুকে তার অফুরন্ত সাহস। মনে প্রত্যয়। কণ্ঠে গদগদ ভাব। বলল : পিতা মনে প্রাণে আপনি আমার গুরু। আমি ভাবি। এই তিন অক্ষরের শব্দের মধ্যে কি জাদু আছে জানি না। নিজেকে ভার্গব মনে করলে গুরুর কৃপা এবং শক্তি আমাকে ভর করে। আমি ভার্গব হয়ে যাই। সেই আমার পরিচয়, আমার অধিকার।

পরশুরামের ভেতরটা চমকাল। অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ দুটি চোখ মেলে চেয়ে

থাকল তার দিকে। অধরে মৃদু হাসি। বুকের ভেতর তার কী যেন গলে গলে পড়তে লাগল। যার নাম বাৎসল্য। সস্নেহে বলল : পুত্র, কোথা হতে এসে তুমি আমাকে নিবিড় মমতায় আবিষ্ট করে দিলে ? তুমি কি মায়াবী ? কী নাম তোমার ?

বুকের ভেতর পরশুরামের স্নেহনিষিক্ত কণ্ঠস্বর মন্ত্রের মতো গুঞ্জরিত হতে লাগল, বলল : পিতা, কর্ণ নাম আমার। অধিরথ পুত্র আমি।

পুত্র, বৃদ্ধ আমি। সব অস্ত্র দান করে নিঃস্ব হয়ে গেছি। দেবার মতো কোনো অস্ত্র আমার নেই।

পিতা অস্ত্র ভিক্ষায় আসি নি। আপনার সর্বশেষ অস্ত্রটি আচার্য দ্রোণ পেয়েছেন সেও জানি। অস্ত্র নেই সত্য, কিন্তু আপনার শেখা বিদ্যা শেষ হয়ে যায় নি। একমাত্র বিদ্যাই দানে ক্ষয় হয় না, দিয়েও নিঃশেষ হয় না। আমি সেই বিদ্যাশিক্ষাভিলাষী। আপনি শুধু কৃপা করে সেই বিদ্যা আমাকে দান করুন।

কর্ণের কথা শুনে ক্ষণকালের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল পরশুরাম। তারপর পরমস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে বলল : পুত্র, তোমার মধ্যে আমি একটা আগুন দেখতে পেয়েছি। মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করছে তার তেজ। একদিন তোমার মতো আমারও বুকে আগুন ছিল। সেই আগুনের তাপে একুশবার পৃথিবী ধ্বংস হয়েছে। তবু তার তীব্র জ্বালা মেটে নি। প্রতিহিংসার আগুন সহজে নেভে না। তাই তোমাকে নিবৃত্ত হতে বলছি।

পিতা, সত্য গোপন করার কোনো ইচ্ছে নেই। বঞ্চনার অপমান, আর সত্যের অপলাপ সইতে পারছি না। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ছলনা, মিথ্যা, পক্ষপাতিত্ব দিয়ে ঢাকা একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চাই। প্রতিবাদ প্রতিহিংসা নয়। আচার্যের বিদ্যায় সকল শিক্ষার্থীর সমান অধিকার। সেখানে একজন নিষাদ বালকের সঙ্গে রাজকুমারের কোনো ভেদ নেই। কিন্তু সেই ভেদ যখন কেউ করে তখন বিরোধ বেধে উঠে। বিভেদের অন্তঃস্রোতে মনের স্বস্তি শান্তি নষ্ট হয়। আচার্য দ্রোণের পক্ষপাতিত্বের ফলেই অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে

আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সামর্থ্যের সংঘাত বেধেছে। এর নিষ্পত্তি চাই। অর্জুনের প্রবল প্রতিপক্ষ হওয়ার সংকল্প নিয়েই এখানে এসেছি।

পরশুরাম কর্ণের কথা শুনে হাসল। বলল : পুত্র, তুমি বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী, সৎ-প্রকৃতির। তোমার সারল্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই। মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে তোমার। ঈশ্বরের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যেই আমার শরণাপন্ন হয়েছ। তোমার মতো প্রত্যয়বান, শক্তিধর শিক্ষার্থী পেলে আমিও খুশি হব।

তন্ময়তার মধ্যে কথাগুলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে দূরাগত শব্দের মতো কর্ণের মনের অভ্যন্তরে প্রতিভাসিত হয়ে মিলিয়ে গেল। রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে গেল তার উন্মাদনা। আর কেমন একটা অসহিষ্ণুতায় তার ভেতরটা অস্থির হলো। জনতার উল্লাসিত চিৎকারে কর্ণ সহসা চমকে উঠল। রণস্থলের মধ্যস্থলে অর্জুনের শালপ্রাংশুর মতো দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহটা মত্ত মাতঙ্গের মতো গোটা রণস্থলী দাবড়ে বেড়াতে লাগল। আপন পরাক্রমের সে একাই প্রদর্শক। তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ঈর্ষায়, আক্রোশে কর্ণের মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। তীব্র উত্তেজনায় তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল। একটা তীব্র অহিষ্ণুতা ধীরে ধীরে তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে আগুনের স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ল। বাতাসের স্বরে কে যেন মনের ভেতর কথা বলল : পুত্র তুমি যে এখানে এসেছ সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই রণস্থলে তোমার ও অর্জুনের প্রতিযোগিতার পথ খুলে রেখেছে। এই সুযোগের অপব্যবহার করলে সারা জীবন পস্তাতে হবে তোমাকে। প্রচ্ছন্ন থাকারও তোমার কোনো যুক্তি নেই। তোমার মতো পুরুষকারে বিশ্বাসী পুরুষের জন্যে এই রণস্থল অপেক্ষা করছে। ওঠ, অভিমানী পুত্র আমার!

কর্ণ চমকাল। অবদমিত কামনা বাসনার গভীর গহন থেকে উঠে আসা তার মনের অভ্যন্তরের কথাগুলো যেন ভার্গবের কণ্ঠস্বর হয়ে ছড়িয়ে পড়ল তার কর্ণকুহরে। এ তার বিবেকের নির্দেশ। গুরুর আদেশ। ঈশ্বরের অভিলাষ।

কর্ণের স্নায়ুতে অশান্ত উত্তেজনা ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ল। শরীরের মধ্যে অসুরের মতো এক ভয়ংকর শক্তি অনুভব করল। বিরাট পুরুষকার নিয়ে জনতার মধ্যে বিপুল রোষে সে উঠে দাঁড়াল। দুচোখে তার আগুন ঠিকরে বেরোতে লাগল। দেহ থেকে সূর্যের মতো দীপ্ত পৌরুষের তেজ নির্গত হতে লাগল। মুহূর্তে জনতার নজর কেড়ে নিল। সমস্ত শক্তি কণ্ঠে সংহত করে জনতার আসন থেকেই অর্জুনের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণবাক্যে বলল : স্তব্ধ হও অর্জুন।

রণস্থল হঠাৎ কর্ণের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল। অর্জুন থমকে তাকাল। কর্ণকে রণস্থলের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয় সে। কোথা থেকে ধূমকেতুর মতো এলো কর্ণ? তার আকস্মিক আগমনে অর্জুন কিছুটা বিচলিত এবং বিব্রত। কর্ণ এসব কিছুই দেখছিল না। অর্জুনের জ্বলন্ত দুই চোখে চেয়ে সে বলতে বলতে রণস্থলী অতিক্রম করতে লাগল। বলল : তোমার ফাঁকা বীরত্বের প্রদর্শন বন্ধ কর। ওতে চমক আছে কিন্তু শিক্ষার কোনো স্বাক্ষর নেই। প্রদর্শনীর নামে প্রহসন করছ। কুশলী অস্ত্রবিদ্‌রা তোমার ক্রিয়াকলাপ দেখে হাসছে। তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশি কৃতিত্বের অধিকারী। জনতাই শ্রেষ্ঠত্বের যাচাই করুন।

কর্ণ নিমেষে রণস্থলী পার হলো।

চোখের পলক পড়তে যে সময় লাগে সেই সময়ের ভেতর একটা ওলোট-পালোট ঘটে গেল। আচার্য দ্রোণকে প্রণাম করে কর্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানাল। বলল : মহারাজের অনুমতি হলে সর্বজনসমক্ষে এর চেয়ে উত্তম অস্ত্র চালনার কলাকৌশল প্রদর্শন করতে পারি। আমাকে শুধু একবার সুযোগ দেওয়া হোক। এই রণস্থলের অগণিত দর্শক আর আপনারাই তার বিচার করবেন। তীব্র আবেগে আর উত্তেজনায় তার অবশিষ্ট কথাগুলো আর বলা হলো না।

কর্ণের সুন্দর মুখখানা আত্মপ্রত্যয়ের আবেগে জ্বলজ্বল করতে লাগল। চমকে উঠল দ্রোণ। ভয়ে বিস্ময়ে বিদুর শিউরে উঠল। ভীষ্ম আশ্চর্য হলো।

আর ধৃতরাষ্ট্র তার কথা শুনে চমৎকৃত ও উৎফুল্ল হলো। কেবল অর্জুন অবিচলিত। অনিন্দ্য সুন্দর স্মিত হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হলো।
দর্শকের সারিতে তখন থমথমে স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। উৎফুল্ল কৌতূহল নিয়ে তারা পরবর্তী ঘটনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। অপলক চোখে কর্ণের পেশীবহুল দীপ্ত গৌরবর্ণ চেহারার দিকে চেয়ে রইল। তার সাহস আর নির্ভীকতার বাহবা দিলো।
ধৃতরাষ্ট্র কিছু বলার আগেই আচার্য কৃপ কেমন গম্ভীর আর কঠিন গলায় প্রশ্ন করল : কে তুমি? কেন এসেছ এখানে?
কপট হেসে বলল : আমি চম্পাপুরীর রাজা অধিররথের পুত্র। কর্ণ নাম আমার। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী তৃতীয় পাণ্ডবের সঙ্গে আমিও অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন করতে চাই। একই গুরুর কাছে শেখা বিদ্যায় কে কত পারদর্শী এবং দক্ষ তার বিচার হোক।
উল্লসিত জনতা সে কথা শুনে সমবেত কণ্ঠে বলল : উত্তম প্রস্তাব।
অর্জুনের ভেতরটা কেঁপে উঠল। কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করে বলল : নির্বোধের মতো বীরত্বের বৃথা আস্ফালন করে হাততালি পাওয়া সহজ কিন্তু প্রতি-যোগিতায় জেতা কঠিন। গর্ব করে বলল : সব সাধ সকলের পূরণ হয় না। অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখা আর তার সঙ্গে মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এক কথা নয় মূর্খ। মিছেমিছি প্রাণটা কেন খোয়াবে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। বামন হয়ে চাঁদে ধরতে চেও না।
ক্রোধে কর্ণের কানের দুপাশ লাল হয়ে উঠল। আগুনের মতো গনগন করছিল। তীব্র অপমানের জ্বালা তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে তরঙ্গায়িত হয়ে যাচ্ছিল। পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠল। নিদারুণ উত্তেজনায় তার চোখ দুটি বিস্ফারিত হলো। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার অর্জুন আর একবার কৃপাচার্যের দিকে তাকাল। বলল : আমার অসামান্য গোপন শক্তির উৎস গোপনই থেকে গেল। তাকে পরখ করে দেখার সাহস হলো না আচার্য দ্রোণের। আজ এই রণস্থল সাধারণের অধিকৃত। তাই কোনো আত্মশ্লাঘা সহ্য করছি

না। রাজাদেশ পেলে তোমার মিথ্যে বড়াই ধুলোয় মিশিয়ে দেবে।
দুর্যোধন দুঃশাসন কোথা থেকে ছুটে এসে কর্ণের পক্ষে দাঁড়াল। ভাই এবং বন্ধু বলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বহুদিন পর অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেমন খুশি হয়ে ওঠে ভেতরটা তেমনি বিগলিত খুশির এক প্রসন্নতায় দুর্যোধন কর্ণের বুকে নদী হয়ে মিশে গেল। মৃদু হেসে বলল: দুর্যোধন! এস ভাই। এস। আমাদের সঙ্গে একাসনে বস। তুমিও রাজার ছেলে। তৃতীয় পাণ্ডব জেনে শুনে তোমাকে মিছেমিছি অপমান করল। এটাই হলো পাণ্ডবদের রীতি, তাদের স্বভাব। ওদের কথায় মন খারাপ কর না। এ রণাঙ্গন জাতি, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যে উন্মুক্ত। এখানে সবারই সমান অংশ গ্রহণের অধিকার। অর্জুনের মতো তোমারও অস্ত্রবিদ্যা প্রর্শনের সমান অধিকার। কারো সাধ্য নেই তোমার বাসনা অপূর্ণ রাখে। বলতে বলতে দুচোখে একটা ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল।
আচার্য দ্রোণের মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। কর্ণের আকস্মিক আত্মপ্রকাশ তাকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলল। পাছে লোকের চোখে তার ছদ্মবেশটা ধরা পড়ে যায় তাই দ্রোণ ঈষৎ মাথা নেড়ে ভুরু কুঁচকে কৃপাচার্যকে কিছু ইংগিত করল। কৃপাচার্য থমকে দ্রোণের চোখে চোখ রেখে গম্ভীর গলায় বলল: তা হয় না দুর্যোধন! কোনো অনাহূতের অস্ত্র প্রদর্শনের অধিকারী নেই।
দুর্যোধন তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বলল: রাজাদেশ কিন্তু তা বলে না। কোনো পূর্ব শর্ত কিংবা বিধি আরোপ করা হয় নি প্রতিযোগিদের ওপর।
কৃপাচার্যের অধরে চতুর হাসি। বলল: তবু একজন নগণ্য সাধারণ প্রজা কিংবা অনাহূতের সঙ্গে প্রতিপালক, দেশের রাজার রাজকুমাদের কখনো লড়াই হয় না। সিংহের সাথে শৃগালের লড়াই হয় কখনো? হস্তিনাপুরের রাজকুমারদের প্রতিদ্বন্দ্বী তেমনি অজ্ঞাত কুলশীল কোনো ব্যক্তিই হতে পারে না। রাজায় প্রজায় অবশ্যই ব্যবধান থাকবে। শাসক ও শাসিত কখনও একাসনে বসতে পারে না। এটা রাজনীতি। হস্তিনাপুরের রাজপুত্রের সঙ্গে অবশ্যই সমান মর্যাদা সম্পন্ন যে কোনো রাজকুমারের যুদ্ধ হতে পারে।

এটা মর্যাদার প্রশ্ন। যুদ্ধ হবে সমানে সমানে। ওকেও কুলমর্যাদায় অর্জুনের সমান হতে হবে।

কর্ণের মুখ অপমানে রাঙা হলো। তার কিছু বলার আগে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ স্বরে বলল: কর্ণ হস্তিনাপুরে নতুন নয়। তার পরিচয় আপনারও অজানা থাকার কথা নয়। তার নতুন করে পয়িচয় দেওয়া আবশ্যক কিছু নয়। একদিন পাণ্ডব এবং কৌরবের সাথে কর্ণও আচার্য দ্রোণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করত। অল্পদিনের মধ্যে সকলের নজর কেড়ে নিয়েছিল সে। সেই স্মৃতি আচার্যদ্বয়ের ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কারণ সেইদিন কর্ণই ছিল তাদের আলোচনার পাত্র।

কৃপাচার্য ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করল। বেশ একটু রুষ্ট হয়ে দুর্যোধনকে ভর্ৎসনা করে বলল: আমার প্রশ্নের উত্তর তুমি দেবার কে? কর্ণের মুখেই আমি তার পিতৃপরিচয় জানতে চাই।

দুর্যোধন বলল: পূর্বেই বলেছি, নতুন করে তার পরিচয় জানার আবশ্যকতা নেই। মিছিমিছি তাকে অপমান করছেন কেন?

সে কথা তাকেই জিগ্যেস কর। কর্ণের নিজের মুখে তার পিতৃপরিচয় শোন।

কৃপাচার্যের কথায় প্রচ্ছন্ন একটা হীন সন্দেহ প্রকাশ পেল। কর্ণের ভেতরটা সহসা চমকে উঠল। নিজের অজানতে বুকের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে গেল। সেই মুহূর্তে বড় অসহায় আর বিপন্ন লাগল নিজেকে। মনে হলো কোথাও যেন একটা গোলমাল আছে? কিন্তু গণ্ডগোলটা কী হতে পারে ভেবে পেল না কর্ণ।

অধিরথকে ঘর্মাক্ত কলেবরে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করতে দেখে কর্ণ মনে জোর পেল। মুহূর্তে তার অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠল। নিজের কথা বলতে গর্বে তার বুক ফুলে উঠল। বলল: আমি বৃষ্টিবংশসম্ভূত চম্পাপুরীর অধিপতি অধিরথের পুত্র। কর্ণ নাম আমার। মাতা রাধা। এর অধিক কৌতূহল থাকলে আচার্য অস্ত্রগুরু দ্রোণকেই প্রশ্ন করুন। আমার সব পরিচয় অবগত আছেন

তিনি। যা জানেন না, তা হলো অস্ত্রকুলাচার্য ভৃগুবংশীয় ভগবান পরশুরামের শিষ্য আমি। সেই আমার পরম গৌরব। কুল-শীল মানে হস্তিনাপুরের রাজ কুমার তৃতীয় পাণ্ডবের যথার্থ যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তার ও আমার প্রকাশ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ কিংবা প্রতিযোগিতা হওয়ার পথে আর কোনো বাধা কিংবা সংশয় থাকার কথা নয় আচার্য কৃপ'র। এখন মহারাজের অনুমতি পেলে আমি অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হতে পারি।

ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের প্রত্যুত্তর এবং আবেদন মন দিয়ে শুনল। বিদুরকে আস্তে আস্তে বলল : যুবককে উৎসাহিত না করে নিবৃত্ত করলে আমার ঘোষণা একটা বুলি সর্বস্ব ফাঁকা আওয়াজ হয়ে যায়। তাই যুবককে আমি অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনের করতে অনুমতি দিলাম। বিদুর তুমি সুবক্তা। যুবকের অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনের কলাকৌশলের বর্ণনা তাৎক্ষণিক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃত করে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করবে। তারপর বিদুরকে খুব কাছে ডেকে কানে কানে বলল ; যুবক মুখে যে আস্ফালনই করুক অর্জুনের কৃতিত্ব ম্লান করে দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। ফাঁকা আওয়াজ বলে মনে হচ্ছে। শূন্য কুম্ভের শব্দ বেশি। কথাগুলো বলে ধৃতরাষ্ট্র নিজের মনেই হাসল। কুটিল হাসিতে তার অধরপ্রান্ত সামান্য একটু বেঁকে গেল শুধু।

ধৃতরাষ্ট্রের ঘোষণা দ্রোণকে হতাশ এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। বিদুরকে ভীষণ বিব্রত দেখাল। দুর্যোধন উল্লাসে একবার দুঃশাসনকে আর একবার মাতুল শকুনিকে জড়িয়ে ধরল। করতালি দিলো। কর্ণের অনুমতি মানে তার জয়। এ জয় কৌরবের। তাই আনন্দের পরিসীমা ছিল না তার।

কর্ণের আত্মপরিচয় কুন্তীকে বিদ্যুৎ স্পর্শ করে গেল। তার ভেতরটা সহসা আলোকিত করল। অনেক ঘটনা হুড়মুড়িয়ে তার মনে এসে তাকে চমকে দিয়ে মিলিয়ে গেল। আর এক আশ্চর্য মুগ্ধতা নিয়ে কুন্তী কর্ণের দিকে চেয়ে রইল।

কৃতজ্ঞতাভরা দুই চোখে কর্ণ চেয়ে আছে ধৃতরাষ্ট্রের দিকে। দুর্যোধনকে তার প্রকৃত সুহৃৎ মনে হলো। সংকট সময় কেবল দুর্যোধন তার পাশে

দাঁড়িয়ে তাকে সম্মানিত করল। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল কর্ণের অন্তর। দুর্যোধনের এ ঋণ জন্মেও শেষ হবে না তার। কর্ণের মুগ্ধ দুটি চোখে কুন্তীর তদ্গত দুই চোখের চাহনির ওপর স্থির হয়ে রইল। সরোবরের মতো শান্ত গভীর সম্মোহনী দৃষ্টি তার বিভ্রম উৎপাদন করল। কয়েকটা মুহূর্ত ঘোর লাল একটা আচ্ছন্নতার মধ্যেই কাটল।

তারপর কর্ণ দুই হাত বুকের কাছে জোড় করে চোখ বুজে একমনে সূর্যকে ধ্যান করল। মনে হলো, সূর্যের তেজ দূর দুরান্ত থেকে তার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে। আর তার ভেতরটা সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। বেশ বুঝতে পারছিল, একটা দিব্যশক্তিতে তার পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে। স্নায়ুতে স্নায়ুতে সূর্যের তেজের মতো একটা উষ্ণ প্রস্রবণ বয়ে যাচ্ছে। আর সে কেমন প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

কর্ণ ধনুতে শর সংযোজন করে একসাথে আচার্য দ্রোণ এবং ধৃতরাষ্ট্রের পাদবন্দনা করল। জনতা ধন্য ধন্য করল। রঙ্গভূমির উল্লাস উত্তেজনাকে ধরে রাখার জন্যে একসঙ্গে পাঁচবাণ নিক্ষেপ করল। মত্ত প্রভঞ্জনের মত্ত হাঁক পাড়তে পাড়তে বাণ ছুটল আকাশের দিকে। ভয়ে আকাশ আঁ আঁ করে উঠল। মেঘ গরজাতে লাগল। বিদ্যুৎ আকাশটাকে ফাল ফাল করে দিলো। মুহূর্তে একটা প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে তুলল। জনতার মধ্যে হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেল। কর্ণ দীপ্ত উল্লাসে একের পর এক শর নিক্ষেপ করে দর্শকের চিত্ত জয় করে ফেলল। ঠিক তখনই হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

কুন্তী মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তাকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব সহ বিদুর ও অন্যান্যেরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রাজাদেশে বন্ধ হলো ক্রীড়া প্রদর্শন।

কর্ণ হতভম্ব। মনে হলো একটা বিরাট জয় আদায় করে নিয়েও সে শেষ রক্ষা করতে পারল না। অদৃষ্টের কাছে হেরে যাওয়ার জন্যে তার ভীষণ অনুশোচনা হচ্ছিল।

হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরল কর্ণ।

শ্রান্ত পায়ে মাটি মাড়িয়ে নিজের কক্ষে প্রবেশ করল। কোনোদিকে তাকাল না সে। পাছে কেউ তাকে দেখে ফেলে তাই লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরে ঢুকল। চেয়েও দেখল না, কেউ তার প্রতীক্ষা করছে কিনা? উৎকণ্ঠিত অপেক্ষমাণ জননী রাধার সাথে একবারটি দেখা না করে কর্ণ কোনোদিন নিজের কক্ষে যায় না, কিন্তু আজ মাথা হেঁট করে নিঃশব্দে অপমানিতের মতো ঘরে প্রবেশ করল।

রাধা অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব দেখল। কর্ণের কষ্ট দেখে তার দু'চোখ ভরে জল নামল। জননীর বুকে অভিমানের সাগর উথলে উঠল। মনের মধ্যে নানারকম কু-গাইতে লাগল। কত রকমের জিজ্ঞাসা, সন্দেহ অবিরাম মনটার ভেতর পাক খেতে লাগল। মনে হলো কর্ণের একটা কিছু ঘটেছে আজ।

সন্তানের মলিন মুখ দেখলে সব মা ব্যাকুল হয়। কিন্তু রাধার ব্যাকুলতার সঙ্গে অন্য এক রকম অনুভূতি মিশেছিল। সে অনুভূতি রাধার একার। পৃথিবীর খুব কম মায়ের সেই যন্ত্রণা থাকে। আর পাঁচটা মায়ের মতো কর্ণের সঙ্গে তার সম্পর্ক রক্তের কিংবা নাড়ীর নয়। তার দাবি স্নেহের ভালবাসার। আত্মিক সম্পর্কের। জৈবিক কোনো সংস্কার তাকে প্রতি-পালনের সঙ্গে গড়ে ওঠে নি। এই কারণেই কর্ণের ওপর তার দাবি বা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে রাধা কোথায় যেন একটু দুর্বল। অবশ্য এই উপলব্ধি তার জীবনে প্রথম। আগে কখনও কর্ণ সম্পর্কে এরকম অনুভূতি রাধার হয় নি। এই প্রথম মনে হলো, কর্ণকে সে পেটে ধরে নি। কর্ণ তার কেউ নয়। কুড়িয়ে পাওয়া এক ছেলে শুধু। তার ওপর জোর বা দাবি করার অধিকার তার কতটুকু? কিন্তু কর্ণ সে কথা জানে না। রাধাও তাকে কোনোদিন বুঝতে দেয় নি। তার নিজের কোনো সন্তান ছিল না। তাই কর্ণ তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে ছিল। তার মাতৃস্নেহে পিতৃস্নেহে কোনো ভাগাভাগি ছিল না। তবু মনে হয় সে সম্পর্কটা বড় পল্‌কা। সামান্য ঝড়েই ভেঙে পড়বে!

রাধা তার পুত্র কর্ণের মধ্যে অন্য এক কর্ণকে দেখে বিব্রত বোধ করল। তার মনের ভেতর যে ঝড় উঠেছে এটুকু বুঝতে রাধার বাকি রইল না। কর্ণ নিজেই আজ বিভ্রান্ত, বিচলিত, দিশেহারা। এর ভেতর জননীর কোন্ দাবি নিয়ে সে তার কাছে যাবে? তাকে কর্ণ হঠাৎ যদি কোনো প্রশ্ন করে তা হলে কি বলবে? নিজেও জানে না তার উত্তর।

রাধার বুকের ভেতরটা ফেটে যাচ্ছিল, তবু সে কর্ণের ঘরে ঢুকতে পারল না। তার সামনে দাঁড়িয়ে কষ্টের কথাটা জানতে গেলে পাছে সব প্রকাশ হয়ে পড়ে, জানাজানি হয়ে যায় এই ভয়ে সে অসহায় বোধ করল। কোনো দিন মনে হয় নি, কর্ণ তার সন্তান নয়। সে তার বুক আগলানো মানিক। কর্ণ যখন ছিল না তখন এ জীবনটা মরুভূমির মতো মনে হতো। এখন কর্ণ তার জীবনের মরূদ্যান। কর্ণকে পেটে না ধরলেও সকলে জানে সে কর্ণের মা। জননীর সব মমতা স্নেহ আদর দিয়ে সে কর্ণের মা হয়ে গেছে। কর্ণের মুখে ঐ মা ডাকটুকু শোনার জন্যে সারাদিন কী অধীর প্রতীক্ষায় কাটে তার। কর্ণ যতক্ষণ ঘরে থাকে, মা মা করে ডেকে অস্থির করে। আজ বাড়ি ফিরে একবারও মা বলে ডাকল না। চেয়েও দেখল না তার দিকে। কিংবা, রাধা কি করছে চুপিচুপি এসে তার খোঁজও নিল না? অবাক করে দেবার জন্যে নিঃসাড়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালও না। কর্ণের হঠাৎ এই পরিবর্তনের কোনো কারণ খুঁজে পেল না রাধা। প্রত্যাশায় ব্যথা লাগার কষ্টে তার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। একটা তীব্র অভিমানবোধে তার বুকের ভেতরটায় ব্যথা লাগল। প্রাণের ভেতরটা থেকে থেকে কেমন মোচড় দিয়ে উঠল রাধার।

মন খারাপের মতো এমন কি ঘটল যে কর্ণ তাকে পর্যন্ত বলতে পারল না। এতকাল কোনো কথা কখনো লুকোয় নি। হঠাৎ তাকে এড়িয়ে গেল কোন্ কারণে। মনের ভেতর যে আলোড়ন প্রতি মুহূর্ত তাকে অস্থির করছিল সেটাকে প্রাণপণে চেপে থেকেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারছিল না। হঠাৎ-ই কথাটা মনে এল, লুকনো জীবন রহস্যের কথা তবে কি টের পেল

কর্ণ? মনটা কি সেজন্যেই এত অশান্ত? নিজের জন্মের কথাটা জেনে ফেলার লজ্জা তার বুকে ঝড় তুলল কি? কিন্তু রক্ত মাংসের সদ্যোজাত শিশু এখন যুবক। তাকে চিনে নেওয়া কোনো জনক জননীর পক্ষে সহজ নয়। এ তার মিছে উদ্বেগ। মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করল রাধা। তবু মন উতলা হলো। কারণ, এই দুনিয়ায় কত কি অসম্ভব, অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে কে তার হিসাব রাখে?

মনের অগোচরের একটা অনুভূতি থেকে থেকে রাধাকে বিমনা করে তুলল। তার মন বলছিল, কিছু একটা ঘটবে শীঘ্র। একটা কোনো কিছু হওয়ার সূচনার মুখে দাঁড়ানোর সময় ঘনিয়ে এল বোধহয় তার। চোখের ওপর কর্ণের বাহুমূলের অর্বুদটার কথা মনে পড়ল। ওইটাই জন্ম চিহ্ন। তার একমাত্র পরিচয়। কথাটা মনে হতে তার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। পায়ের তলায় মাটিটা কেঁপে গেল। কেমন একটা দিশেহারা ভাবনা আর আতঙ্কে রাধার মুখখানা রক্তশূন্য হয়ে গেল।

এক দুঃখ ভরা, ব্যথা ভরা স্তব্ধতার মধ্যে ডুবে ছিল রাধার সমস্ত চেতনা। কেমন একটা অন্যমনস্কতায় তার চোখ দুটি থমথম করছিল। নিস্পন্দের মতো শয্যার সাথে মিশে গিয়ে সে সুদূর অতীতকে দেখছিল। বিশ বছর আগের ঘটনা। তবু সব স্পষ্ট। কোথাও এতটুকু এলোমেলো হলো না তার দেখার।

প্রাসাদের গা ঘেঁষে তর্‌তর্‌ করে বয়ে যেতে দেখল যমুনা। আর সে অলিন্দের এক কোণে দাঁড়িয়ে যমুনা দেখছে। এই স্থানটি রাধার খুব প্রিয়। যমুনা তার অনেক দুঃখ, সুখের সাথী। বিশ বছর আগে সন্তানহীনতার শূন্যতায় যখন হাঁফিয়ে যেত তখন যমুনার সামনে দাঁড়িয়ে আকুল নয়নে চেয়ে থাকত। মনটা খুব খারাপ লাগলে শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঘাটে বসে সময়টা কাটিয়ে দিত।

দিগন্তের বুকের ভেতর থেকে এত বড় একটা নদী কেমন করে বেরিয়ে এলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না রাধার। নিজের মনের অজান্তে কল্পনায়,

উৎস থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পেত। হিমালয়ের শিখরে তুষার শুভ্র বরফ গলে পাহাড় নদী, বন পেরিয়ে যমুনা দিগন্তের বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে তার সঙ্গে সখী সম্পর্ক পাতাতে।

মাঝে মাঝে যমুনাকে স্নেহময়ী জননী মনে হতো। ঢেউগুলো যেন তার দুরন্ত সন্তান। মায়ের বুকে নির্ভয়ে খেলা করতে করতে অনন্তকাল ধরে তারা চলেছে। যমুনাও এক মুহূর্ত তাদের কাছ-ছাড়া করতে চায় না। ওদের দুরন্তপনা তারও বড় ভালো লাগে। প্রশ্রয়ে উৎসাহে ঢেউগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে। বহু পুত্রবতী রমণীর মতো যমুনা ওদের সব দৌরাত্ম্য সহ্য করে হাসিমুখে। তার এই সদাহাস্যময়ী জননীরূপটি রাধার বড় প্রিয়। নদীর দিকে চেয়ে চেয়ে রাধার সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে যেত রোজ সে নিজেও জানতে পারত না।

যমুনার উত্তাল ঢেউরাশির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উদ্গত কান্নায় একটা নিঃশ্বাস তার বুকের কাছে আটকে থাকত। একটা তীব্র ব্যথায় টনটন করত বুক। বদ্ধ নিঃশ্বাসের কষ্টে বুকটা যমুনার ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করত। বুকের মধ্যে অনেক দীর্ঘশ্বাসের মেঘ আবর্তিত হতো, অনেকক্ষণ ধরে। সন্তানের জননী হতে না পারার একটা শূন্যতায় তার বুক হাহাকার করে উঠত। আর তার প্রতিক্রিয়া সমস্ত শরীরকে ধরে প্রচণ্ড ঝাপ্টায় নাড়া দিয়ে যেত। সেই সময় যমুনার কাছে আকুল স্বরে প্রার্থনা করত আমাকে তোমার মতো জননী করে দাও। তোমার সুখের ভাগ দাও আমাকে। তোমার মতো আমার বাকী জীবনটা যেন সন্তানকে নিয়ে অমন সুখে কাটে।

তথাপি যমুনা নিশ্চুপ। রাধার মুখের কথা শোনার সময় নেই তার। তবু রাধার বুকে চকিতে শিহরণের তরঙ্গ খেলে গেল। তরতর করে সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে জলে পা ডুবিয়ে বসে জিগ্যেস করল : তুমি কি বধির? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? তোমার প্রাণ বলে কি কিছু নেই? তুমি স্বার্থপর। ভীষণ নিষ্ঠুর। শুধু নিজের সুখ নিয়ে আছ। আমার কথা একটুও

ভাব না ?

যমুনা থমকে দাঁড়াল না। ঢেউয়ের কলস্বরে যেন শুনল : তোমার দুঃখ সই আমি জানি। ভেবে কী করবে ? একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমিও আমার মতো প্রফুল্লিত হবে। সেদিন কি আর আমার কথা মনে হবে ? এমন করে সই বলে কাছে এসে বসবে ?

রাধা কথা বলতে পারত না। দাঁতে দাঁত দিয়ে কাপড়ের প্রান্ত চেপে ধরে নিরুদ্ধ যন্ত্রণায় মাথা নাড়ত। নিঃশব্দে নিরুচ্চারে বলতো থাকবে সই ; থাকবে।

রাধার সমস্ত চেতনার ভেতর নদীর অব্যক্ত কথাগুলো মর্মরিত হতে লাগল দিন, মাস, বছর ধরে। তার চিন্তার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। যমুনাকে সে সুরলোকের দেবীরূপে কল্পনা করেছিল। একবারও মনে হয় নি সে বঞ্চিত হবে ; মিথ্যে হবে যমুনার কথা। মানুষের চরিত্রের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হলো সে একটা কিছু বিশ্বাস করতে ভালবাসে। রাধাও বিশ্বাস করেছিল একদিন মা হবে সে। সুরনারী যমুনার বচন মিথ্যে হয় না। একদিন স্বপ্ন দেখল রাধা। সূর্যের রথে চেপে আকাশ থেকে কে যেন নামল যমুনায়। তারপর ছোট্ট একটা ডিঙিতে ভাসতে ভাসতে চলল। রাধা তখন ঘাটে স্নান করছে। ডিঙিটা ঘাটে এসেই থামল। ফুটফুটে সুন্দর একটা ছেলে ডিঙি আলো করে আছে। রাধা তৎক্ষণাৎ তাকে বুকে তুলে নিল, অমনি ডিঙিটা উধাও হয়ে গেল। ঘুমের ঘোরে রাধা চিৎকার করল। তার চিৎকারে অধিরথের ঘুম ভেঙে গেল। দেখল, ঘুমের ঘোরে রাধা ছটফট করছে, আর, আমার ছেলে আমার ছেলে বলে দু'খানা হাত শক্ত করে বুকের ওপর চেপে ধরে আছে। অধিরথ গায়ে হাত দিয়ে রাধার ঘুম ভাঙাল।

চোখ মেলতে দেখল, প্রাসাদের কক্ষে অধিরথের পাশেই সে শুয়ে আছে। অধিরথ উৎকণ্ঠিত মুখে তার দিকে চেয়ে আছে। পলক পড়ছে না মোটে। মনটা রাধার ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। নিশি পাওয়া মানুষের মতো কেমন

আচ্ছন্ন হয়ে খোলা জানলার দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে থম্ হয়ে একটা বিষাদে বসে রইল। শেষ রাত্রির আকাশে অস্তমান চাঁদের দিকে চেয়ে নিজের স্বপ্নের ভেতর মগ্ন হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ।

পূবের আকাশে মুঠো মুঠো আবির ছিটিয়ে ভোরের সূচনা করছে। রাধা কিছু না বলে বিছানা থেকে নামল। দর্পণের সামনে এক লহমা দাঁড়িয়ে রাতের বেশবাস দেখে নিল। তারপর, দ্বার খুলে বিরাট লম্বা দালান পেরিয়ে যমুনার ঘাটের দিকে হেঁটে চলল। অধিরথ হতভম্ব। বিস্মিত। তাকে কোনোরকম নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল না। তার নির্বাক দুটি চোখের বোবা ভাষার দিকে তাকিয়ে সে যা বোঝার বুঝে নিয়েছিল। রাধার বুকের জ্বালাময় উৎস থেকে মনের অভ্যন্তরে যে ডাক এসে পৌঁছেছে তা তাকে ঘরে থাকতে দেবে না। অধিরথ তাই পেছনে ডাকল না। কিন্তু এইভাবে একা একা তার যমুনার ঘাটে যাওয়াটা তাকে কিছু অবাক করল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে শুকনো গলায় বলল : রাধা, এখন আঁধার কাটে নি। রাত শেষ হতে আর অল্পই বাকি। এসময় নিশি পাওয়া মানুষের মতো তোমার এখানে আশা ভালো হয় নি।

একটা ঘোরের মধ্যে হাঁটছিল রাধা। অধিরথের আচমকা প্রশ্নে তার ভেতরটা চমকে উঠল। হতভম্বের মতো তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। কি দেখল সেই জানে। হঠাৎ একটা আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপল। বলল : আমার মনে তার আসার বার্তা এসে পৌঁছিয়েছে। আমি কেমন করে ঘরে থাকি বল? আমার ছেলে আসছে আজ সূর্যের রথে চেপে। হয়তো এখুনি আসবে। তুমি দেখ।

অধিরথ স্তম্ভিত। অস্ফুটস্বরে বলল : রাধা তুমি কি পাগল হলে?

না-গো। তুমি দেখে নিও সে আসবে। ঠিক আসবে। বুকের মধ্যে আমি তার কান্না শুনতে পাচ্ছি। হাঁগো, ভীষণ কাঁদছে ছেলেটা। তুমি শুনতে পাচ্ছ না?

রাধা!

স্বামী, সে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছে।

স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না। তোমার মনের নিরন্তর প্রার্থনাটা স্বপ্নের রূপ ধরে এসেছে। চল, আমরা ঘরে যাই।

স্বামী, সব মা সন্তানের আগমন আগে টের পায়। তার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে জানতে পারে তার আবির্ভাবকে। মায়ের অনুভূতির গোপন খবর বাবারা কোনোদিন আগে টের পায় না। কেবল মায়েরাই তা জানে।

অধিরথ কথা খুঁজে পেল না। ফ্যালফ্যাল করে রাধার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অনেক দিন ধরে রাধার ভেতর একটা মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। কিন্তু এ ধরনের বায়ু রোগের প্রতিক্রিয়া আগে কখনো চোখে পড়ে নি। তার সম্পর্কে অনেক কথাই মনে হয় হয় অধিরথের। কিন্তু এমন পাগল আচরণ দেখতে হবে ভাবে নি।

রাধা যমুনার দিকে চেয়ে আছে। এমন পাথর মূর্তি মানুষের কখনো দেখে নি অধিরথ। এক জায়গায় তার মনটি আটকে আছে। একটা বিপুল শূন্যতা তার চিত্তকে ছেয়ে আছে। মনটা যে তার এক কাল্পনিক শিশুর দিকে ক্রমাগত ছুটে যাচ্ছে এবং তার স্মৃতি ও মুখ অবলম্বন করে যে রাধার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, এটা বেশ বুঝতে পারল অধিরথ। রাধার পাশে অধিরথ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক নেই। তবে কিছু একটা যে রাধার চেতনার অভ্যন্তরে অলক্ষ্যে ঘটে যাচ্ছে বুঝতে পারছিল। তার নিজের চিন্তাশক্তিও কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। অনুভূতিশূন্য মূর্তির মতোই অধিরথ রাধার দিকে তাকিয়ে রইল।

রাধার জন্যে দুশ্চিন্তা হয় অধিরথের। তার নির্বাক স্তব্ধতাও সইতে পারে না বেশিক্ষণ। তার ধারণা যমুনা কখনও মিথ্যে বলে না। সে সুরকন্যা। তার কলস্বরে শুনেছে সে জননী হবে খুব শীঘ্র। এই আশা বুকে নিয়ে রাধা দিন দিন অন্য এক রাধা হয়ে উঠলে। সে রাধা জননী-রাধা সাধারণ পাঁচজন মানুষের মতো দেশ-বিদেশের বহু জ্যোতিষীর কাছেও গেছে তার মনের বাসনা জানতে। সব জ্যোতিষীই এক কথা বলেছে, জননী সে

হবেই। এ তার বিধিলিপি। রাধা দিনরাত মনে মনে তারই প্রার্থনা করে শুধু। অধিরথ নিজে বিশ্বাস করে না, কিন্তু এক দুর্নিরীক্ষ নিয়ামকের কথা মনে হয় তার। অন্তরীক্ষে এমন একজন আছে যার ইচ্ছেটাই সব। এখন মনে হচ্ছে, রাধা কায়মনোবাক্যে সেই একজনের কাছে মনের প্রার্থনা জানাচ্ছে অবিরত। তাই সে ধ্যানস্থ।

যেখানে সূর্য উঠছিল রাধা সেইদিকে নীরব চোখ মেলে চুপ করে চেয়ে রইল। সুন্দর স্বপ্ন আর উজ্জ্বল প্রত্যাশা নিয়ে যে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে জ্যোতির্ময় দিগন্তের দিকে। তার সমস্ত মন পড়ে আছে সেখানে।

নিজেকে প্রকাশ করার ভাষা নেই রাধার। চোখের ভাষা তার মুখর হয়ে ওঠে নীরবতায়। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অধিরথের মনে হলো, স্তব্ধ, মৌন ভোরের প্রশান্তির আবেশ তার ভাষাহীন মনকে যেন রাঙিয়ে দিয়েছে একটি মধুর রঙের বর্ণসম্ভারে। স্বপ্নের রঙ কত সুন্দর রাধার মুখে দেখল অধিরথ।

রাধা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যমুনার ঘাটে। পায়ের পাতায় টিপ দিয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন খুঁজছিল। গেরস্তদের খোকা হোক বলে পাখি ডাকছিল গাছের ডালে। ডাকটা কেমন মধুর আবেশে ভরে তুলল তাকে।

দিগন্তের নিবিড় ধূম্রজাল ভেদ করে সূর্যের আলোর মুকুট পরে যমুনার বুক আলোড়িত করে একটা ডিঙি ভেসে উঠল। সূর্যের রূপালী আলোয় ঝলমল করা স্রোতের পথ ধরেই ডিঙিটা আসছিল। রাধার ভেতরটা চঞ্চল হয়ে উঠল। ডিঙিতে আরোহী নেই, চালক নেই। স্রোতের টানে তার দিকে ভেসে আসছিল।

শান্ত বনভূমি। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে মিষ্টিরোদ এসে পড়েছিল ডিঙিটার ওপর। আর তাতেই রাধা স্পষ্ট দেখতে পেল সদ্য ফোটা ফুলের মতো একটি শিশু শুয়ে আছে ডিঙির অভ্যন্তরে। আর নির্ভয়ে হাত পা ছুঁড়ে খেলছে। এক বিচিত্র অনুভূতির শিহরণ খেলে গেল তার সারা অঙ্গে। খুশির ঝরনা নামল বুকে।

ডিঙিটা ঘাটের দিকেই আসছিল। রাধা কি করবে ভেবে পেল না। কিন্তু কিছু একটা করতে তো হবেই। ডিঙিটা ভেসে যাওয়ার আগে ওকে আটকাতে হবে। কার ছেলে ? কোন্ বংশে জন্ম ? এসব কথা মনে এল না। শিশুকে দেখেই তার বুক আবেগে, স্নেহে মমতায় টলটল করে উঠল।

অধিরথের সঙ্গে নির্বাক নিষ্পলক এক অসহায় দৃষ্টি বিনিময় হলো রাধার। সর্বাঙ্গে আচমকা একটা তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল অধিরথের। আর তাতেই সে বাস্তব সচেতন হয়ে উঠল। রাধার মুখে হাসির আভাস। অধিরথ কি করবে এখন, তার জবাব পেয়ে গেছে।

অধিরথ আচ্ছন্নের মতো তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে জলে নামল। বেশ খানিকটা সাঁতরে গিয়ে ডিঙিটা ধরল। টেনে আনল ঘাটের ধারে। রাধা ডিঙির ওপর ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে তাকে কোলে তুলে নিল। আদর করল। চুমায় চুমায় ভরে দিলো গাল। ঘ্রাণ নিল সারা অঙ্গের।

অধিরথ দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলতে পারছিল না। তারও ভেতরটা কেমন একটা ভাবাবেগে কেঁপে উঠল বার বার। আনন্দে তারও দু'চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। তবু দু'চোখের সমস্ত জোর দিয়ে সে শিশু পুত্রকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

শিশুর দিকে চেয়ে চেয়ে রাধা বলছিল: ছ্যাখ, কী সুন্দর টানা টানা চোখ। সমুদ্রের মতো গভীর অতলস্পর্শী কালো চোখ দুটি যেন নীল আকাশকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কত মায়া যে লুকনো এই দুটো চোখে!

অদ্ভুত একটা অনুভূতির স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে নিজের অজান্তে অধিরথ এক সময়ে হারিয়ে গেল। নিজেকে বিলিয়ে দেবার মতো আনন্দে তার মন ভরে উঠেছে তখন। এত বড় একটা আনন্দকে সেও তার বুকে লুকিয়ে রাখতে পারল না। রাধার কোল থেকে শিশুকে নিজের কোলে নিল অধিরথ। বুকে চেপে ধরতে তার সারা অঙ্গে শিহরণ বয়ে গেল। এই অদ্ভুত অনাস্বাদিত শিহরণের ভেতর যে এত আনন্দ লুকনো আছে অধিরথ জানত না। মনের ভেতর আবাহনের নতুন বাজনা বাজছিল। সে সুর

অনুরণন তুলল সারা দেহে প্রতি রক্তবিন্দুতে।

রাধা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল অধিরথের দিকে। অধিরথের চোখে ও কিসের দীপ্তি! সারা মুখে এত মায়া এল কোথা থেকে? কোথায় লুকনো ছিল জীবনের এ সুর? প্রশ্নে প্রশ্নে রাধাকে আকুল করল। বুকে তার কথার গুঞ্জন। এক অনাস্বাদিত জীবনকে বরণ করার স্বপ্নে তখন তার মন পরিপূর্ণ। বলল: স্বামী এই শিশু দেবশিশু। একে পেয়ে মন আমার ভরে গেছে। এর জন্যে আমি সব কিছু ছেড়ে থাকতে পারি। কুঁড়ে ঘরের সুখও আমার ভালো।

উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা নিয়ে অধিরথ প্রশ্ন করল: এ কথা বলছে কেন রাধা?

স্বামী এত সুখ, আনন্দ আমার এ প্রাসাদে ধরবে না। এই শিশুকে নিয়ে একটা গোপন সন্দেহ আমাকে তাড়া করে বেড়াবে সব সময়। প্রাসাদে আমি শান্তি পাব না। কিছু জানাজানি হওয়ার আগে, এই কাকভোরে আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চল।

একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে গেল অধিরথকে। হঠাৎ বুকটা ভার হয়ে গেল। স্তব্ধ বিহ্বলতায় রাধার দিকে চেয়ে রইল। কেমন একটা ভয় হলো। সন্তান ভাগ্য যদি বা হলো, তাকে দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা তার স্পর্শকাতর মনটিকে বেশী কষ্ট দেয়। চারদিকে ছোট মনের, ছোট স্বার্থের মানুষজনের মধ্যে অহরহ বাস করতে করতে একটা সন্দেহ নিষ্পাপ শিশুকে মাথা চাড়া দিলে এই সুন্দর অনুভূতিটাও অন্যরকম হয়ে যেতে পারে। রাধা তাই সব ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে চায়। কিন্তু একসাথে রাধা এবং শিশুকে ছেড়ে সে থাকবে কি করে?

অধিরথ অসহায়ভাবে কেমন একটা শূন্য চোখে চেয়ে থাকে রাধার দিকে। দ্বিধায় কম্পিত বক্ষে আস্তে আস্তে বলল: কিন্তু মুশকিল কী জানো?

রাধা শশব্যস্ত হয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল: জানি গো জানি। এই শিশুর মুখ চেয়ে তোমাকে আমায় ছেড়ে থাকতে হবে। আমাদের ছেলের জন্যে এই ত্যাগটুকু যদি করতে না পার তাহলে কেমন বাবা তুমি? সন্তানের

জন্যে বাবা-মায়ের নিজের কোনো সুখ-দুঃখ মনোবেদনা থাকতে নেই।
এই শিশুর অস্তিত্বটা জড়িয়ে আছে আমাদের সমস্ত সত্তায়।
তুমি না থাকলে বড় শূন্য লাগে। চারপাশটা বড় ফাঁকা আর একা মনে হয়।
সব জানি। নিজের প্রতিদিনের কাজের মধ্যে সর্বক্ষণ ব্যস্ত রাখলে এসব কিছু টের পাবে না। মাত্র কটা বছর। মাঝে মাঝে লুকিয়ে চলে আসবে। এক সঙ্গে থেকে যাবে ক'টা দিন!
রাধা দূরে সরে গেলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে!
জানি না। একটা কিছু তো করতে হবে। চোখের ওপর থাকলে যা সম্ভব হতো না, চোখের বাইরে থাকলে খুব সহজেই তাকে নিয়ে একটা গল্প বানানো যাবে। সেটা কি কম লাভ!
অধিরথ উদাস দৃষ্টিতে শিশুর দিকে চেয়ে থেকে বলল: ব্যাটা ভাগ্য করে এসেছে। এক মায়ের কোল শূন্য করে এসে আর এক মায়ের কোল জুড়ে বসেছে।
রাধা শিশুকে পরম আদরে আঁকড়ে ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল: হিংসুটে!
অধিরথ রাধার সুখ, আনন্দ, উদ্বেগ, দুর্ভাবনার বাস্তবতা অস্বীকার করতে পারল না। এ শিশু নিশ্চয়ই কোনো রাজরোষ কিংবা কারো গোপন প্রতি-হিংসার বলি হয়েছে। অথবা কোনো কুমারীর—কথাটা মনে পড়তে লজ্জায় জিভ কাটল। তারপর এক বুক দুর্ভাবনা, ভয় আর উৎকণ্ঠা নিয়ে রাধার দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে জিগ্যেস করল: পারবে; একা থাকতে?
রাধা বলল: সন্তানের জন্যে মায়েরা সব পারে। আমি তাকে পেটে ধরিনি কিন্তু আমি তো মা। ও তো আমারই ছেলে। ওর জন্যে রাজ ঐশ্বর্য ছেড়ে কুঁড়ে ঘরে বাস করলেও আমার কোনো কষ্ট হবে না। আমার তোমার কামনা বাসনা দিয়ে ভরা থাকবে সে ঘর। যেখানে কোনো শূন্যতা, অতৃপ্তি থাকবে না। সে হবে আমার আনন্দের সংসার। সুখের ঘর। তুমি আমাকে

সেখানে নিয়ে চল স্বামী। কয়েকটা বছর চোখের আড়ালে থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর কোনো সন্দেহ ভয় থাকবে না।

রাধার প্রস্তাবটা আকস্মিক কিছু নয়, তবু অধিরথের সামলে নিতে একটু সময় লাগল। বার দুই ঢোঁক গিললো। দুর্বল গলায় বললো : তোমার মন যা চায় তাই কর। আমি সেই ব্যবস্থাই করব।

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেল। কর্ণ বড় হয়ে গেছে। চম্পাপুরীর প্রাসাদে তাকে নিয়ে বাস করছে।

তবু একটা ভয়, রাধার মনে থেকেই গেল। বহু বছর পরে নতুন করে অনুভব করল। পেটের ছেলে না হলে বোধহয়, মাতা-পুত্রের সম্পর্কটা পলকা থেকে যায়। অধিকারের ভিতটা শক্ত হয় না। সামান্য ঘটনায় স্নেহপ্রবণ মনটা উতলা হয়। এর হয়ত সঙ্গত কারণ নেই। তথাপি, স্নেহের স্বভাবই হলো অনিষ্ট আশঙ্কা করা। ভাবনার পর ভাবনা হয় রাধার।

দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে রাধা ঘরের ভেতর উঁকি দিলো। দেখল, কর্ণ কেমন বিমর্ষ। প্রাণ চঞ্চল সেই কর্ণ নেই। চোখের নিচে দুর্ভাবনার কালিমা। কি যেন গভীর ভাবে ভাবছে। ভাবনার কোনো তাল খুঁজে পাচ্ছে না বলেই কেমন একটা দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্তভাব তার চোখে মুখে লেগে ছিল। তাকে দেখে রাধার মনে হলো জটিল চিন্তার গোলকধাঁধায় সে পথ হারিয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল কিসের এক বিমর্ষ চিন্তানুভূতিতে তার ভেতরটা ক্লিষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এমন কি হলো যে, কৌরব পাণ্ডবের অস্ত্র প্রদর্শনী থেকে ফিরে এসে একটা ভালো করে কথাও বলল না সে। অথচ রাধা কত প্রত্যাশা নিয়ে ছিল, কর্ণ ফিরে এসেই কৌরব-পাণ্ডবের ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলবে তাকে। কিন্তু সে সব কিছু না করে নিঃশব্দে নিজের ঘরে গিয়ে মাথা হেঁট করে বসে রইল। কী হয়েছে কর্ণের? অস্ত্র পরীক্ষার প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে তার মন খারাপ হলো কি? কিন্তু তাকে হারানোর মতো কোনো ধনুর্ধর ভূভারতে জন্মায় নি, একথা স্বয়ং আচার্য পরশুরামের। এমন কি

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনেরও সাধ্য নেই তাকে হারানোর। তা-হলে মন খারাপের এই রহস্য কোথায়? কর্ণের জন্যে রাধার মনটা ভীষণ অস্থির হলো। ভেতরটা তার কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠল।

কর্ণের মুখের ওপর রাধার চোখ স্থির। একটু একটু করে তার মনের সব দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয় কেটে গেল। বেপরোয়া হয়েই সে ঘরে ঢুকল। আস্তে আস্তে মাথায় হাত রাখল। মাথাটা তার বুকের কাছে টেনে নিয়ে স্থির হয়ে রইল। কথা বলতে গিয়ে রাধার ঠোঁট কাঁপছিল।

রাধার একখানা হাত টেনে নিয়ে মাথায় রাখল কর্ণ। মনে হলো, এতক্ষণ পরে সে একটা নিশ্চিত অবলম্বন পেয়েছে। বুকটা তার ফেটে যেতে লাগল। রাধার হাত চেপে ধরে আচ্ছন্ন গলায় ডাকল : মা!

তাতেই রাধার বুকের ভেতরটা গলিয়ে দিলো। সহসা দু'চোখের পাতা ভিজে গেল। করুণ দৃষ্টিতে তাকাল। রাধার কিছু বলার আগে কর্ণই বলল : মা-গো তোমার চোখে জল দেখলে বড় কষ্ট হয়। আমার জন্যে তুমি খুব ভাব তাই না? কিন্তু তোমরা ছাড়া যে আমার আপন বলতে আর কেউ নেই।

ত্রাসে রাধার বুকের ভেতরটা শিউরে উঠল। উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসায় তার গলার স্বর কাঁপছিল। অমন করে বলছিস কেন বাবা? কি হয়েছে তোর? বাইরে থেকে এসে রোজ আমার কাছে আগে আসিস। আমাকে দেখা দিয়ে তবে নিজের ঘরে যাস। আজ উদ্‌ভ্রান্তের মতো নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলি। কি হয়েছে তোর? আমাকে সব খুলে বল। মায়েরা কিছুই করতে পারে না, কেবল কষ্টের সমব্যথী হতে পারে। বুকের ভারটা তাতে তো একটু হাল্কা হয়।

রাধার কথাগুলো বিদ্যুৎস্পর্শ করে গেল কর্ণকে। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে কাটল। এক বুক শ্বাস নিয়ে তক্ষুণি একটা লম্বা শ্বাস পড়ল কর্ণের। মনে হলো, বুকের সব শ্বাস নেমে গেল ঐ কষ্টের সাথে। বলল : মা-গো, আমার জীবনটা বড় অদ্ভুত। বড় রহস্যময়। আমাকে নিয়ে কোথায় যেন

একটা জট পাকানো কিছু আছে। সত্তার ভেতর আমি তার অস্তিত্ব টের পাই, কিন্তু জট খুলতে পারি না। আমাকে ঘিরে চারদিকে শুধু সংশয়, অসংখ্য কৌতূহলিত প্রশ্ন। এত তো লোক আছে কাউকে নিয়ে তো এসব জিজ্ঞাসা হয় না। আমাকে নিয়ে হয় কেন? সকলের থেকে আমি বোধ হয় একটু আলাদা। আমার অদৃষ্টও ভিন্ন। ভাগ্যলিপি আমাকে শুধু বঞ্চিত করতে চায়। আমার পাওয়ার ঘর কিছুতে যেন ভরে উঠছে না। আমি কি দোষ করেছি?

বুকের ভেতরটা রাধার ছ্যাঁৎ করে উঠল। একটা কষ্টকর বেদনায় তার চোখ দুটি আর্দ্র হলো। আর্ত গলায় তার উদ্বিগ্ন হাহাকার। বলল: ও কি কথা? অমন করে বললে, আমার বড় ভয় করে! এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ভুলেও কেউ মনে করে না। তোর মলিন মুখখানা দেখলে আমার বুক ফেটে যায়। বড় কষ্ট হয়। তোর তো কোনো অভাব নেই। ঈশ্বর তোকে সব দিয়েছে। রূপ, বল, বীর্য, শৌর্য, মায়ের স্নেহ, পিতার আদর—কোনো কিছুতে তো বঞ্চিত করে নি। তবু অভিমান কেন?

ডাক ভুলে যাওয়া পাখির মতো কর্ণ অপলক শান্ত দুটি চোখ পেতে রাখল রাধার মুখের ওপর! কেমন একটা বিষণ্ণ বেদনায় আর অবসাদে তার চোখ দুটি ভীষণ শ্রান্ত দেখাচ্ছিল। শূন্য দৃষ্টি। উদাস গলায় বলল: আমার সব চাইতে বেশি আক্রোশ জন্মলগ্নের ওপর। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু সে। নিজেকে বড় অভিশপ্ত মনে হয়। বড় অসহায় লাগে। অথচ জন্মলগ্নের ওপর কারো কোনো হাত নেই। তবু মানুষ তাকেই বড় করে দেখল। ব্যক্তির প্রতিভা, পুরুষকার এসবের কোনো দাম নেই? বড় হলো মানুষের জাতপাত, বৃত্তি, কর্মের পরিচয়!

রাধা অসহায়ভাবে কর্ণের তাপিত বুকের ওপর হাত বুলিয়ে দেয়। তাকে শান্ত করতে ব্যাকুল স্বরে বলল: ও সব তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে মন খারাপ করতে নেই। পুরুষের পুরুষকারই হলো তার সৌভাগ্য। ঈশ্বর যাকে নিজের হাতে গড়ে নেওয়ার শক্তি দিয়েছে তাকে বঞ্চিত করার কিংবা

হারানোর কোনো শক্তি পৃথিবীতে নেই। একদিন সে নিজের জায়গা করে নেবেই। একজন মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ ঈশ্বরের আর কী হতে পারে ? মন খারাপের মতো কোনো ঘটনাই ওসব নয়।

কর্ণ মুগ্ধ দুটি চোখ পেতে রাখল রাধার মুখের ওপর। বলল : তোমার কথাগুলো শুনলে আর কোনো জ্বালা থাকে না। কিন্তু পুরুষকার নিয়ে আমার বিশ্বাস, প্রত্যয়কে অলক্ষ্য থেকে কে বা কারা যেন ভেঙে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মনের অন্ধকারে এক শূন্য গহ্বরে সে যেন ক্রমেই নেমে চলেছে পাক খেয়ে খেয়ে। বিপদ বাধা অস্বীকার করে আমি যত এগোতে চাই ততই ঐ অন্ধকারের অতল থেকে একটা দৈত্য এসে আমার সব কিছু কেড়ে নিতে যেন হাত বাড়াল। কিছুতেই বুঝি তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। তখন কেমন একটা ভয় হয়। আমার দৃপ্ত পুরুষকারের ওপর ঐ ছায়াটা কার ? আমার কাছে ও চায় কি ? ও কে ?

কর্ণের চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিতে দিতে রাধা একটা চাপা উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল : ওসব তোর মনের বিভ্রম।

কর্ণের মনের কথাটা রাধার শুনতে ভীষণ ভয় করছিল। মনের উদ্বেগটা যাতে বেরিয়ে না পড়ে, কর্ণ টের না পায় সেজন্যে খুব সাবধানে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে একটু থেমে বলল : নিজের কাছে হেরে যাওয়াই বড় পরাজয়। সেই হার না হলে কারো সাধ্য নেই আমার কর্ণকে হারানোর। বুঝতে পারছি তোকে নিয়ে একটা চক্রান্ত হচ্ছে। শত্রুরা তোর দুর্গের মতো দুর্জয় মনটাকে ভয় পায়। তাই, তোর ব্যক্তিত্ব এবং পৌরুষকে চারদিক থেকে আক্রমণ করছে। সব মানুষকে তার জন্ম সম্পর্কে খুব সহজে বিভ্রান্ত করা যায়। মনের অভ্যন্তরে ঐ সন্দেহটা একবার হলে তা থেকে আর নিস্তার নেই। শত্রুরা সেই নোংরা পথেই তোর শক্তি ও তেজ নিষ্প্রভ করার চক্রান্ত করছে। অথচ, জীবনের এই রহস্য পিতা-মাতা ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়। তারাই সন্তানের জীবনে একমাত্র বাস্তব সত্য। কিন্তু কেউ যদি নিরন্তর সন্দেহ সৃষ্টি করে মা-বাবা সম্পর্কে

বিশ্বাস এবং সংস্কারের দেয়ালটাকে ভেঙে চৌচির করে দেয়, মনটাকে নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত করে তা-হলে তাদের ভালো লোক বলব না। তারা আমাদের শত্রু। ওদের কথা বিশ্বাস করে মনটাকে অশান্ত এলোমেলো করে দিলে কার লাভ হবে বাবা। সব জেনে শুনে এই ভুল করা তোমার সাজে কি? আমরাই তাহলে মিথ্যে হয়ে যাই। তোর কি ধারণা হয়, আমরা তোর কেউ নয়! তোর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সবটাই অভিনয়! চুপ করে আছিস কেন? আমার কথার উত্তর দে। নইলে, আমি শান্তি পাব না। কথা বলার সময় রাধার জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল। চোখ দুটো লাল হয়ে গেল।

কর্ণ এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় মাথা নাড়তে লাগল। বলল : তোমার কথাগুলো এত সহজ মা, ভেতরে টনটন করে লাগে। মাঝে মাঝে খুব জানতে ইচ্ছে হয়—আমি কে? কেন জন্মালাম? কোথা থেকে, কিভাবে এলাম? আমার জন্মানোর দরকার কি ছিল? আমাকে না হলেও পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হতো না। যেমন চলছে, ঠিক সেইভাবেই চলত। আমারও প্রতিদিন যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না। বিধাতা তার বিপুল প্রাণের এতবড় শক্তির এত অপচয় করলেন কেন?

রাধার বুকের ধকধকানিটা শুরু হলো এ সময়। সে বুঝতে পারছিল, কর্ণ তাকে একটা কিছু বলতে চায়। এ হলো তার ভূমিকা। সেই চরম কথাটা কী, তাও সে আন্দাজ করতে পারে। বুকের মধ্যে তীব্র একটা ভয় হচ্ছিল তার। কর্ণ কিছু বলার আগেই সে ইচ্ছে করেই সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে বলল : তোর মন ভালো নেই বাবা। হাত-পা ছেড়ে একটু বিশ্রাম কর। আমি বরং খাবার নিয়ে আসি।

একা থাকলেই ভাবনা পেয়ে বসে। নির্জনতার মধ্যে মনটা তন্নতন্ন করে সব কিছু দেখার এবং বিশ্লেষণের অবসর পায়। অনেক সামান্য ঘটনা অসামান্য হয়ে ওঠে। তুচ্ছ-ক্ষুদ্র-লঘু ঘটনার গভীরে অনেক অদ্ভুত আশ্চর্য রহস্য তার চোখে পড়তে লাগল।

পাণ্ডু পত্নী কুন্তীর মূর্ছা যাওয়া ঘটনাটা সে একজন মানুষের স্বাভাবিক শারীরিক অসুস্থতার কারণ বলে ভাবতে পারল না। এটাই রহস্য। কিন্তু রহস্যটা কি তা অনুমান করতে না পারলেও, কুন্তীর জন্যে তার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ সুযোগ হাতছাড়া হলো, এই দুঃখটা কিছুতে ভুলতে পারছিল না। জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতির দিকে চেয়ে নিজেকে বড় বঞ্চিত ও রিক্ত মনে হতে লাগল। কুন্তীকে তার জীবনের এক অভিশাপ মনে হলো। এই মহিলার মতো বড় শত্রু তার জীবনে কেউ নেই। তার সুখের পথে কাঁটা। যে সৌভাগ্য এবং সুনাম ছিল তার প্রাপ্য এবং ন্যায্য পাওনা এই মহিলা হঠাৎ তা থেকে বঞ্চিত করল। বড় স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর। তার সারা জীবনের এক অশান্তি হয়ে থাকল সে। অর্জুনের সঙ্গে তার বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতদিন থাকবে ততদিন কুন্তীর অকারণ মূর্ছা যাওয়ার ছলনাকে ভুলতে পারবে না।

কথাটা অতর্কিতে মনে এল। আর তাতেই তার ভেতরে বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল। নিজের অজান্তেই যেন একটা গভীর সত্য বেরিয়ে এল। তার অস্ত্রকৌশল প্রদর্শনের সাথে কুন্তীর মূর্ছা যাওয়ার একটাই সম্পর্ক। সে হলো পুত্র অর্জুনের সুনাম ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থ। সেই স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে কুন্তী এক অদ্ভুত মায়াবী চোখে তার দিকে চেয়েছিল। কি যেন বিভোর হয়ে দেখছিল কুন্তী তার মুখে। কুন্তীর নীরব দুচোখে একটা ব্যাকুল বেদনাময় আর্তি ফুটে উঠল। নিজের অজানতেই সে শিউরে উঠেছিল। ওই হাসি হাসি নীরব প্রীতি ও স্নেহের স্পর্শে তার ভেতরটা কেমন একটা শির-শির করছিল। তবু কিছুতে তার দৃষ্টি কুন্তীর দিক থেকে সরিয়ে নিতে পারে নি। ওই রহস্যময়ী দৃষ্টির অন্তরালে অন্য কোনো রহস্য লুকনো ছিল। কিন্তু সে রহস্য উপলব্ধি করার মতো মন ছিল না তখন। তবু কুন্তীর সম্মোহনী দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারল না নিজেকে। কি করে করবে? দু'চোখে সুন্দর চাউনি মেলে কুন্তী যে বিভোর হয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। ঐ চাহনির ভেতর পুত্রের কাছে জননীর একটা অনন্তকালের চাওয়া ছিল। কিন্তু পাণ্ডব-

জননী কুন্তী তো তার কেউ নয়। তবু মায়াবী চোখে অমন দীন নয়নে কেন চেয়ে ছিল তার দিকে? সে কি শুধু বিভ্রম উৎপাদনের জন্যে?
নিরিবিলি একা একা নিজের মনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কর্ণ সহসা নিজেকে প্রশ্ন করল : অর্জুন জননী কুন্তী সত্যি কি মূর্ছা গিয়েছিল? তাকে নিরাশ এবং ব্যর্থ করার জন্যেই পুত্রের হিতার্থে জননীর কোনো অভিনব ছলনাও হতে পারে? তার অস্ত্র প্রদর্শনকে পণ্ড করার জন্যেই হয়তো ইচ্ছাকৃত মূর্ছা যাওয়ার ভান করল। অর্জুনের সুনাম গৌরব পাছে সে হরণ করে নেয়, অর্জুনের দীপ্তিকে ম্লান করে দেয়, তাই জননী মূর্ছা যাওয়ার এক নাটক করল। এই সহজ সরল ছলনার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পন্থা তার কাছে ছিল না। এতে অর্জুনের সম্মান রক্ষা পেল ঠিকই কিন্তু সে বঞ্চিত হলো শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব থেকে। জীবনে এরকম সুযোগ আর কোনোদিন আসবে কিনা তার জানা নেই। আসলেও কোন্ রূপে আসবে ঈশ্বর জানে?
কেমন একটা ঝিম ধরা অবসাদ নিয়ে আনমনে বসে রইল কর্ণ। বুকের মধ্যে নিদারুণ বঞ্চনার কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠল। অভিমানের বাতাস লেগে মনের অভ্যন্তরে তা একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কুন্তী যে সত্যি মূর্ছিত হয়েছিল এটা কর্ণের কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছিল না। এর গভীরে কোনো গোপন রহস্য লুকনো আছে। সেই রহস্য হয়তো কোনো-দিন জানা যাবে না। এই রহস্যের সাথে তার অস্তিত্বটাও যেন কোথায় জড়ানো আছে।
বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল কর্ণ।
বাইরে জ্যোৎস্নাভরা রাত এক ঝিমঝিম নেশাড়ু মাদকতা ছড়িয়ে রেখেছে চারধারে। কর্ণের সমস্ত মনটাকে টেনে নিল তার মায়াবী বুকে। গাছপালার ভূতুড়ে ছায়ার ওপর ডালপালার ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়া চাঁদের আলোর আঁকিবুঁকি আলপনার মতো ছায়ার সঙ্গে ঘাসের সঙ্গে মিশে এক অধরা রূপের রাজ্য তৈরি করল। সেইদিকে অপলক নয়নে চুপ করে চেয়ে থাকতে

থাকতে কুন্তীর শান্ত ব্যক্তিত্ব, নির্বাক চাহনির সকরুণ ব্যাকুলতা বারংবার তার মনকে ছুঁয়ে গেল। মনে হলো, অর্জুন জননী কুন্তী যেন কিছু বলতে চেয়েছিল তাকে। কিংবা তার স্নেহবৎসল জননী হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করতে চেয়েছিল তার অন্তঃকরণকে। কিন্তু কেন? কোন্ প্রত্যাশায়? তার সঙ্গে সম্পর্কই বা কি? নিজের কাছেই এক অদ্ভুত রহস্যময় প্রশ্ন রয়ে গেল তার। আশ্চর্য সেই মুহূর্তে কুন্তীর লাবণ্যদীপ্ত স্নেহময়ী জননীর অনন্ত বাৎসল্যময় অসামান্য মুখশ্রীতে যে কষ্টের ছাপ এবং ব্যাকুল আর্তি ফুটে উঠেছিল তার সঙ্গে চির কল্যাণময়ী জননী রাধার স্নেহকোমল মনের সহানুভূতি সমবেদনার কোনো প্রভেদ ছিল না। ঐ দৃষ্টিতে জননীরা কেবল নিজের সন্তানের দিকে তাকায়। এই অনুভূতি কর্ণকে কৃতজ্ঞ করল। তার চিত্ত প্লাবিত হলো। বুক ভাসিয়ে এল করুণা, মায়া, মমতা, শ্রদ্ধা, ভালবাসা। এই ভালবাসার উৎস কোথায় কর্ণ জানে না?

ঠিক সেই মুহূর্তে একখানা হাত এসে কর্ণের মাথা স্পর্শ করল। ভারা কোমল, ভারী স্নেহময় সে স্পর্শ। জননী রাধা ছাড়া নিবিড় মমতা মাখানো এমন হাত আর কারো হয় না। কর্ণ সেই হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে গভীর সুখে চোখ বুজে শুয়ে রইল। বলল : তুমি ঘুমোও নি মা।

আমার সব ঘুম যে আজ তুই কেড়ে নিয়েছিস। তোকে এত অস্থির হতে কখনো দেখিনি। শুয়ে তাই স্বস্তি পাই না। কী হয়েছে তোর যে, মাকেও বলতে পারছিস না।

উদ্গত দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে কর্ণ মৃদু হেসে বলল : আমার জন্যে তোমার খুব চিন্তা হয়, তাই না?

পাগল্ ছেলের কথা শোন। তুই ছাড়া আমাদের দু'জনের আর আছে কে? তোর কোনো কষ্ট হলে, আমরাও কষ্ট পাই।

কর্ণ হাসি হাসি মুখ করে বলল : তোমার কি ধারণা আমার নিজের জীবনে কোনো দুঃখ নেই, সমস্যা নেই? বাইরে কত ঘটনা ঘটছে। প্রতিমুহূর্ত কত সমস্যার পাকে পাকে ফেরে ফেরে মানুষের মনটা জড়িয়ে পড়ছে,

মানুষ নিজেও বোধহয় আগে থেকে টের পায় না। সকলকে সে কথা বলাও যায় না, ভালো করে বোঝানোও সম্ভব নয়।

মা যে সকলের থেকে আলাদা বাবা।

জানি, তবু কিছু কিছু কথা এবং সমস্যা থাকে যা একান্ত নিজের। একেবারে একার। কারোকে তার ভাগ দেওয়া যায় না। প্রত্যেক মানুষকে তা একা বহন করতে হয়। আমি বোধহয় সেই প্রকারের একজন। নইলে, আমার অভ্যন্তরে সর্বদাই কেন এক প্রদোষের রহস্যময় আলো-আঁধারি? এই আঁধার কবে কাটবে আমার? মনে হয়, এই আঁধারেই আমার সব কিছু হারিয়ে বসব। মনটা তাই ভালো নেই।

মনের আর দোষ কি? ছোট্ট তো মন। কত ধকল আর সইবে?

কর্ণ উত্তর দিলো না। হাসল শুধু।

৩

কুন্তীর শান্ত সরোবরের মতো গভীর দুই চোখের দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায় তার শরীরটা ভালো নেই। দেহ অবশ। অবসাদে আচ্ছন্ন। মনে চিন্তার কোনো আলোড়ন নেই। তবু স্মৃতির দিগন্তে অনেক অস্পষ্ট মুহূর্ত তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ছিল।

এই কর্ণ তার অতীত। তার অন্ধকার ভরা জীবনের সূর্যোদয় হওয়ার আগে এক ঝলক পূবের আলো। রঙ্গভূমিতে তাকে দেখেই কুন্তী চিনতে ভুল করল না। বাম বাহুতে জন্মগত সুবর্ণ রঙের ন্যায় কবজাকৃতি অর্বুদটা এখনও অবিকল আছে। কেবল আকারে একটু বড় হয়েছে। মুখখানি তো একেবারে তার আদলেই গড়া। দেখলে, তারই সন্তান মনে হবে। কৃপাচার্যও সেই ভুল করল। কিন্তু এরকম বিভ্রান্তি মঙ্গলজনক নয়। তাই কুন্তীর সব সময় একটা ভয় ভয় করে। কর্ণের ঐ মুখই তার দুর্ভাবনার উৎস।

রণভূমিতে তাকে দেখেই পঁচিশ বছর আগের স্মৃতি দপ্ করে জ্বলে উঠল। আর তখনই একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে তার ভেতরটা দুলে উঠল। সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল। বিচিত্র এক উচ্ছ্বাস জাগল দেহের প্রতি রক্তকণিকায়। সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না মিলিয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। চোখ দুটো বুজে এল আবেগে। তবু, এর ভেতরে একটা ভীষণ ভয়ে কেঁপে উঠল তার সর্বাঙ্গ।

কর্ণ তার কাছে মৃত আজ। তার সব পরিচয় হারিয়ে গেছে। তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তার আর। সে এখন অন্যের, তার কেউ নয়। অথচ মাতা পুত্র দুজনে কাছাকাছি থাকবে, দেখাশোনা হবে তবু কর্ণের সাথে কোনোদিনই তার আত্মজা হবে না। নিজের স্বার্থে মাতা হয়েও পুত্র কর্ণের

সঙ্গে দুটি গ্রহের মতো দূরত্ব রক্ষা করে এক আকাশে সহাবস্থান করতে হবে। বুকটা যদি ব্যথায় গুঁড়িয়েও যায় তবু কুন্তীর মুখ বুজে যন্ত্রণা সহ্য করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এটাই তার বিধিলিপি।

বুকের অভ্যন্তর থেকে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। কর্ণের মতো দুর্ভাগা এ সংসারে যত কম হয় ততই পৃথিবীর মঙ্গল। কারণ, তাকে ঘিরে যে রহস্য, সন্দেহর মেঘ স্তূপীকৃত হচ্ছে তা যে একদিন উভয়ের জীবনে অফুরন্ত চোখের জল হয়ে ঝরবে, কুন্তীর চেয়ে আর কেউ তা বেশি জানে না।

অস্ত্রবিদ্যার পরীক্ষার রণভূমিতে কর্ণ ও অর্জুনের যে রেষারেষি—দীর্ঘকাল পরস্পরের মধ্যে সুপ্ত ছিল, তা প্রকাশ্য প্রতিহিংসায়, শত্রুতায় রূপান্তরিত হলো। অথচ তারা দুই সহোদর। কেউ কাউকে চিনল না। সর্বাগ্রজ কৌন্তেয়র কোনো শ্রদ্ধা ও সম্মান পেল না পঞ্চপাণ্ডবের কাছে। বরং না জেনে পুত্রেরা তাকে অনেক অপমান অসম্মান করেছে। এই পরিতাপের দহনে কুন্তীর বুক জ্বলে যেতে লাগল। ভীমের কটুভাষা বিষবৎ বোধ হতে লাগল। কানের পর্দায় বাজছিল ভীমের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, ঘৃণা মিশ্রিত বাক্যগুলো। রূঢ় কণ্ঠে বলল : চম্পাপুরীর এক সামন্তের পুত্র হয়ে নিজেকে রাজপুত্র বলে আত্মশ্লাঘা করতে তোমার একটু লজ্জা করল না কর্ণ? শৃগাল কখনও পশুরাজ হওয়ার শখ করে না। কিন্তু তুমি রাজপুত্র হওয়ার আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখ। ধন্যি তোমার লোভ। পতঙ্গ মরার জন্যে আগুনে ঝাঁপ দেয়। মরার জন্যে নিয়তি তোমাকে অর্জুনের দিকে টানছে। তোমার সাধ্য কি নিজেকে ঠেকানোর। তবু বলি, মিছেমিছি অর্জুনের হাতে প্রাণটা কেন দেবে? তার চেয়ে মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে যাও। অর্জুনের সঙ্গে কোন্ স্পর্ধায় লড়াইয়ের স্বপ্ন দেখ। সুনাম অত সহজ নয়। তারপর ঈষৎ বঙ্কিম কটাক্ষ করে বলল : তুমি চাইলেই অর্জুন কৃপা করতে পারে তোমায়।

ভীমের কথা শুনে অপমানে কর্ণের মুখ আগুনের মতো গনগন করছিল। তার সর্বাঙ্গ থেকে একটা তাপ নির্গত হচ্ছিল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে

দাঁতে দাঁত চেপে বলল : ভীম, তোমার মতো কটূবাক্য বলতে শিখিনি। সব মানুষই সম্মানের যোগ্য। যে নিজেকে সম্মান করতে শেখে নি সে অন্যকে সম্মান করবে কোথা থেকে ? মানুষের আকৃতি থাকলে মানুষ হয় না। মনুষ্যত্ব সকলের থাকে না। এই বস্তুটি হীরের দ্যুতি। বানর কি মুক্তোর মালার কদর বোঝে ?

কর্ণের কথা শুনে ভীম একটুও দমলো না। তার কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। বিদ্রূপ করে বলল : এই মরেছে, এ আবার উপদেশ দেয় ! তোতাপাখির মতো আদর্শের বুলি পড়ে।

অপমানে কর্ণের বুকের ভেতরটা জ্বলতে লাগল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ভীমের দিকে চেয়ে বলল : আমাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে কোনো লাভ নেই। অত সহজে আমাকে নিরস্ত করতে পারবে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে তেজ আমার বুকে নিস্তেজ হয়েছিল তোমার কথায় তা দাবানলের মতো জ্বলে উঠল। ঐ জ্বলন্ত আগুনে কর্ণ অথবা অর্জ্জুনের একজনকে আত্মাহুতি দিতে হবে। কিংবা দু'জনকেই পুড়ে মরতে হবে। আমি অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন করতে আসিনি। আমি চাই বীরের গৌরব এবং মর্যাদা। এই চাওয়াটাই আমার বাঁচার অধিকার। মানুষের মতো মানুষ হওয়ার এক মহান প্রতিযোগিতার আহ্বান।

কর্ণের তেজোদ্দীপক ভাষণ দুর্যোধনকে উৎফুল্ল করল। হৃষ্ট হয়ে তাকে বারংবার বাহবা দিলো। তার কথাগুলো তারিফ করল। তারপর ভীম ও অর্জুনের দিকে চেয়ে বলল : খাসা বলেছে কর্ণ। এতেও তোমাদের লজ্জা নেই। থাকবে কোথা থেকে ? তোমাদের জন্মবৃত্তান্ত তো গর্ব করে বলার কিছু নয়। আমাদের কোনো কিছুই অজানা নয়। তোমরা নিজে হীন বলেই অন্যদের হীন চোখে দেখা তোমাদের স্বভাব।

সেই মর্মান্তিক দুর্বাক্য স্মরণ করে কুন্তী পুনরায় বুকের ভেতর একটা জ্বালা অনুভব করল। অপমানে তার সারা শরীর গরম হয়ে গেল। এই অসম্মান তার প্রাপ্য। এর স্রষ্টা সে নিজে। বিধাতাপুরুষ তাকে নিয়ে যে নাটক

আরম্ভ করল তার শুরুটাই সে শুধু দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু এর শেষ কোথায় কিছুই জানে না। বিধাতাপুরুষের হাতে লেখা হচ্ছে তার ভবিতব্য। যে ছবি তার কল্পনায় নেই।

চোখ বুজে বিছানায় শুয়েছিল কুন্তী। ঘুম এল না। মুখে চোখে জল দিয়ে এল। তবু অপমানের দাহে জ্বলছিল ভেতরটা। নিজের যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। কর্ণের মুখখানা কেবলই মনে পড়ছিল। ঐ মুখ আর না দেখার জন্যে চোখ বুজল কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। বরং, চোখের পাতা বন্ধ থাকলে অনেক কিছু গভীর করে ভাবা যায়। মনের সাথে নিভৃতে একা একা কথা হয়। সে সব কথার কোনো মানে হয় না। তবু মনের ভেতর তার নিঃশব্দ আনাগোনা ফুরোয় না। মনটাকে একদণ্ড একা থাকতে দেয় না। ভুলে থাকতেও দেয় না। এ এক বিষম জ্বালা।

কুন্তী ভুলতে পারছিল না তার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিণামকে। নিজের মনেই প্রশ্ন করল : জীবন নাট্যের এখন কোন্ অংক, কোন্ দৃশ্য চলেছে তার? মনে মনে তার হিসাব করে নিয়ে নিজের মনে নিরুচ্চারে বলল : এখন দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্য চলেছে।

প্রথম অংকের শুরু কুন্তীভোজের প্রাসাদে। কত ঘটনা ও দৃশ্য তার জীবনের সাক্ষী। বন্ধ চোখের তারায় নয়, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে স্মৃতির পর্দায় একটা নাটকের মতো দেখতে লাগল : দুর্বাসার আতিথ্য, কানীন পুত্রের জন্ম, পাণ্ডুর সাথে পরিণয়, শতশৃঙ্গ পর্বতে নির্বাসন, বিদুর, ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন, হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন, পথিমধ্যে পাণ্ডুর মৃত্যু, মাদ্রীর সহমরণ, কত কি!

নিজের অজান্তে একটা বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস পড়ল কুন্তীর। একটা ছোট্ট জীবনে অতর্কিতে কত কী ঘটে যায়! অথচ, তার সব দায়ভার প্রত্যেককে একা একা বহন করতে হয়। তাকেও করতে হচ্ছে। ঋষি দুর্বাসাকে নিয়ে তার জীবননাট্যের প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যের শুরু। নিয়তির মতো নিঃশব্দে তার জীবনে একদিন এসেছিল এই ঋষি। তার কথা মনে হলে বুকের রক্ত জমে যায়। প্রাণের স্পন্দন থেমে যায়। দুর্বাসার সাথে দেখা না হলে তার

জীবনটা হয়ত এভাবে শুরু হতো না।
এক মহান ঝড় নিয়ে দুর্বাসা তার জীবননাট্যে প্রবেশ করল। দুরন্ত ঘূর্ণাবর্তে তার সব কিছু তছনছ করে দিলো। ছিন্নভিন্ন করে ফেলল তাকে। অথচ, এই দুর্ভাগ্যের জন্যে সে একটুও দোষী নয়। কিন্তু সব ঝাপ্টাটুকু তাকেই বুক পেতে সইতে হলো। ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ জানে না সেই গোপন জীবন রহস্য। সেদিনের সেই স্মৃতি এই মুহূর্তে জ্বলজ্বল করে উঠল তার চেতনার মধ্যে।
লোকলজ্জার ভয়ে অবৈধ সদ্যোজাত শিশুকে নিজের হাতে একটা ছোট্ট ডিঙা করে অকূলে ভাসিয়ে দিলো নিজের অপকর্ম ঢাকতে। আর তখন কী নিদারুণ কষ্টে, দুঃখে, তার বুকের ভেতরটা জ্বলছিল। ছোট্ট নিষ্পাপ শিশুকে ডিঙায় শুইয়ে দিতে হাত তার উঠছিল না। মাথা ঝিমঝিম করছিল। সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। তবু উপায় ছিল না। বোধহয় সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইভাবেই করতে হয়।
বুকের ভেতর অস্ফুট চাপা কান্না তার ডুকরে ডুকরে উঠছিল। উদ্গত কান্না চাপতে গিয়ে হিক্কার মতো একটা শব্দ হচ্ছিল। জননী ধরিত্রী যেমন যেমন বলছিল যন্ত্রের মতো সে তা করছিল। তারপর, স্রোতের টানে ডিঙাটা শিথিল হাতের মুঠো থেকে স্খলিত হলো। নিমেষে নাগালের বাইরে চলে গেল। সেই মুহূর্তে বুকটা সব হারানোর শূন্যতায় হাহাকার করে উঠল। অস্ফুট আর্তনাদ করে ধরিত্রীর কোলে আছড়ে পড়ে সংজ্ঞা হারাল।
সংসার ও জীবনে কুন্তীর সব চাইতে নিরাপদ আশ্রয় এবং শান্তির কোল জননীর এই বুক। এতবড় একটা আঘাত ও ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে তার বেশ সময় লাগল। তার সেই প্রাণচঞ্চল সদাহাস্যময়ী স্বভাবটা হারিয়ে গেল। দিনে রাতে, সময়ে অসময়ে সর্বক্ষণ ভাবত সন্তানের কথা। কি হলো তার, কোথায় গেল, বেঁচে আছে কিনা? কার ঘরে, কি ভাবে আছে? এসব কথা ভেবে কূল-কিনারা খুঁজে পায় না। মনে হয়, হাত-পা

বাঁধা এক অসহায় দুঃখের অশান্তির গুরুভার একটা জগদ্দল পাথরের মতো তার বুকে চেপে বসে আছে। ভালো করে কথাও বলে না কারো সাথে। তার সবচেয়ে বেশি রাগ দুর্বাসা, আর পিতা কুন্তীভোজের ওপর। কুন্তীর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও কষ্ট হয় কুন্তীভোজের। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই একদিন তার ঘরে এলো। মাথায় হাত রাখল। বড় স্নেহের সে হাত। সেই হাতের ছোঁয়া পেয়ে কুন্তীর ভেতর বরফ কঠিন অভিমান গলতে শুরু করল। পিতার বুকের ওপর মুখ লুকিয়ে সে কাঁদল। অসহায়া কন্যাকে বুকে নিয়ে বলল : বোকা মেয়ে! যা হওয়ার তা তো হয়েছে। তার জন্যে আত্মপীড়ন করে লাভ কি? এখনও তোর আস্ত জীবনটা পড়ে আছে।

পিতার ক্ষমা ও স্নেহে তার কান্না উপছে পড়ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। কেঁদে কেঁদেই বলতে লাগল : কী আছে আর জীবনে? বেঁচে থেকে সুখ কী? কার জন্যে, কোন্ আশায় বাঁচব? এই পৃথিবীতে কারো বুকে যদি একটু স্নেহ, মমতা, প্রেম, ক্ষমা থাকত তা-হলে এমন করে তাকে হারাতে হতো না। নিজের হাতে তাকে আমি মেরেছি। আমি খুনী। এই দুঃখ, অপরাধ, পাপটা যে আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না।

কুন্তীভোজ তার হেঁট মাথাটা ধীরে ধীরে তুলে ধরল। ঝুলে পড়া চুলগুলো যত্ন করে একটা একটা করে সরিয়ে দিতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর, চোখের জল মুছিয়ে দিলো। বলল: আমার নিজের কোনো সন্তান হয় নি। তুই আমার সব। তোকে পেয়ে আমার সব অভাব ঘুচে গেছে। তোর কষ্ট যে আমি সইতে পারব না। আমার চোখের ওপর সারা জীবন একটা ভুলের জন্যে দুঃখ ভোগ করবি এমন কাজ কখনও করতে পারি আমি? তোর ছেলে বেঁচে আছে। ভালো জায়গায় আছে।

কুন্তীর কান্না থেমে গেল। বিস্ময়ে দুই চোখ স্থির। অবাক মুগ্ধতা নামল দু'চোখের চাহনিতে। উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করল : কেমন করে তুমি জানলে সে বেঁচে আছে?

তার ওপর নজর রাখার জন্যে গোপনে আমি বিশ্বস্ত চর নিয়োগ করে-ছিলাম। তারা খবর এনেছে বৃষ্ণিবংশের চম্পাপুরীর সামন্তরাজ অপুত্রক অধিরথ তাকে আদর করে ঘরে নিয়ে গেছে। ভগবান যার সহায় তার ক্ষতি কেউ করতে পারে? ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই সে এখন অধিরথের পুত্র কর্ণ। এবার শান্তি তো।

কুন্তী কথা বলতে পারল না। মাথা হেঁট করে রইল।

স্তব্ধ নির্বাক কন্যার মাথায় হাত রেখে কুন্তীভোজ স্নেহব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল: পৃথা, মা আমার!

বাবা! চিরকালের মতো হারানোর কষ্টক্লিষ্ট আর্তস্বর বেরোল পৃথার কণ্ঠ দিয়ে, যার নাম হাহাকার। একবারই মাত্র আর্তকণ্ঠে ডুকরে কেঁদে অদম্য বেগে কুন্তীভোজের বুকের ওপর ভেঙে পড়ল।

কক্ষের ছাদে কুন্তীর দৃষ্টি স্থির। অন্ধকারে সে কিছুই দেখছিল না। সুদূর অতীত কুন্তীর চোখ অশ্রুবাষ্পে ঝাপ্সা করে দিলো না আজ। কিংবা কোনো বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসও পড়ল না। বুকের ভেতর সেই দাহ অথবা সুতীব্র জ্বালা, যন্ত্রণার কোনো অনুভূতি নেই। অন্য এক ধরনের প্রতিক্রিয়া ছিল। যার নাম আতংক। রাশি রাশি আতংক যেন কর্ণের মূর্তি ধরে ছুটে আসছে তাকে গ্রাস করতে। মনে হতে লাগল, জীবনের এক অজ্ঞাত অন্ধকারের শূন্য গহ্বরের মধ্যে তার সমস্ত অস্তিত্বটা ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে। আর ঐ অতল অন্ধকারের গহ্বর থেকে তার কানীন পুত্র হিংস্র জানোয়ারের মতো আক্রোশ নিয়ে নিঃশব্দে থাবা মেলে তার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। এই সন্তানটির হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই। দুর্বাসার মতো সেও তার জীবনে আর এক কুগ্রহ। তার সব সুখ শান্তি হরণ করে নিতে ধূমকেতুর মতো উদয় হয়েছে। এক অনর্থ বাধিয়ে তোলার জন্যেই বিধাতা পুরুষ যেন তার জীবন নাট্যের দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে পার্শ্বচরিত্র করে পাঠিয়েছে। কুন্তীর বুক জুড়ে ভয় আর দুর্ভাবনার এক ঝড় উঠল। তার অস্তিত্বের শিকড় ধরে যেন টান দিলো। সে কিছুই সঠিকভাবে চিন্তা

করতে পারছিল না। উচিত অনুচিতের বোধ তার লুপ্ত হয়ে গেল। কেমন একটা দিশাহারা ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

অস্ত্র পরীক্ষার রঙ্গভূমিতে কর্ণকে প্রথম দর্শন করে মনে যে আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল তা কৌরব পাণ্ডবের বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি প্রত্যুক্তির খরতাপে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাষ্পীভূত হয়ে গিয়েছিল। একটা ভয়ংকর ভয় তখনই তার মনকে গ্রাস করেছিল। তার উন্মাদ প্রতিক্রিয়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাকে সম্মোহিত, স্তব্ধ, বাক্যহারা করল। ভয় তার সমস্ত সত্তাকে আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দিতে লাগল। কৌরব-পাণ্ডবের মধুর সৌভ্রাত্র এবং সুসম্পর্ক অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষার রঙ্গভূমিতে তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল। দুই ভ্রাতার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াল দূরত্বের একটা কঠিন দেয়াল। এই দেয়ালটা ভেঙে তারা আর কোনোদিন ভাই হয়ে উঠতে পারবে না। এক বাড়িতে কাছাকাছি পাশাপাশি বাস করবে, থাকবে, তবু কারো সঙ্গে প্রীতি কিংবা সদ্ভাব থাকবে না, কেউ কারো বন্ধু কিংবা ভ্রাতা হয়ে উঠবে না। পরস্পরকে তারা শত্রুর চোখে দেখবে। এ এক ভয়ংকর অবস্থা। কুন্তীর ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। রণভূমিতে মূর্ছা যাওয়ার আগে ঠিক এরকম একটা অনুভূতি সমস্ত চেতনা লুপ্ত করে দিয়েছিল।

কুন্তীর মনে হলো, তার সত্তা এখন দ্বিখণ্ডিত। কর্ণের প্রসব সময় যে জীবন ছিল প্রথম খণ্ড মাত্র, তাকে দেখার পর সে হলো দ্বিখণ্ডিত। কর্ণকে রণভূমিতে দর্শনের পর তার মনের ভেতর যে ঝড় উঠেছিল, সেই ঝড়ের পর তার দ্বিতীয় জন্ম হয়। অন্তরের এই প্রতিক্রিয়া তার নতুন দ্বিতীয় জীবনের সূচনা মাত্র। কেমন হবে এই দ্বিতীয় খণ্ডের জীবনযাত্রা কে জানে?

কুন্তী সত্যিই জানে না। জানবে কেমন করে? অনাগতকে তো কেউ দেখতে পায় না। কেবল কল্পনা করতে পারে। বাকী জীবনটা তার এক কঠিন সংগ্রামের জীবন। বৃহত্তর জীবন সংগ্রামের আহ্বান সত্তার মধ্যে তার

চেতনায় স্পন্দিত হতে লাগল। এই সন্তানকে ঘিরে যে নব নব সমস্যার জট পাকাবে এ জীবনে, তাতে সন্দেহ রইল না।

অথচ এই সন্তান হওয়ার জন্যে তার কোনো দোষ নেই। অদৃষ্টের দুরন্ত আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে গেল দুর্বাসার দিকে। সে এক গল্প। জীবনের নাটক। চোখের সামনে ভেসে উঠল তার দুঃসহ স্মৃতি।

কোপন স্বভাবের ঋষি দুর্বাসা একদিন আচমকা কুন্তীভোজের প্রাসাদে এলো। ছিদ্রান্বেষী ঋষির পরিচর্যা করে পরিতুষ্ট রাখতে কুন্তীভোজের ত্রুটি ছিল না। পাছে ঋষির কোপে পড়ে, তাই তার সেবা শুশ্রূষা ও পরিচর্যার সব ভার মুকুলিকা বালিকা বয়সী পৃথাকেই দিলো।

কুন্তীভোজ পৃথাকে সাথে করে দুর্বাসার কক্ষে গেল। বলল: ঋষিবর, আমার এই কন্যা, রূপে সরস্বতী, গুণে লক্ষ্মী। আপনার দেখাশোনার ভার ওকেই দিলাম। বালিকা হলেও পৃথা আপনার যত্নের কোনো ত্রুটি করবে না।

পরিচারিকারা পৃথাকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল। প্রতিমার মতো দেখাচ্ছিল তাকে। বালিকার দিকে দুর্বাসা কেমন হিমশীতল শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে তার কুঞ্চিত চোখে স্নিগ্ধ হাসির আলো ফুটে উঠল। চিবুক নেড়ে আদর করল। কুন্তীভোজের দিকে তাকিয়ে বলল: এ যে দেখছি সরোবরে ফোটা একটা তাজা শ্বেতপদ্ম। বড় ভালো মেয়ে। ভারী মিষ্টি চেহারা। মূর্তিমতী সেবা।

ঋষির প্রশংসায় পৃথা ভীষণ লজ্জা পেল। কুন্তীভোজের পোশাকের তলায় মুখ লুকোল।

দুর্বাসা তার হাতটা ধরে কাছে টেনে নিয়ে অন্তরঙ্গ গলায় বলল: শুভ্র জ্যোৎস্নার মতো তোমার কমনীয় মুখখানায় কে যেন মুঠো মুঠো আবির মাখিয়ে দিয়েছে। ভারী সুন্দর লাগছে তোমায়। কিন্তু এত লজ্জা কেন? আমাকে লজ্জা!

বালিকা হলেও পৃথা নারীসুলভ ভঙ্গীতে মাথা নিচু করে মুখ টিপে হাসল। সলজ্জভাবে ঋষির হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল।

দুর্বাসাকে পৃথার খুব ভালো লেগে গেল।

ঋষির পূজার উপকরণ গুছিয়ে দেওয়ার জন্যে রোজ ফুলের সাজি ভরে পৃথা আসত ভোরের আবছায়ায় কুয়াশায় গা ঢেকে। আসত নিঝুম ভরদুপুরে ঋষির আহারাদির কি হয়েছে না হয়েছে তার খোঁজ করতে। আসত নিশিরাতের অন্ধকারে বিশ্রাম ও নিদ্রার সুবন্দোবস্ত করতে। তারপর ঋষিকে কিছুক্ষণ সঙ্গ দিয়ে গল্প করে ফিরত নিজের ঘরে।

এইভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। নিষ্পাপ বালিকার অজান্তে দুর্বাসা নিঃশব্দে তার সুযোগ করে নিচ্ছিল। কিন্তু বালিকা পৃথা তার কিছুই টের পেল না। ঋষির সম্পর্কে তার মনে কোনো কুভাব জাগল না।

পৃথার প্রথম দিনের সেই দর্শন আর স্পর্শ ঋষির রক্তের ভেতর আগুন ধরিয়ে দিলো। আদর করার ছলে তার হাতখানা ধরে টেনে কাছে বসাল, তারপর হঠাৎ তার হাল্কা শরীরটা দু'হাতে তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে লোফালুফি করতে লাগল। এরকম একদিন দু'দিন করতে করতে পৃথার মনের বাধা এবং সংকোচ কেটে যায়। পৃথা সহজ এবং স্বাভাবিক হয়। ঋষির আকর্ষণে সাড়া দেয়। দুর্বাসা বুঝতে পারল, তার মনের আকাশে রঙ লেগেছে। তার দুই চোখের বিচিত্র চাউনি ঋষিকে প্রমত্ত আবেগে উন্মাদ করে তোলে। দুর্বাসা এখন অনায়াসে বিনা দ্বিধায় তাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে নিবিড় আশ্লেষে চেপে ধরে। মুখের কাছে মুখ নিয়ে ঘষে। আর ক্রমে ঘন হয়ে তার নিঃশ্বাসের সীমানায় টেনে এনে চুমু দেয়। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, ঘর সংসার করিনি, একটা রক্ত মাংসের মানুষের ভালবাসার, ভালো লাগার স্বাদ জীবনে পাইনি। তোমার এই গোটা শরীরটা আমার বুকের খাঁচায় যদি ভরে রাখতে পারতাম—। জান পৃথা, এইভাবে বুকে নিয়ে তোমাকে আদর করতে করতে মনে হয় তোমার শরীরে নদী হয়ে মিশে যাই। হারিয়ে যাই অগাধ সাগরে। কী ভালো যে লাগে।

কাতুকুতু দিলে যেমন গা সিরসির করে, হাসি পায়, ঋষি তাকে বুকে

জাপ্টে ধরলে অনুরূপ একটা সুড়সুড়ি লাগে পৃথার। খিলখিল করে সরল মনে হাসে। দুর্বাসার বুকের ভেতর তার ছোট্ট শরীরটা দমকা হাসিতে ছটফট করে। হাসি থামিয়ে তার গালে মুখ রেখে বলে, আপনি আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। এমন করে কেউ আমাকে আদর করে না। আদরে যে এত মজা আছে, ভালো লাগা আছে আপনাকে না পেলে জানা হতো না। ঋষিবর, আপনাকে আমারও খুব ভালো লাগে।

দুর্বাসা কথা বলতে পারত না। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি নীরব ভাষায় কথা বলত।

পৃথার মনের অতলে জন্ম নিল এক বিচিত্র অনুভূতি। পুরুষের নিবিড় বাহুবন্ধনে নিষ্পেষিত হতে যে এত উল্লাস, উত্তেজনা, শিহরণ জাগে শরীরের মধ্যে তার এক অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে মনটা ভরে রইল। দুর্বাসার সঙ্গে তার বয়সের ব্যবধান, মনের দূরত্বের দেওয়ালটা আর থাকল না। দেহের বলে দুর্বার ঝড় তুলল দুর্বাসা। সে যেন থামতে চায় না আর। পৃথার দিনরাত্রি, বর্তমান ভবিষ্যৎ সব হারিয়ে গেল সেই উন্মাদ ঝড়ের তাড়নায়।

দুর্বাসা আচমকা একদিন বিদায় নিল। চোখের দেখা দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা তার মনকে সিক্ত ও বিষণ্ণ করে রাখল। এক অসহনীয় দুঃখবোধের সঙ্গে নিঃসঙ্গতার বেদনাও মিশেছিল।

হঠাৎ-ই একদিন পৃথাকে আচমকা দেখে ধরিত্রী চমকে উঠল। অপলক বিস্ময়ে সন্দিগ্ধ চোখে তার শরীরের দিকে চেয়ে রইল। ধরিত্রী কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। চোখের তারায় উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল।

ধরিত্রীকে এমন স্তব্ধ, গম্ভীর, বাক্যহারা হতে দেখেনি পৃথা। তার ভয় করতে লাগল। অপ্রতিভতায় কেমন জড়সড় হয়ে গেল। বলল : মা, অমন করে কি দেখছ আমাকে? আমার কিচ্ছু হয় নি। তোমাকে চুপ করে থাকতে দেখলে আমার ভীষণ ভয় করে। তুমি কথা বল।

উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় ধরিত্রীর বাক্‌রোধ হয়ে এল। বলল : কী সর্বনাশ করেছিস! সারা শরীরে তোর ও কোন্ চিহ্ন ফুটে বেরোচ্ছে? এখন উপায়? এ

সর্বনাশ তোর কে করল ?

ধরিত্রীর ভর্ৎসনা তিরস্কার তাকে এক আত্মসচেতন নারী করে তুলল। তার সমস্ত সত্তার মধ্যে মাতৃত্বের প্রথম স্পন্দন অনুভব করল। বুক জোড়া ভয় উৎকণ্ঠায় তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। মনে হলো, দুর্বাসা খেলনার মতো তার সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করে চলে গেছে। আর তাকে দিয়ে গেছে নারীর কলংক। অবৈধ মাতৃত্ব স্বীকার করার মধ্যে কত যে লজ্জা লুকনো, কী দুঃসহ আত্মগ্লানি আর সীমাহীন পাপ বোধ লুকনো আছে তার কথা চিন্তা করে সে দিশাহারা হয়ে পড়ল। একটা বিমূঢ় নিশ্চল পরিস্থিতি। থর থর করে কাঁপছিল সে। তারপরেই কেমন একটা দুঃসহ অসহায়তায় ধরিত্রীকে জড়িয়ে ধরে ভেঙে পড়ল নিঃশব্দ কান্নায়।

ধরিত্রী তার মাথাটা কাঁধে ধরে সান্ত্বনা দিলো। কথা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল অশ্রুপাতে। ভিজে, ভাঙা গলায় বলল : পাগলী মেয়ে। এত সহজ সরল হলে চলে না! ঋষিরা প্রতারক, ভণ্ড। মুনিদের মতো তারা ঘর সংসার করে না, ব্যভিচারী করে বেড়ায়। এসব জেনেও ভুল করতে আছে ? তোর পিতা ধর্মভীরু। তাই ঋষি শাপের ভয় করে। কিন্তু একজন বালিকার সঙ্গে ব্রহ্মচারী ঋষি এমন ব্যবহার করবে সেও ভাবেনি। দোষ কারো নয় মা, দোষ আমাদের অদৃষ্টের। এখন যা হলো তার জন্যে জীবনভোর তোকে অনেক মূল্য দিতে হবে। সেই কথা ভেবে আমি শুধু ভয় পাচ্ছি। এখন কী করলে সব দিক রক্ষা পায় তার একটা উপায় তো স্থির করতে হবে।

কেটে গেল আরো কিছুদিন। কুন্তীভোজ অনেক ভাবনা-চিন্তা করে স্থির করল, পৃথাকে সর্বাগ্রে লোকচক্ষুর আড়াল করতে হবে। সেজন্যে তাকে একটি স্বতন্ত্র প্রাসাদে লুকিয়ে রাখা উচিত মনে করল। তার অনুপস্থিতি যাতে কৌতূহলের কারণ না হয় তাই প্রাসাদে রটিয়ে দিলো, ঋষি দুর্বাসার কাছে যে মন্ত্র নিয়েছে পৃথা তার কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পিতা-মাতা ছাড়া আর কারো মুখ দর্শন করতে পারবে না। এই সময়ে তার প্রাসাদে

অন্য কেউ প্রবেশ করতেও পারবে না।

দুর্বাসার ওপর ক্রোধ, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, ঘৃণা তাকে সুদূর অতীত থেকে বর্তমানে প্রত্যাবর্তন করাল। যখন সম্বিৎ ফিরে পেল, তখন দেখল সে শয্যায় শুয়ে নেই, এক অস্থির উত্তেজনায়, অশান্ত মন নিয়ে বিছানা থেকে নেমে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে আছে।

যমুনা থেকে ফুরফুরে বাতাস এসে তার ভেতরের সব সঞ্চিত উত্তাপকে নিঃশেষে শুষে নিয়ে তার শরীরটাকে শীতল করে দিচ্ছিল। স্নিগ্ধ করে তুলছিল। আর তার ভেতরটা প্রশান্তিতে ভরপুর হয়ে উঠছিল। তবু বুকের ভেতর জমে ওঠা পাহাড়-প্রমাণ ঘৃণা যেন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল। আকাশের দিকে চেয়ে নিরুচ্চারে বলল : দুর্বাসা, তুমি ভণ্ড প্রতারক ছাড়া কিছু নও। আমার অন্তহীন সারল্য আর বিশ্বাসের ওপর যে আঘাত হেনেছ, মেয়েদের জীবনে তার চাইতে বড় আঘাত, বড় পরাজয় আর কিছু নেই। কর্ণ তোমার সন্তান। তোমার রক্ত তার শরীরে। আমার জীবনের সব কিছু ওলট-পালট করে দেবার জন্যে কর্ণকে রেখে গেছ তুমি। সম্ভবত আমাকে কোনোদিন শান্তিতে থাকতে দেবে না সে। কিন্তু আমি তোমার কী করেছি? সর্বস্ব সমর্পণ করা কি অপরাধ? তাহলে কেন এই কলঙ্ক? কেনই বা তার শাস্তি?

কুন্তীর চোখ জ্বালা করছিল এবং চোখে জল এল। বড় একা আর নিঃসঙ্গ মনে হলো। কর্ণের জন্যে তার অন্তরে এখন এক কণা স্নেহ পর্যন্ত নেই। থাকবে কোথা থেকে? স্নেহ-মমতার কোনো সম্পর্কই তার সঙ্গে গড়ে ওঠেনি কোনোদিন। রক্তের সম্বন্ধ, সেও একটা সংস্কার। মনে করলে ভেতরটা সিরসির করে, না করলে কিছু হয় না। আসলে ভালবাসা দিয়ে, মমতা দিয়ে সব সম্বন্ধ তৈরি হয়। শুধু রক্তের সম্বন্ধ কিছু নয়। কেবল তার মুখের সাথে কর্ণের সাদৃশ্য থাকার জন্যে একটা ভয় এবং দুর্ভাবনা তার ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছিল। এই সাদৃশ্য তাকে কখন কোন্ সমস্যায় জড়িয়ে ফেলবে তার ভয় তাকে বিচলিত করে তুলল।

কুন্তীকে দেখে কর্ণও চমকেছিল। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজের মুখের দিকে একবার করে তাকায় আর কুন্তীর মুখ কল্পনা করে। তারা মাতা-পুত্র নয়। অথচ কী অভিন্ন তাদের মুখাবয়ব! এমন আশ্চর্য সাদৃশ্য হয় কেমন করে? এই সাদৃশ্য হেতু কুন্তীর প্রতি সে কেমন একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ অনুভব করল। এই টানটা হয় কেন, কর্ণ জানে না। যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে তার কোনো কারণ খুঁজে পায় না। একা থাকলে মনে হয় কুন্তীর সঙ্গে তার জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক।

কুন্তীও অবাক মুগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়েছিল। নয়ন কোণে তার অশ্রু-বিন্দু টলটল করছিল। তার চাউনিতে দৃষ্টির অতীত কিছু ছিল। তার অন্তরের নীরব ভাষা যেন নিঃশব্দে কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু তার অর্থপূর্ণ ইংগিত সে বোঝে নি। তার মায়াবী চাহনি ছলনা নয়। অন্য কোনো গভীর আবেদন নিয়ে বাঙ্ময় ছিল। স্বার্থের সম্পর্কও হতে পারে। অর্জুন পুত্র তার। পুত্রের দুর্গতির এবং পরাজয়ের কথা ভেবেই হয়ত বিপন্ন মাতৃহৃদয় অস্থির হয়ে তাকে নিবৃত্ত করার আবেদন করেছিল। নয়নের জল তার সেই নীরব ভাষা।

এই এক চিন্তায় কর্ণের ভেতরটা একটা অদ্ভুত আবেগে কম্পমান হলো। কেন যে এত অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত হয় অন্তরটা কর্ণ জানে না। তবে তার জন্মের পেছনে যে একটা রহস্য লুকোনো আছে অনেকের সন্দেহে তা বার বার প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর তখনই মনটা ভীষণ অশান্ত হয়ে পড়ে। কিছু ভালো লাগে না। কিন্তু এই জানাটা বোধহয় কোনোদিনই তার হবে না। মনের সন্দেহকে জানতে গেলে রাধার মাতৃত্ব, অধিরথের পিতৃত্ব এবং তাদের বাৎসল্যের ওপর মিথ্যে সন্দেহ করা হয়। কৌতূহলের বশে এরকম কোনো সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করলে, তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। এদের সঙ্গে তার অন্তরের বন্ধন, শ্রদ্ধা, ভালবাসার সম্পর্ককে নিজের হাতে হত্যা করা হয়। জন্মের পেছনে সত্যি কোনো রহস্য যদি থাকেও,

তার সত্য উদ্ঘাটন করে কি লাভ? তাতে একসঙ্গে হারাতে হবে অনেক কিছু। সত্য একবার প্রকাশ হয়ে পড়লে তার লজ্জায় এবং সংকোচে কেউ কারো কাছে আর পৌঁছতে পারবে না। তাদের সম্পর্কের মধ্যে ক্রমশঃ মাথা তুলে দাঁড়াবে দূরত্বের কঠিন দেওয়াল। যার নাম সত্য। সে কিছুই দেবে না জীবনকে, কেবল ফাটলটা বড় করবে।

জ্ঞান থেকে মা বলে যাকে জানল, যাদের কৃপায় এবং অনন্ত স্নেহ ভালবাসা পেয়ে বড় হলো তাদের প্রাণে আঘাত হানলে; যে ডালে বসে আছে সেই ডালই কাটা হয়। এ তো আত্মহনন। তবু মনে হলো কৌতূহল বড় দুর্বার। কর্ণের দু'চোখের তারায় ফুটে উঠল এক অব্যক্ত অসহায়তাজনিত ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। কর্ণের মনের ভেতর যে প্রতিক্রিয়াই হোক, সে পারে নি রাধার বিহ্বল করা দৃষ্টির সামনে নিজের মনের অস্থির জিজ্ঞাসা প্রকাশ করতে। ইচ্ছে হলেও একটা বিরাট কিছু হারানোর ভয়ে থমকে গেছে। ভাগ্যবিড়ম্বনায় সত্যি যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে সে তো ফিরে যেতে পারবে না তার হারানো জায়গায়। যদি কেউ তাকে নিষ্ঠুর হাতে দূরে সরিয়ে দিয়ে সুখী হয় সে সুখ কেড়ে নিয়ে তার নিজেরও কোনো সুখ নেই। সুখ মানুষের মনের ব্যাপার। কিন্তু সেই সুখ একটা কাল্পনিক সংশয়ে সন্দেহে বিষিয়ে তুলছে সে। মিছিমিছি একটা সংশয় সৃষ্টি করে মনকে নিরন্তর উত্তপ্ত ও উত্তেজিত করে তোলার কোনো অর্থ হয় না। কপাল ঠুকে কেউ অদৃষ্টের লিখন মুছে ফেলতে পারে না। এটা কোনোদিন মুছবারও নয়। মিছিমিছি নিজে কষ্ট পাওয়া এবং পরিজনদের কষ্ট দেওয়া। তার চেয়ে জ্ঞান হতে যাকে সত্য বলে জানে, তার চেয়ে বড় সত্যতা জীবনে আর কিছু নেই। জননী রাধার অগাধ স্নেহ-ভালবাসা মমতায় ভরা সুন্দর জীবনের মতো সার্থক সুন্দর জীবন আর কিছু নেই। এটাই তার আসল জীবন। একমাত্র বাস্তব এবং সত্য। অনেক স্মৃতি তার জেগে উঠল। সেই স্মৃতি আজো যেন স্নিগ্ধ মাধুর্যের জাল বুনে যায় তার অন্তরে।

৪

হস্তিনাপুর থেকে দুর্যোধনের বার্তা নিয়ে কর্ণের কাছে দূত এল। দূতের সাথেই হস্তিনাপুর যেতে অনুরোধ করেছে দুর্যোধন। দু' ছত্রের এক অপ্রত্যাশিত জরুরী পত্র কর্ণের মনে ঝড় তুলল। দুর্যোধনের সমাদরপূর্ণ আকস্মিক আহ্বানের কোনো তাৎপর্য বুঝতে পারল না কর্ণ। কারণ তার ও হস্তিনাপুরের মধ্যে কোনো আত্মীয় সম্পর্ক নেই। এমন কি হস্তিনাপুরের কোনো প্রজা নয় সে। তবু বন্ধু হিসেবে দুর্যোধন তাকে স্মরণ করল কেন? এই 'কেন' প্রশ্নের রহস্য ভেদ করতে পারল না। একটা ভয় ভয় ভাব নিয়ে রথে আরোহণ করল।

বাতাস কেটে সাঁ সাঁ করে রথ ছুটল পশ্চিম দিকে। কত ভাবনা ছুটে গেল তার মনে। মাত্র ক'বছর আগের ঘটনা। এর ভেতর এমন কি ঘটল যে, তার মতো উপেক্ষিতকে হস্তিনাপুরের সংকটে দরকার হলো? দুর্যোধনই তাকে বীরের গৌরব এবং একজন রাজনৈতিক নেতার মর্যাদা দিলো। তাকে যথাযোগ্য সমাদর করল। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল তার অন্তঃকরণ। এই পৃথিবীতে আর কেউ নয়, দুর্যোধনই তার যথার্থ বন্ধু। দুর্দিনে এবং এক পরম শুভক্ষণে তাকে বন্ধুরূপে পেয়েছে। সেদিনটা কর্ণের জীবনে এক স্মরণীয় দিন। কোনোদিন তার স্মৃতিটা ভুলতে পারবে না।

কৃপাচার্য কূট প্রশ্ন তুলে যখন অর্জুনের সঙ্গে তার অস্ত্রবিদ্যার প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় বাদ সাধল তখন একা দুর্যোধনই তার প্রতিবাদে মুখর হলো। তার ব্যক্তিত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপের ফলেই তাকে হতাশ হতে হলো না। কিন্তু অর্জুন জননী কুন্তী তাকে নিরাশ করল। তার বহুদিনের প্রত্যাশার মুখে ছাই দিলো। শত্রু বলে সত্যিই কেউ যদি থাকে হস্তিনাপুরে, সে

অর্জুন জননী এবং পঞ্চপাণ্ডব। এরাই তার জীবন বিকাশের অন্তরায়, তার পথের কাঁটা। এই কাঁটা যতদিন মনে বিঁধে থাকবে ততদিন পাণ্ডবদের সঙ্গে তার শত্রুতার কথাটা একদণ্ড ভুলে থাকতে পারবে না। পাণ্ডবদের প্রতি তার মনে যত ক্রোধ, বিতৃষ্ণা জমেছে তার প্রতি একটা চাপা নিষ্ঠুরতা আছে। দুর্যোধন হৃদয় দিয়ে তার সব তাপটুকু অনুভব করেছিল। তাই ব্যর্থ জীবনের বুকের শূন্য গহ্বর থেকে তাকে টেনে বার করে আনার জন্যে হস্তিনাপুরে সমাদর করে ডেকে আনল বোধহয় অন্য জীবনের এক আলোকিত প্রস্তরের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

কর্ণকে সাথে করে দুঃশাসন শকুনির কক্ষে ঢুকল। সেখানে দুর্যোধন ও শকুনি তাদের প্রতীক্ষায় ছিল। কর্ণকে দেখেই দুর্যোধন দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করল। হাসি হাসি মুখ করে বলল: হঠাৎ দূত পাঠিয়ে কেমন অবাক করে দিলাম বল তো? পথে আসতে কোনো কষ্ট হয়নি তো।
কর্ণ দুর্যোধনের কথার কোনো জবাব দিলো না। তার নিজের কথাই বলল: হঠাৎ কী এমন ঘটল যে তাড়াহুড়ো করে ডেকে পাঠালে।
দুর্যোধনের মুখে সেই অনাবিল প্রসন্ন হাসির স্নিগ্ধ আভাটুকু লেগে ছিল। যার নাম সৌজন্যের হাসি। বলল: নিশ্চয়ই এমন কোনো জরুরী ব্যাপার ঘটে গেছে যে তোমাকে খবর না দিয়ে পারলাম না।
কর্ণের বুকের ভেতরটা বিদ্যুতের মতো চমকাল। কুন্তীর মায়াবী মুখখানা চোখের তারায় ভেসে উঠল। কর্ণের কাঁপুনি দুর্যোধনের চোখ এড়াল না। এই ভাবাবেগকে সে তার প্রতি কর্ণের অনুরাগ মনে করল। বলল: আমি জানতাম, আমার আহ্বানের অনুরোধ ফেলতে পারবে না। আমার বিশ্বাসের জয় হলো। বিশ্বাস আর নির্ভরতা হলো বন্ধুত্বের সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞান।
কথা বলতে বলতে তারা দু'জন শকুনির দু'পাশের আসনে বসল। শকুনির চোখে ও মুখে কূট হাসির আভা। বলল: তোমায় পেয়ে আমার খুশির মাত্রাটা কিঞ্চিত বেড়েছে।

কর্ণ মুচকি হেসে বলল : আমি যে কেউ নই আপনাদের এই শিষ্টাচারই সেই কথা বলছে।

শকুনি যেন দারুণ লজ্জা পেল এরকম এক ভঙ্গী করে জিভ কাটল। লাজুক অপ্রতিভতায় বলল : একি কথা! ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে। সত্যিই তো নিজের লোকের সাথে কেউ ভব্যতা করে?

দুর্যোধন বলল : পরম বন্ধু মনে করেই তোমায় ডেকেছি। তোমার পরামর্শ আজ আমার বড় প্রয়োজন?

কর্ণ বলল : আপনাদের কোনো কথাই আমি বুঝতে পারছি না। তবে, আমার যে বন্ধু লাভ হয়েছে এটা টের পাচ্ছি।

আমরা তা-হলে কাজের কথায় আসি। বলল দুর্যোধন। মাতুল তুমি বল।

শকুনি একমুহূর্ত ভাবল। মনের ভেতর সব কথা গুছিয়ে নিয়ে বলল : সে অনেক কথা। একটা বিরাট ইতিহাস। হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকার জ্যেষ্ঠ পুত্র অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রর সঙ্গে চিররুগ্ন পাণ্ডুর কোনো বিরোধ হওয়ার কথা নয়, তবু এক অদৃশ্য হাত তাদের টেনে নিয়ে এল ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের জটিল রাজনৈতিক আবর্তে। কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডুর আনুষ্ঠানিক অভিষেক হলো। কিন্তু রুগ্ন শরীরে বেশিদিন শাসন কার্য চালাতে সক্ষম হলো না। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের কারণে মুক্ত বায়ু সেবার্থে বিভিন্ন দেশ ও বনভূমি ঘুরে বেড়াল। ঐ সময় রাজকার্য দেখাশোনা করত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। অন্ধত্ব কোনো অপরাধ নয় কিংবা অযোগ্যতাও নয়। ধৃতরাষ্ট্র রাজা হয়ে প্রমাণ করল সে একজন সুশাসক, বীর্যবান এবং বুদ্ধিমান। অল্পকালের মধ্যে আরো প্রমাণ করল যে সে যথেষ্ট যোগ্যতা সত্ত্বেও তাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই পাণ্ডু দীর্ঘকাল পরে যখন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করল তখন ধৃতরাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করার প্রশ্নটি গৌণ হয়ে গেল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা ধৃতরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যে অন্য কৌশল গ্রহণ করল। ধৃতরাষ্ট্র কিছু না করেই লোকচক্ষে অপরাধী হলো। সিংহাসনের লোভে পাণ্ডুকে সস্ত্রীক শতশৃঙ্গ পর্বতে নির্বাসন করেছে বলে রটনা

চলতে লাগল। যে ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত ছিল অন্তঃপুরে তাকে রাজপ্রাসাদের বাইরে টেনে আনা হলো। দীর্ঘকাল পর তার ধাক্কা এসে পড়ল পরিবারের অভ্যন্তরে। পাণ্ডু মহিষী কুন্তী সিংহাসনের ওপর পুত্রদের দাবি নিয়ে শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করল। সিংহাসন নিয়ে পুরাতন বিরোধ পাণ্ডব এবং ধৃতরাষ্ট্রদের মধ্যে টেনে আনল। কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্রের সাথে হস্তিনাপুরের রাজপরিবারের কোনো সম্পর্ক নেই। কার্যতঃ পাণ্ডব মহিষীদের ব্যভিচারে যে সব সন্তান জন্মগ্রহণ করল তারাই হলো পাণ্ডব। তাদের দাবির যৌক্তিকতা বিচার করতে গেলে রাজপরিবারের মর্যাদাহানির প্রশ্নে জড়িয়ে পড়তে হয়। তাই ধৃতরাষ্ট্র কোনোরূপ বিতর্কে না গিয়ে তাদের স্বীকার করে নিল। ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণ তাদের উৎসাহিত করল। ধৃতরাষ্ট্রের উদারতা মহত্ত্ব, দুর্বলতাকে তারা দুর্বলতা বলে ভাবল। এবার তারা ধৃতরাষ্ট্রদের সিংহাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সংকল্প নিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। স্বার্থের জন্যে পাণ্ডব মহিষী পুত্রদের দিয়ে বিবাদ, বিদ্বেষ, সংঘর্ষ বাধানোর জন্যে যা যা করা দরকার তার সব কিছু করল। পরিবারের রক্ষাকবচ পিতামহ ভীষ্ম পরিবারের এই অন্তর্কলহের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন না। তিনি সব কিছু থেকে একটু দূরে সরে থাকলেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ এবং পরনির্ভরশীল বলেই পিতৃব্য ভীষ্মের নিস্পৃহ নিরাসক্তিকে ভালো লক্ষণ বলে মনে করল না। একে তার আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস বলে মনে হলো। কিছুদিন যেতে না যেতে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের ওপর পাণ্ডবেরা তার অধিকার দাবি করল। এর ফলে, যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের ভেতর হস্তিনা-পুরের সিংহাসনের উপর কার স্বত্ব, স্বামিত্ব এবং উত্তরাধিকারীত্ব আছে তাই নিয়ে এক গোলযোগ উদ্ভব হলো। কলহ এড়ানোর ভয়ে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ পদে অভিষেক করতে আপত্তি করল না। কিন্তু তারা এই বংশে পরগাছা। পরগাছাকে উৎপাটিত করতে কি কি করা দরকার, তার পরামর্শ এবং সহযোগিতা তোমার কাছে চাইছি।

শকুনির নরমে গরমে মেশানো কূটভাষণ কর্ণ খুব মন দিয়ে শুনল। এর ভেতর অর্জুন এবং কুন্তীর মুখখানা যে কতবার মনে পড়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। এরা দু'জনেই তার জীবনের রাহু ও কেতু। এদের জন্যেই সে হতাশ এবং নিরাশ হয়েছে। তার জীবনটাকে ব্যর্থ এবং নিরানন্দ করে দিয়েছে কুন্তী। অর্জুনের স্বার্থেই সৌভাগ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে। এই বঞ্চনাটা সে কিছুতে ভুলতে পারছিল না। শকুনির কথা শুনতে শুনতে তাই বারবার মনে হচ্ছিল, সাধ মিটিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার একটা সুযোগ হয়ত সে পেয়ে যাবে এবার। এরকম একটা ভাবনা যখন তার মনে উঁকি দিচ্ছিল ঠিক তখনই শকুনি হুম্ করে তার পরামর্শ চাইল। স্বপ্ন এবং বাস্তবের এই অভূতপূর্ব মিল কিছুক্ষণের জন্যে তাকে অভিভূত করে রাখল।

শান্ত অথচ গম্ভীর মুখে কর্ণ শকুনির দিকে চেয়ে রইল নিরুত্তরে। একটা লম্বা শ্বাস পড়ল ধীরে ধীরে। বলল : পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর থেকে সরিয়ে দেওয়া চিন্তা আপনাদের খুবই যুক্তিযুক্ত, সময়োচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কিন্তু এদের সরাতে গেলে দেশে এই নিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল ও ঘোরাল হতে পারে। আবার অবস্থাও আয়ত্তের বাইরে যেতে পারে? কারণ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু করতে যাওয়া মানে আগুন নিয়ে খেলা। এ খেলায় দক্ষ না হলে নিজেকেই পুড়ে মরতে হয়। পাণ্ডবদের সরাতে গেলে ভীষ্ম, বিদুর কি মুখ বুজে মেনে নেবে?

শকুনি বলল : আমরাও যে এসব কথা একেবারে ভাবিনি, তা নয়। কিছু করার আগে অবশ্যই আমাদের সমর্থনে কিছু কাজ করা আছে।

দুর্যোধন শকুনির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল : মাতুল, বন্ধুবর কর্ণের কাছে তুমি কি ধরনের সাহায্য চাও, সে কথা কিন্তু বলতে ভুলে গেছ।

শকুনি একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলল : ও হ্যাঁ। কর্ণ! তোমার উপস্থিতি হস্তিনাপুরে খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল কর্ণ—কেন মাতুল?

শকুনি কাষ্ঠ হেসে বলল : রাজনীতিতে 'কেন' বলে কিছু নেই। রাজনীতি মানেই কৌশল। বুদ্ধির প্যাঁচে কে, কিভাবে কতখানি একজনকে জব্দ করে, অসুবিধেয় ফেলে নিজের স্বার্থ, সুযোগ, সুবিধা ও লাভ আদায় করে নিতে হয় এ শুধু তার খেলা। এই খেলায় জয়ী-হওয়া মুখ্য কথা। কী ভাবে জয় হলো তার পথ ও উপায় নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। পাণ্ডুমহিষী কুন্তীর কথাই ধর না, রাজপরিবারের সম্মান ও মর্যাদাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে এই পরিবারে তার ঠাঁই করে নিল। কোনো সাধারণ মহিলা হলে এরকম লজ্জাকর অসম্মানজনক কাজ করতে সাহস করত কি? রাজনীতিতে লজ্জা, অপমান বলে কোনো শব্দ নেই। যে কোনো মূল্যে জয় আদায় করে নিতে জানা রাজনীতির শেষ কথা।

কর্ণের ভুরু কুঁচকাল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : আমাকে কী করতে হবে বলুন।

বলব বলেই তো ডেকেছি। কিন্তু তোমারও তো কিছু চিন্তার আছে। সব কিছু ভালো করে বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্যে একটু ভূমিকা তো করতে হবে ভাগ্নে। এই ধর, কৃষককে ফসল ফলানোর জন্যে জমি চাষ করতে হয়, বীজ বুনতে হয়। মনে মনে ফসল সম্পর্কে তার মনে অনেক প্রত্যাশা, স্বপ্ন সৃষ্টি হয়। তারপর সে ফল পায়। রাজনীতিও অনেকটা তাই। রাজনীতির ফসল ফলানোর জন্যে অনেক প্রত্যাশা এবং ঝুঁকি নিতে হয়। স্পষ্ট করে বোঝানো যায় না সব ঘটনা। তবে এটুকু বুঝেছি তুমি হস্তিনাপুরে থাকলে পাণ্ডবেরা অস্বস্তি বোধ করবে। আচার্য দ্রোণ, কৃপ এবং বিদুর কেউ স্বস্তিতে থাকতে পারবে না। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এবং পাণ্ডুমহিষী কুন্তী তোমার এই নিত্য উপস্থিতিটা সইতে পারবে না। এসবই আমার অনুমান। একটা কিছু অনুমান করে তো এগোতে হয়। সেই এগিয়ে চলার প্রথম কাজটা তোমার হস্তিনাপুরে থাকা দিয়ে শুরু হোক।

কর্ণের ভুরু কুঁচকে গেল। বিধাতা তাকে নিয়ে একোন নতুন নাটকের মহড়া

জন্যেই পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবেই কিছু সংখ্যক পৌরজনকে দিয়ে যুধিষ্ঠিরের অনুকূলে সিংহাসনের দাবি তুলল। উদ্দেশ্য, দেশের জনগণ যে দুর্যোধনের বিপক্ষে এবং তারা রাজ্যশাসনে ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে মানতে পারছে না এরকম একটা বিভ্রম উৎপাদন করাল। কারণ তারা ভালো করেই বুঝেছিল, হস্তিনা-পুরে আর বেশিদিন তাদের থাকা সম্ভব হবে না। এই কৌশলও টিঁকবে না, কিন্তু একটা গোলমাল পাকিয়ে রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে পারবে।

কর্ণের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। বড় বড় চোখ করে বলল . মাতুল আমার মাথায় এসব কিছুই ঢুকছে না। পাণ্ডবেরা কার প্ররোচনায় এসব করছে? এতে লাভ হবে কতটুকু?

লাভ আছে বৈকি? হস্তিনাপুর যখন ছাড়তেই হবে তখন একটা গোলমাল পাকিয়ে গেলে, পরে তা থেকে রাজনৈতিক ফয়দা তোলা কোনো কঠিন নাও হতে পারে। সেজন্য তারা এমন সব কাজ করছে যাতে ধৃতরাষ্ট্র তাদের হস্তিনাপুর ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। তাহলে, তারা রটাতে পারবে পিতৃহীন অসহায় পাণ্ডবদের ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনের লোভে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছে। তাতে ধৃতরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি দ্যুতিহীন হবে। নিজেদের স্বার্থে এই রাজ্যকে ভেঙে দিতে দু'টুকরো করতে চায়। তাদের স্বার্থের চেহারা দেখে আমরা অনেকেই আতংকিত। হয়ত এমন অনেক কিছু ঘটবে যা আমরা কোনোদিন চাইনি, কিংবা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। তাই রাজ্যের অখণ্ডতার স্বার্থে তাদের নিঃশব্দ দৌরাত্ম্য এবং অত্যাচার মেনে নিচ্ছে, সহ্য করছি। সেটাই আমাদের দুর্বলতা। তাই তাদের কৌশলে বিদায় নেবার পর্বকে যত ত্বরান্বিত করতে পারি ততই মঙ্গল। তারা বিদায় হলে আমরা এক নতুন শক্তিশালী রাজ্য গড়ার অভিনব উদ্যোগ নেব।

সরল হাস্যে কর্ণের মুখ কোমল হলো। বলল : পাণ্ডবেরা এখান থেকে চলে গেলে কি সব মিটে যাবে? তারা কি এত সহজে ছেড়ে দেবে? রাজ্যের অভ্যন্তরে বিবাদ বিভেদের উত্তেজনা সৃষ্টি করে তারা কখনও আপনাদের সুখে থাকতে দেবে না। অনেক শত্রু তাদের সঙ্গে জুটবে। শাস্ত্রে বলে শত্রুর

শেষ রাখতে নেই। শত্রুকে শত্রুতা করার সুযোগ দিতে নেই। নিন্দে কুৎসার ভয় তো রাজনীতি করে না সে তো আপনিও জানেন। দুদিন বাদে মানুষ সব ভুলে যাবে।
কর্ণের কথা শুনে স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে রইল শকুনি। বেশ একটু সময় নিয়েই কর্ণের মুখের দিকে দৃষ্টিটা নিবদ্ধ রইল। মধ্যে কতরকমের চিন্তা-ভাবনা তরঙ্গের আলোড়ন হচ্ছিল। প্রস্তাব আর বাস্তব কখনও এক নয়। তবু কর্ণের বক্তব্যকে উড়িয়ে দেবার নয়।
শকুনিকে নীরব দেখে দুর্যোধন বলল : মাতুল তুমি কথা বলছ না কেন?
শকুনি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল : ভাগ্নে, সত্যিই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তার কথা অবহেলা করি এমন জোর পাই না মনে। কিন্তু কেমন করে সম্ভব সে কথাটা মাথায় আসছে না।
কর্ণের ভেতর প্রতিশোধের আগুন দপ করে জ্বলে উঠল। পাণ্ডবদের বিরুদ্ধাচরণের কথা উঠলে তাকে যেন কিসের নেশায় পেয়ে বসে। মেধাটা তখন দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। নিজের অজান্তেই তার অধরে বক্র হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। ক্রমে সে হাসি কুটিল হয়ে উঠল। বলল : মাতুল পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুর ছেড়ে কোথায় যাবে? তাদের বাসের জন্যে সর্বাগ্রে একটি রমণীয় স্থান নির্বাচন করতে হবে। সেখানে বসবাসের উপযুক্ত পুরী নির্মাণ করতে হবে। যেখানে তারা নিজেদের মুক্ত এবং নিরাপদ ভাববে। অবশ্যই এই নতুন নগরী তাদের জন্যে নির্মিত হয়নি একথা জানলে দুর্যোধনকে বঞ্চিত এবং হতাশ করার জন্যেই নতুন নগরীতে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করবে।
শকুনি উল্লসিত হয়ে আপন উরুদেশে চাপড় দিয়ে বলল : ভাগ্নে, তোমার বুদ্ধির তারিফ করি।
মাতুল, হস্তিনাপুর ছেড়ে যাবার এই সুযোগ যদি তারা নেয়, তাহলে তাদের নিধনের উপায় অবশ্যই ভাবতে হবে আমাদের। অন্যথায় শত্রুকে অল্প পীড়ন করে ছেড়ে দিলে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আপনাদের।

তুমি কিছু ভেবেছ ভাগ্নে? শকুনি প্রশ্ন করল।

মাতুল, সন্ধানী চক্ষু ফাঁকি দিয়ে যদি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয় অরণ্যে তাহলে দাবানলে দগ্ধ হবে তারা। অথচ, এই দুর্ঘটনার জন্যে হস্তিনাপুরকে কেউ দায়ী করতে পারবে না সখা দুর্যোধনের। গায়েও কোনো কলঙ্ক লাগবে না। প্রজ্জ্বলিত দাবাগ্নিই দায়ী হয়ে থাকবে চিরকাল। আর আমরাও এক মহাশত্রুকে চিরতরে নাশ করতে পারব।

শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন কারো মুখে কথা সরলো না। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তারা কর্ণের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

তৈরি হলো বারণাবতে জতুগৃহ।

৫

কর্ণের বুদ্ধিতে জতুগৃহ ভস্মীভূত হলো। ভস্মস্তূপের মধ্যে যে ছটি দেহ পাওয়া গেল, তাদের পাঁচজন পুরুষ ও একজন নারী। এরা যে পঞ্চপাণ্ডব এবং তাদের জননী কুন্তী, তাতে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। পাণ্ডবেরা বেঁচে নেই এব্যাপারে সকলে একমত হলো। এরকম বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে কারো প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ছটি দগ্ধ দেহই প্রমাণ করল পাণ্ডবেরা জীবিত নেই। সুতরাং তাদের নিয়ে আর কোনো দুর্ভাবনা থাকল না হস্তিনাপুরের। ধৃতরাষ্ট্র এখন নিশ্চিন্ত।

হস্তিনাপুরের রাজ্য ও রাজনীতিতে কর্ণের সমাদর বেড়ে গেল। মহারাজ জরাসন্ধ তার বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ মালিনী রাজ্য অর্পণ করলেন। বৃহৎ ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদী রাজ্য গোষ্ঠীর একজন অন্যতম শরীক হয়ে উঠল। বীর্যবলে এবং বুদ্ধিবলে ভারত রাজ্যের কেন্দ্রে কর্ণ তার স্থান করে নিল।

সময় প্রবাহ থেমে ছিল না।

বারোটা বছর জলের মতন চলে গেল।

হঠাৎ কর্ণের জীবনে এক উৎপাত এসে উপস্থিত হলো। বলতে কি, সে নিজেই তাকে ডেকে আনল। তার অদৃষ্টই তাকে টেনে নিয়ে গেল পাঞ্চালে।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, কন্যা দ্রৌপদীর বীর্যশুল্কা করার এক স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করল। কন্যা পণের সর্ত বড় বিচিত্র। লৌহশকটে রক্ষিত ধনু উত্তোলিত করে ঘুবন্ত চক্রের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য বস্তু বিদ্ধ করতে যে সক্ষম হবে দ্রৌপদী তার কণ্ঠে দেবে বরমাল্য। বিভিন্ন রাজন্যবর্গবীরও শক্তিমান পুরুষদের সম্মুখে বীর্যাবর্তের এতবড় পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার সুযোগ

জীবনে খুব কম আসে। কর্ণ এই সুযোগ ও সাফল্যকে হাতছাড়া করতে রাজি হলো না। পদ্মাবতীর শত অনুনয়ও পারল না তাকে টলাতে। কর্ণের এক উত্তর—পদ্মাবতী নারী হয়ে তুমি কেমন করে বুঝবে পুরুষের কোথায় সুখ, আর কোথায় আনন্দ? এই সুখ, আনন্দ, মত্ততা প্রেমের স্নিগ্ধতায় মেলে না। এ সুখ অন্যরকম। শুধু পুরুষই জানে। বীর্যবলে, পৌরুষবলে প্রতিযোগিদের হারিয়ে জয় করার সুখে যে কী উল্লাস আর মত্ততা লুকিয়ে থাকে, তুমি জান না পদ্মা। আমার সেই সুখটুকুতে তুমি বাধা দিও না।
স্বামী জয়ের সুখই সব, প্রেমের সুখ কিছু নয়!
রানী দুটো সুখ দুরকম। প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুর যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ, এও সেরকম। দুটো এক করা যায় না। এক হয় না। প্রত্যেকটি সম্পর্কই আলাদা। আলাদা তাদের দ্যুতি।
এক নারীর প্রেম, ভালবাসা, সেবায় কোনো পুরুষকে খুশি হতে দেখলাম না। কেন? স্বামী আমি কি তোমার সব চাওয়াকে পূর্ণ করতে পারিনি?
আমি তো সব কিছুর জন্যেই তোমার ওপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল। যে পুরুষ কোনো নারীর ভালবাসা তেমন করে পেয়েছে সে অন্য নারীর ভালবাসা পাওয়ার জন্যে কাঙালপনা বোধহয় করে না। শরীরের প্রসঙ্গ এনে ফেলে আমাদের সুন্দর পবিত্র প্রেমকে আবিল করার মতো বোকা তো তুমি নও। এত সাধারণ হয়ে যাবে কেন পদ্মা।
আমার প্রেমের ভাগ পাছে অন্য কেউ কেড়ে নেয় সেই ভেবে আকুল হচ্ছি। মনে করলে আমার বুক ফেটে যায়। নিজেকে কী প্রবোধ দিতে পারি না। কী আছে পাঞ্চালীর মধ্যে? সে যা দিতে পারে আমি কি পারি না দিতে? পদ্মাবতীর গলার দ্রবীভূত স্বর কেমন ভাঙা আর অদ্ভুত শোনাল।
কর্ণ চমকে তাকাল পদ্মার দিকে। দু' পা এগিয়ে গিয়ে পদ্মার কাঁধে হাত রাখল। চিবুকে হাত দিয়ে মুখখানা আস্তে আস্তে তুলে ধরল চোখের ওপর। বলল: প্রেম বড়ই খারাপ অসুখ। প্রাণঘাতী অসুখ। মিথ্যে কষ্ট

পাচ্ছ। নিজেকে এত কষ্ট দিয়ে কি তুমি সুখ পাও?

তোমরা পুরুষ মানুষ, রমণীর মনের কথা বুঝবে না। আমরা যে কত অসহায় নিজেদের কাছে তা যদি জানতে—

পদ্মা, সাধারণ হওয়া তোমাকে মানায় না। আমার সমস্ত সাফল্যের মধ্যে কত গভীর ব্যর্থতার ব্যথা লুকনো আছে, তা তো তুমি জান। জীবনে কোনো জিনিস সোজা ভাবে, সহজ করে পাইনি। আজ হঠাৎ সে সুযোগ যদি এসে থাকে তাহলে তুমি খুশি হবে না? তুমি কি চাওনা, আমি সুখী হই।

খুব বেশি করে চাই। তোমাকে খুশি রাখতে আর খুশি করতে আমি কখনো নিজের দিকে তাকাই নি। তোমার মনের কষ্টটা আমার চেয়ে বেশি কে জানে?

তা হলে অবুঝ হচ্ছ কেন? তুমি ভাবো মেয়ে মানুষের শরীরে পৌঁছে গেলে, তাকে খুশিতে রাখলে পুরুষের আর কোনো গন্তব্যই থাকে না। একজন মানুষ সারা জীবন ধরে পথ চলে কোনো কিছু প্রত্যাশা নিয়ে। মেয়েমানুষের প্রত্যাশার পরিধি বড় ছোট। সেই পরিধিতে একজন পুরুষকে আঁটে না বলেই ব্যাপ্তির জন্যে পুরুষ জাতটা খাঁচায় বন্দী পাখীর মতো ছটফট করে, ডানা ঝাপ্টায়। পুরুষের মনের এই কষ্টটা কোনো নারী চোখ খুলে দেখল না। তারা বুঝতে চেষ্টা করল না যে পুরুষের প্রত্যাশার কোনো শেষ নেই, তার নিবৃত্তিও নেই। তার অনন্ত পথ চলার ইচ্ছেটা মরে গেলে পুরুষ আর পুরুষ থাকে না। সভ্যতায় সংকট আসে। সৃষ্টি থেমে যায়। তাই পুরুষকে থামতে দিতে নেই। চলাটাই পুরুষের জীবনের ধর্ম। একমাত্র সত্য। তাকে বাধাও দিতে নেই। থেমে গেলেই সৃষ্টির ছন্দ পতন হয়। পদ্মা! তুমি আমাকে সব দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছ। প্রেমজীবনে, আমার চাওয়ার কিছুমাত্র বাকি না থাকলেও প্রাপ্তির ঘরে কোথায় যেন একটা শূন্যতা রয়ে গেছে। অপ্রাপ্তিতে যেখানটা খাঁ-খাঁ করছে। তুমি কেন, কোনো নারী পুরুষের সেই শূন্যতা ঘোচাতে পারে না।

স্বামী। এক দারুণ মুগ্ধ চমকে ডাকল পদ্মা।

পদ্মা তুমি কি মনে কর তোমাকে দুঃখ দিলে, অপমান করলে, কিংবা কষ্ট দিলে আমি খুব সুখ পাই? একটুও না। বিশ্বাস করে অদৃষ্টকে হারিয়ে দেওয়ার মধ্যে আমার সব সুখ, আনন্দ লুকোনো আছে। আমি যে পাঞ্চালে যাচ্ছি পাঞ্চালীর রূপের আকর্ষণে নয়, দ্রুপদের রহস্যময় ঘোষণার পেছনে যে ছলনা, ষড়যন্ত্র আছে তার সত্যকে প্রকাশ করে দিতে। দেখ, আমি কৃতকার্য হয়ে ফিরব।

স্বামী তোমার কথা শুনে ভয় করছে। ক'দিন ধরে মনের মধ্যে কু-গাইছে। একটা অঘটন কিছু হবে এই স্বয়ম্বর সভায়। আমার মিনতি তুমি যেও না। দ্রুপদের কৌশলের ফাঁদে পা দিও না। কী লাভ। নিজের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট হও।

তা হয় না রানী। বিধাতা এক-একজন মানুষকে এক একরকম ধাতু দিয়ে তৈরি করেছেন। কোনো মানুষের সঙ্গে কোনো মানুষের মিল হয় না, তাই মনের এই ফাঁকটা পূর্ণ হয় না বলে মানুষে মানুষে একটা দূরত্ব থেকে যায়। তোমাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি বুঝতে চাইছ না। আমার জগৎ তোমার জগৎ আলাদা। আমি তোমার উৎকণ্ঠা শুনতে চাই না। আমি চাই জয়। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কৌশল ব্যর্থ করে দিয়ে বীর্যশুল্কা পাঞ্চালীর বরমাল্য গ্রহণ করে ধন্য হতে চাইছি না, বরণীয় হতে যাচ্ছি। তুমি মুখ ভার করে থেক না রানী। তোমার মলিন মুখ দেখলে আমার কোনো কল্যাণ হবে না। তোমার চোখের জল আমার অমঙ্গল ডেকে আনবে।

না গো না। ও কথা বলতে নেই। ব'ল না। বলতে বলতে পদ্মাবতী আকুল করা কান্নায় ভেঙে পড়ল কর্ণের প্রশস্ত বুকের ওপর।

পাঞ্চাল রাজ্যে এখন অতিথি অভ্যাগতের ভীড়। নানা দেশ থেকে বহু নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ এসেছেন বীর্যশুল্কা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যোগ দিতে।

এছাড়াও বহু মুনি ঋষি ব্রাহ্মণও নিমন্ত্রিত হলো ! অগণিত দর্শক ও প্রার্থীর আসন সংকুলানের জন্যে গণদরবারের সামনে উন্মুক্ত চত্বরে স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হলো। মাথার ওপর বানানো হলো নানারঙের কাপড়ে তৈরি চাঁদোয়া। পুষ্পে, পল্লবে সজ্জিত করা হলো সমগ্র প্রাঙ্গণ। সুগন্ধ নির্যাসে বাতাস ভরপুর হলো।

দর্শকদের পদমর্যাদা অনুসারে আসনের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। রাজা, মুনি, ঋষি, সাধারণ দর্শক, এবং বরাহূত ব্যক্তি সকলের জন্যে বসার পৃথক পৃথক আসন ছিল। মধ্যস্থলে দুটি মঞ্চের একটিতে ছিল লৌহশকটে রক্ষিত বিশাল ধনুক এবং শর আর অন্য মঞ্চটি বীর্যশুল্কা দ্রৌপদীর জন্যে নির্মিত। দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থীদের জন্যে সংরক্ষিত আসনেই দুর্যোধন এবং দুঃশাসনের পাশেই বসল কর্ণ। অন্য প্রার্থীদের হাব-ভাব দেখে খুব অবাক লাগল কর্ণের। পাণিপ্রার্থীদের কেউ দ্রৌপদীকে চোখে দেখে নি কিন্তু রূপের খ্যাতি শুনে তাকে পাওয়ার জন্যে উন্মাদ হলো। অনেক বয়স্ক রাজারা পর্যন্ত তরুণদের মতো দ্রৌপদীর নজর কেড়ে নেওয়ার জন্যে রাজবেশে, মাথায় মুকুট, কণ্ঠে মুক্তার গজমতীর হার, সোনার চুমকী এবং মণিমুক্তা বসানো বহু মূল্যবান পোশাক পরে, কোমরে তরোয়াল ঝুলিয়ে বীরের সাজে সেজে মঞ্চের কাছাকাছি বসল। প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঈর্ষা করতে লাগল। নিজেদের মধ্যেই তারা বীর্যের গর্ব, ঐশ্বর্যের দম্ভ প্রকাশ করতে লাগল। প্রত্যেকেই ভাবছিল দ্রৌপদী তার ভার্যা হবে।

কেবল কর্ণই নীরব। সব রকম উত্তপ্ত আলোচনা থেকে সে ছিল দূরে। কোনোরকম আত্মপ্রচার তার ভালো লাগছিল না। ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছিল। কেদারায় পিঠ দিয়ে কর্ণ বিশ্রামের ভঙ্গীতে ডান হাতের ওপর থুতনির ভর দিয়ে চোখ বুজে ছিল। তাকে ওরকম হতাশ হয়ে বসে থাকতে দেখে দুঃশাসন বলল, সখা, ধনুতে শর সংযোজনের প্রথম সুযোগ যে পাবে তার মতো ভাগ্যবান কেউ নেই। যদি সে কৃতকার্য হয় তা-হলে দ্রৌপদী তার ভার্যা হবে। এত আয়োজন, উত্তেজনার তখন আর কোনো মানে

থাকবে না। এক মুহূর্তে সব অর্থহীন হয়ে যাবে। উৎকণ্ঠাভরা এমন সুন্দর একটা নাটক মাটি হয়ে যাবে। তাই না?

কর্ণ চুপ করে রইল। দুঃশাসন একটু বিরক্ত হয়ে কনুই দিয়ে তাকে ঠেলল। বলল : তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? কথা বলছ না কেন? আচ্ছা বেরসিক লোক বাপু।

কর্ণ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। হাই তুলে বলল : কী বলব? এত সহজ ব্যাপার হলে ঢাক পিটিয়ে কেউ এত লোক নিমন্ত্রণ করে? নাটকটা মাটি হওয়ার কোনো আশংকাই দেখছি না। বরং জমে উঠবে। শেষ দৃশ্যটি কীভাবে শেষ হবে শুধু সেটাই এখন দেখার।

দুঃশাসন কুপিত হয়ে বলল : সব কথা এমন হেঁয়ালি করে তুমি বল যে, কথা বলার আসল মেজাজটাই নষ্ট হয়ে যায়।

দুঃশাসনের কথায় কর্ণ হাসল। অদ্ভুত ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল : সব কথা সব ক্ষেত্রে বলা যায় না। উচিত নয়। তবে, অনুষ্ঠান তাড়াতাড়ি শেষ হচ্ছে না। অনেক জল ঘোলা হবে। অনেক কিছু ঘটবে। শুধু হাতে ফিরে যেতে কেউ আসে নি। একটা খণ্ড যুদ্ধ বাধবেই।

দুর্যোধন হাসি হাসি মুখ করে বলল : বুঝেছি। দ্রৌপদীকে বীর্যবলে হরণ করার ফন্দী আঁটছ তুমি।

সখা, ঐ দ্যাখ পাঞ্চাল নন্দিনী ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নের হাত ধরে মঞ্চে আসছে। হাসিটা কী অপূর্ব! গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু কোথায় যেন জাদু আছে। কালো রঙেরও যে একটা আকর্ষণ আছে, স্নিগ্ধ দ্যুতি আছে, মাধুরী আছে পাঞ্চালীকে না দেখলে বোধহয় জানা হতো না। কষ্টিপাথরে নির্মিত ভাস্কর্য মূর্তির মতো তার স্বপ্নালু চোখ দুটিতে প্রাণের খুশির নেশা ছড়ানো। পেলব কোমল মসৃণ ত্বকে তার শ্রী ও রূপের আলো ঠিকরে পড়ছে। পুরুষকে পাগল করার জন্যে যা দরকার পাঞ্চালীর সব আছে। কী গো সখা, চুপ করে কেন? রূপবতী কন্যার রূপের মোহে কি মজে গেলে? সব কথা কী হারিয়ে গেল? সভাশুদ্ধ পাণিপ্রার্থীদের মতো তুমিও বোবা হয়ে গেছ?

ঐ জন্যেই বললাম, পাঞ্চালীকে পাবার জন্যে সবাই পাগল। কিন্তু পাঞ্চালী পছন্দ করবে কাকে ?
দুর্যোধনের বিহ্বল্ কাটতে কয়েকটা মুহূর্ত লাগল। বলল : পছন্দ বলছ কেন ? বীর্যশুল্কার পণ যে রক্ষা করবে পাঞ্চালী তাকেই বরমাল্য দেবে। পতিত্বে বরণ করবে। এটাই তো একমাত্র শর্ত।
কিন্তু আমার ধারণা অন্য রকম। দ্রুপদের নির্বাচন পর্ব সারা হয়ে গেছে। বাকি আছে পাঞ্চালীর পছন্দ। পণরক্ষা, নয় পছন্দ।
তোমার কথা বুঝলাম না।
বুঝবার জন্যে বলছি না, দেখার জন্যে চোখ খোলা রাখ। আমার মন বলছে, অদ্ভুত একটা কিছু ঘটবে শুধু সেই মুহূর্তের জন্যে তৈরী হও। পাঞ্চালীকে ছ্যাখ। কী সুন্দর সেজেছে। আপাদমস্তক অলংকারে মোড়া। কপালে সোনার টায়রা, হাতে বাজু, কঙ্কণ, গলায় হারের লহর, মাথায় চুলের কাঁটা, চিরুনী, ফুল—সব সোনার। হীরে, জহরত, মরকত কাজ করা স্বর্ণালংকার থেকে আলোর দ্যুতি ঠিকরে পড়েছে। সোনার গায়ে সোনার অলংকার, কে কার অলংকার! পাঞ্চালীর রূপ রমণীর ঐশ্বর্য ; ভূষণ যে ঐশ্বর্যের দ্যুতি—পাঞ্চালীকে দেখেই জানলাম।
সখা, তোমাকে এত প্রগলভ হতে দেখিনি কখনো। তোমার কী হয়েছে ?
তোমার মতো আমারও একটা তীব্র উৎকণ্ঠায় কাটছে। কিন্তু তার জন্য আমি অস্থির নই। নিজেকে সংযত কর। নইলে, আশাভঙ্গ জনিত পরিতাপে দগ্ধ হবে। তোমার জন্যে আমার চিন্তা হচ্ছে। ভীষণ ভয় করছে। এক বুক উৎকণ্ঠা নিয়ে দুর্যোধন কথাগুলো বলল।
সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ নীরব। সূচীপতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। মৌনতা ভঙ্গ হলো ধৃষ্টদ্যুম্নের ঘোষণায়। বলল : হে সমাগত নরেন্দ্রবর্গ, আপনাদের পদরেণুতে ধন্য হলো পাঞ্চালের মাটি। পাঞ্চালের রত্ন প্রতিমা কৃষ্ণার স্বয়ম্বর সভায় যোগদান করে যে বীর্যাবর্তা ও পৌরুষের পরীক্ষা দিতে আপনারা সাগ্রহে এগিয়ে এলেন তার জন্যে আপনাদের প্রত্যেককে আমি

পাঞ্চালের পক্ষ থেকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই। আপনাদের সম্মুখের বেদীতে যে ধনুর্বাণ আছে তার সাহায্যে সভাকক্ষের একেবারে সর্বোচ্চ বিন্দুতে রক্ষিত লক্ষ্যবস্তুকে যিনি জলপাত্রের প্রতিবিম্বের ওপর দৃষ্টি রেখে ঘূর্ণমাণ চক্রের উপর ছিদ্র দিয়ে পর পর পাঁচটি শরে লক্ষ্যবিদ্ধ করতে সমর্থ হবেন আমার ভগ্নী কৃষ্ণা কুলশীলন রূপলাবণ্য সম্পন্ন সেই মহাবীরের ভার্যা হবেন।

ঘোষণা শেষ হওয়ার পরেই একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হলো। দুর্যোধনকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিয়ে কর্ণ কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল: সখা কিছু বুঝলে?

দুর্যোধন মাথা নাড়ল। যার অর্থ না।

শকুনির দিকে চেয়ে কর্ণ বলল: মাতুল নাটক শুরু হলো। যোগ্য কনের যোগ্য বরের জন্যে যোগ্যতার এই পরীক্ষা এমনিতে কঠিন। তারপর, কুলশীল রূপলাবণ্য সম্পন্ন কথাটি যুক্ত করে দিয়ে পাঞ্চালীর প্রতি নির্বাচনের ব্যাপারটাকে একটু জটিল এবং সন্দেহের করে তুলল। কারো দিকে তাকিয়েই কথাগুলো যেন বলা হচ্ছে।

শকুনি বলল, তোমার কথায় যুক্তি আছে।

মাতুল শুধু যোগ্যতা থাকলে কিংবা সফল হলেই যে পাঞ্চালীর বরমাল্য পাবে না। পাঞ্চালীর নিজস্ব পছন্দ এবং নির্বাচনই শেষ কথা। বেশ বোঝা যাচ্ছে, আগে থেকেই দ্রুপদ সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন, শুধু লোক দেখানো একটা অনুষ্ঠান করা হচ্ছে বলে আমার অনুমান।

দুর্যোধন নির্বাক। কর্ণের কথাগুলো তার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। আবার অবিশ্বাস করতেও পারছিল না। এক জ্বালাভরা চোখে সে দ্রৌপদীর দিকে চেয়েছিল। অক্ষম রাগে তার বুকের ভেতরটা মথিত হতে লাগল।

শকুনি চিন্তিত মুখে কর্ণের দিকে চেয়ে বলল: ভাগ্নে, আমার মাথায় কিছু আসছে না। কৃষ্ণ ছাড়া আর কোনো লোভনীয় ব্যক্তি এখানে নেই। কিন্তু পাণিপ্রার্থীদের আসনেও তাঁকে দেখছি না। তা হলে দ্রুপদের নির্বাচিত

পাটিত্র কে হতে পারে ? তুমি কিছু আঁচ করতে পারছ ?
ঘটনা কোন্ দিকে মোড় নেবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। তবে, একটা অসম্ভব অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিদুর দ্রুপদকে দিয়ে একান্ত করছে। এখন চোখ খুলে সবটা দেখার ব্যাপার।
এমন সময় লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধ করার জন্যে সিন্ধুরাজ শল্যের নাম ঘোষণা করা হলো।
কম্পিত বুক ও উদ্দীপ্ত এক আনন্দ নিয়ে বীরদর্পে শল্যই এগিয়ে গেলেন লৌহশকটে রক্ষিত ধনুকের দিকে। ধনুকের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ একটু গর্বভরে সকলের মুখের ভাব দেখার জন্যে পিছন ফিরে দেখল। সৌভাগ্যের হাসি তার মুখে। কিন্তু সে হাসি মলিন বিবর্ণ প্রাপ্ত হতে দেরি হলো না। বহু অঙ্গভঙ্গী করেও শল্য ধনুকটি উত্তোলন পর্যন্ত করতে পারল না। সভাসুদ্ধ লোক তার কাণ্ড দেখে হেসে গড়াগড়ি গেল। কৃষ্ণারও হাসি পেল। বস্ত্রাঞ্চলে মুখ লুকিয়ে সে হাসি আড়াল করল। অবশেষে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত হয়ে শল্যরাজ ব্যর্থতার অপমান এবং লজ্জা নিয়ে স্বস্থানে ফিরে এল।
দুঃশাসন বড় বড় চোখে কর্ণের দিকে হতবুদ্ধির মতো চেয়ে রইল।
তারপর একে একে পাণিপ্রার্থী মহাবলশালী ক্ষত্রিয় বীর ও রাজন্যবর্গ ব্যর্থ হয়ে মলিন মুখে ধর্মাক্ত কলেবরে নিজ নিজ জায়গায় ফিরে গেল। ধনুকটি স্থানচ্যুত করা পর্যন্ত যখন কারো সাধ্যে কুলালো না তখন সবাই একে যাদু ধনু বলল। এরকম ধনু দিতে সম্মানিত রাজন্যবর্গের সঙ্গে দ্রুপদের কৌতুক করার কোনো মানে হয় না। প্রত্যেকেই অত্যন্ত অপমানিত বোধ করতে লাগল। একটা চাপা রোষ ক্রমে তাদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হতে লাগল।
ঠিক সেই সময় কর্ণ লক্ষ্যভেদের জন্য বেদীর সামনে এসে দাঁড়াল। বিচক্ষণতার সঙ্গে সে বেশ কিছুক্ষণ লৌহশকটে রক্ষিত ধনুটি পর্যবেক্ষণ করল। তারপর অনায়াসে ধনুটি হাতে তুলে নিল। অমনি সব গুঞ্জন থেমে গেল। সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি এখন কর্ণের ওপর। কর্ণ কোনো দিকে না

তাকিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে লৌহ ধনুতে গুণ সংযোগ করল। তারপর লক্ষ্যবিদ্ধ করার জন্যে ধনুতে শর যোজনা করল।

অমনি এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সভাকক্ষের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে দর্শকের উদগ্রীব প্রতীক্ষা চমকে দিয়ে দ্রৌপদী উচ্চকণ্ঠে তীক্ষ্ণস্বরে ঘোষণা করল : শ্রদ্ধেয় সভাস্থ সজ্জনবৃন্দ শুনুন, রাজকুমারী হয়ে আমি কোনো অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিকে পতিরূপে গ্রহণ করতে পারি না। আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। তার প্রদীপ্ত দুই চোখ খদ্যোতের মতো জ্বলতে লাগল।

এরকম একটি ঘোষণায় সভাস্থ ব্যক্তিরা চমকে উঠল। অবাক হলো আরো। বিদ্যুৎস্পর্শের মতো কর্ণের অন্তঃকরণকে ছুঁয়ে গেল। অপমানিতের মতন বিষণ্ণ করুণ দৃষ্টিতে তাকাল কৃষ্ণার মুখের দিকে। তীরবিদ্ধ পাখীর মতো যন্ত্রণাকাতর তার মুখ।

দুর্যোধন কর্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষিপ্ত আক্রোশে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলল : পাঞ্চালনন্দিনীর অবশ্যই জানা উচিত কর্ণ বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত অধিরথের পুত্র। অজ্ঞাতকুলশীল বলে তাকে অপমান করা কিংবা হেয় করার কোনো অধিকার রাজকুমারী কৃষ্ণার নেই।

দ্রৌপদীর দুচোখে আগুন। অধর যুগল ঘৃণায় কুঞ্চিত। বক্রহাসি তার বিদ্রূপতায় নিষ্করুণ। বলল : কুলশীল মানে দ্রৌপদীর যোগ্য নয় সে।

দুর্যোধন কৃষ্ণার স্পর্ধায় বিস্মিত হলো। মহারাজ দ্রুপদের দিকে তাকিয়ে বলল : সমস্ত পাণিপ্রার্থী প্রতিযোগীদের হয়ে আমি মহারাজের কাছে প্রার্থনা করছি বীর্যবলে কর্ণ যখন ধনুক উত্তোলনে কৃতকার্য হয়েছে তখন অবশ্যই লক্ষ্যভেদে তাকে বাধা দান করতে পারেন না রাজকুমারী।

দ্রৌপদী থামল না। দ্রুপদের কোনো কথা বলার আগেই সে নিঃশঙ্কচিত্তে বলল : স্বয়ম্বর সভায় বর নির্বাচনের স্বাধীনতা পাত্রীর নিজস্ব। বীর্যবলে তাকে বাধ্য করার অধিকার কারো নেই। তাই লক্ষ্যভেদে প্রবৃত্ত হওয়ার আগেই বীরকে নিবৃত্ত করেছি। এতে কোনো অন্যায় হয় নি।

কর্ণ যথাস্থানে ধনুক নামিয়ে রেখে শ্লথ পায়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

সভা নিস্তব্ধ। সূঁচ পতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। কেবল দুর্যোধন স্থির থাকতে পারল না। কর্ণের শুষ্ক, নিরানন্দ, তাম্রাভ মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা টনটন করতে লাগল। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বলল : বীর্যশুল্কা হলে, কন্যার নিজস্ব পাত্র নির্বাচনের আর অধিকার থাকে না। শর্ত পূরণ করে যিনি জয়ী হবেন স্বয়ম্বরের কন্যা তাকে নিজের হাতে বরণ করবে। এর অন্যথা হলে মহারাজের ঘোষণা এবং শর্তের কোনো মানে থাকে না। সবটা প্রহসন হয়ে যায়। পাঞ্চাল রাজাকে এটা মানায় না। বীর্যশুল্কার নামে মানী ব্যক্তিদের মান নিয়ে তিনি টানাটানি করছেন। এই ভয়ংকর আগুন নিয়ে খেলার পরিণাম ভালো হবে না।

মহারাজ শল্য ব্যর্থ আক্রোশে তারস্বরে চিৎকার করে বলল: আমরা এত-বড় অপমান মুখ বুজে সহ্য করব না। প্রয়োজন হলে অস্ত্রধারণ করব।

কিন্তু যাকে নিয়ে এতো ঘটনা হচ্ছে সেই কর্ণ নীরব। দুটো দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট বজ্রের মতো এঁটে রেখে ভেতরকার সব যন্ত্রণার শব্দকে যেন আটকে রেখেছে। স্থির চোখে সামনের দিকে চেয়ে নৃপতিবর্গের তর্জন-গর্জন দেখছিল শূন্য চোখে। তার মন আগেই টের পেয়েছিল। এই স্বয়ম্বর সভার কাছে কিছু আশাও সে করে নি। কিন্তু এভাবে একটা মেয়ের কাছে অপমানিত হবে ভাবেনি। সেজন্যেই তার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। অপমান বোধ করল সে। মেজাজটা তাতেই বিস্বাদ তেতো হয়েছিল। কিন্তু দ্রুপদ কৃষ্ণার স্বয়ম্বর সভা করে কী পেতে চায় সেটা দেখার জন্যে চুপ করে বসে- ছিল। দুঃশাসন তার পাশে বসে ফুঁসছিল ; কিন্তু সে কিছুই শুনছিল না। তার কানে শুধু কৃষ্ণার কথাগুলো অনুরণিত হচ্ছিল। আর ভেতরটা অপমানে পুড়ে যাচ্ছিল।

চেঁচামেচি, গণ্ডগোলের মধ্যে এক বিপ্র যুবক লক্ষ্যস্থলের সামনে দাঁড়াল। তার নিঃশব্দ প্রবেশকে কেউ খেয়াল করেনি। ব্রাহ্মণদের সহর্ষ উল্লাস সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

বিপ্র যুবককে দেখে আচমকা একটা অনুভূতি হলো কর্ণের। হঠাৎ তার

সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে উঠল। বুকটা কেমন দুরু দুরু করে উঠল। মনে হচ্ছিল এই বিপ্রযুবক তার খুব চেনা। অর্জুনের চোখ, মুখ, নাক, কানের সঙ্গে বিপ্রযুবকের গভীর সাদৃশ্য তাকে অবাক করল। সব কেমন তার গুলিয়ে যেতে লাগল। বারণাবতের জতুগৃহে তা হলে ঐ মৃতদেহগুলি কাদের? কর্ণের মনটা আবার চককে উঠল। কেমন একটা সন্দেহ ঘুলিয়ে উঠল মনে। বিপ্রের হাবভাব, চলনের মধ্যে অর্জুনের আচরণকে দেখতে লাগল কর্ণ। ভেতরে একটা অস্বস্তিকর উত্তেজনা, অজানা ভয় এবং সংশয় তাকে আবিষ্ট করে রাখল। সে কোনো উচ্চবাচ্য করল না। কাউকে তার সন্দেহের কথা বলল না।

বিপ্রযুবক বেদী প্রদক্ষিণ করে ভক্তিভরে ধনু ও শর ছুঁয়ে প্রণাম করল। তারপর অবলীলায় ধনু তুলে নিল নিজ হাতে। কারো কোনো আপত্তি ও প্রতিবাদ করার আগেই সে ক্ষিপ্রহাতে ধনুতে গুণ পরাল। এবং নিমেষের মধ্যে পরপর পাঁচটি শরে বিদ্ধ করল লক্ষ্যবস্তু। ব্রাহ্মণেরা মুহূর্মুহূ হর্ষধ্বনি করতে লাগল।

কর্ণ নির্বাক। তার কোনো কৌতূহল নেই। থমথমে মুখে সে বাস্তব ঘটনার দিকে চেয়ে রইল। এতক্ষণ পরে, নিজেকে তার গভীরভাবে অপমানিত এবং বঞ্চিত মনে হতে লাগল।

কর্ণ আশ্চর্য হলো, দ্রৌপদী বিপ্রযুবককে একবারও অজ্ঞাতকুলশীল বলে লক্ষ্যভেদে নিবৃত্ত করল না। তার পরিচয় পর্যন্ত জানতে চাইল না। দরিদ্র বিপ্রযুবক পাঞ্চালনন্দিনী কৃষ্ণার যোগ্য পাত্র কিনা সে প্রশ্ন পর্যন্ত দ্রুপদ কিংবা ধৃষ্টদ্যুম্ন কেউ করল না। কৃষ্ণারও কোনো প্রশ্ন ছিল না। অকুণ্ঠ চিত্তে বিজয়ী বিপ্রের কণ্ঠে পরিয়ে দিলো তার বরমাল্য। দ্রুপদও হৃষ্টচিত্তে কন্যাকে বিজয়ী দীনবিপ্রের হস্তে সমর্পণ করল। সভাস্থ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে দ্রুপদ বললেন: এই বিপ্র লক্ষ্যভেদে কৃতকার্য হয়ে কৃষ্ণাকে জয় করল। আপনারা তার সাফল্য অনুমোদন করুন।

অমনি এক উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে গেল স্বয়ম্বর সভায়। পরাজিত,

অপমানিত নৃপগণ একসাথে গর্জে উঠল। জ্বালাময়ী ভাষায় দ্রুপদকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা করল। কটুবাক্য বলল। নিন্দা করল।
দুর্যোধনের কণ্ঠে শোনা গেল স্পষ্ট বিদ্রোহ। বলল: আমরা বিপ্রের কৃতিত্ব সাফল্য এবং জয় অনুমোদন করি না। অধিরথপুত্র কর্ণের যে জয় ছিল করায়ত্ত এই বিপ্রের স্বার্থেই তাকে সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করা হলো। অজ্ঞাতকুলশীল যদি কেউ থাকে এ সভায়, সে এই বিপ্র। এর পরিচয় কি? কোন্ কুলে জন্ম? কোথা হতে আগমন? সে নিমন্ত্রিত, না রবাহূত এসব কোনো প্রশ্ন করা হলো না তাকে। মহারাজ বিপ্র সম্পর্কে কিছু না জেনে, কোনো অনুসন্ধান না করে কন্যা সম্প্রদানে উৎসাহ প্রদান করে প্রমাণ করলেন এই স্বয়ম্বর সভা একটি পূর্বপরিকল্পিত সাজানো ঘটনা মাত্র। ভারতের অগণিত নরপতিদের স্বয়ম্বর সভার প্রার্থীরূপে আমন্ত্রণ করে মিছিমিছি তাদের অপমান করলেন কোন্ অপরাধে?
শল্যরাজ উত্তেজিত গলায় বলল: যুবরাজ দুর্যোধন উচিত কথাই বলেছে। এই স্বয়ম্বর শুধু ক্ষত্রিয়ের অধিকার। মহারাজ বিপ্রের হাতে কন্যা সম্প্রদানের অভিলাষ ব্যক্ত করে ক্ষত্রিয়কুলকে অপমানিত করলেন। এভাবে আমাদের ডেকে এনে অপমান করার মানে কি? আপনাকে এ অধিকার কে দিলো?
বিদর্ভরাজ বললেন: কৃষ্ণার পতিনির্বাচনের কাজটা আগেই সারা হয়েছিল। একটা লোক দেখানো আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করে তাকে শুধু স্বীকৃতি দেওয়া হলো।
চেদিরাজ শিশুপাল বলল: বিপ্রের গৌরব বাড়িয়ে তোলার জন্যে আমাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এই সত্যটা আর গোপন নেই। মহারাজের যাদু ধনুক অপসারণের কৌশল কর্ণ জানত বলেই মহারাজের চতুর ছলনা এবং ষড়যন্ত্রটা জানা গেল। এভাবে আমাদের প্রতারণা করায় আপনার গৌরব কিছু বাড়ে নি।
দুঃশাসন হঠাৎ ক্রুদ্ধ স্বরে বলল: আমরা যদি অপমানের প্রতিশোধ নিই, সকলে মিলে পাঞ্চাল রাজ্যকে শ্মশান করে দিই, পারবে ঐ বিপ্র একা

তার মহড়া নিতে? এতগুলো নরপতিকে অখুশি করাতে বোধহয় আপনার সুখ।

দ্রুপদ বিব্রতভাবে বলল : বিশ্বাস করুন, আপনাদের আমি কোনো অপমান করিনি। আমাকে এতো ছোট ভাবার কোনো কারণ নেই। আমি নির্দোষ।

দ্রুপদ মুখে যাই বলে থাক, কারো কোনো প্রত্যয় জন্মাল না তাতে। গণ্ডগোল বাধল। শুরু হলো সংঘর্ষ।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক নতুন নাটক সূচনা হলো। পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রদের মধ্যে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে পুরাতন বিরোধ ও সমস্যা নতুন করে মাথা চাড়া দিলো। অথচ এরকম হওয়ার কথা ছিল না। কারণ বারণাবতে জতুগৃহে যারা অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল সেই পাণ্ডুপত্নী কুন্তী এবং তার পুত্রেরা কেউ জীবিত ছিল না। ভস্মস্তূপ থেকে ছয়টি মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো।

কিন্তু সেই প্রচণ্ড বাস্তব ঘটনা যে কত মিথ্যে ছিল, পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশে তা উদ্ঘাটিত হলো। এখন ঘটনা স্পষ্ট। পাণ্ডবেরা ভেবে চিন্তে, পরিকল্পনা করেই বিভ্রম উৎপাদনের জন্যে ছ'জন গরীব নিরীহ মানুষকে প্রলুব্ধ করে, গৃহবন্দী করে হত্যা করেছে। দুর্যোধন কিংবা পুরোচন নয় পাণ্ডবেরাই প্রত্যক্ষত জতুগৃহের জন্যে দায়ী। দুর্যোধনের চরিত্রে কলংক লেপনের জন্যেই তারা জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করেছিল। তাদের স্বার্থপরতা, নীচতা, হৃদয়হীন অমানবিক নিষ্ঠুরতা কত ভয়ংকর সেই চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রকে কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক করে রাখল।

সে এক অতীতের মধ্যে ডুবে রইল। বহুদূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট শব্দের মতো বিদুরের কথাগুলো তার কানের পর্দায় স্পন্দিত হতে লাগল। মহারাজ! বারণাবতে জতুগৃহে অগ্নিদগ্ধ হয়ে যারা প্রাণ হারাল তাদের মৃত্যুর জন্যে পুত্র দুর্যোধন আপনার, চিরদিন অপরাধী হয়ে থাকল। কোনো-দিন তো আর এর বিচার হবে না?

কেমন একটা বিভ্রান্ত উত্তেজনায় ধৃতরাষ্ট্রের পিতৃহৃদয় কেঁপে গেল। সেদিনের

অনুভূতিই হলো। চেহারাটা শুধু তার পুরনো। কিন্তু তার কৌতূহলী উৎসুক মন নতুন। এটি এই মুহূর্তের সৃষ্টি। তবু তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা থমকে রইল সেই অতীতের গর্ভে। বিদুরের আকস্মিক অভিযোগের প্রত্যুত্তরে বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল : দুর্যোধন আমার কখনো এত নিষ্ঠুর নয়।

বিদুরের অকম্পিত গলায় উষ্মা প্রকাশ পেল। বলল : এই বিশ্বাসের কোনো মানে নেই। আপনার অন্ধ-পুত্রস্নেহ দুর্যোধনের দুষ্কর্মের জন্যে দায়ী।

ধৃতরাষ্ট্র বেশ একটু অসহায়ভাবে বলল : বিদুর আগে কিন্তু তাদের ওপর এত নির্দয় ছিলে না তুমি। একদিন তারা তোমার নয়নের মণি ছিল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি পাণ্ডুপুত্রেরা যেদিন শতশৃঙ্গপর্বত থেকে হস্তিনাপুর এল সেদিন থেকে তুমি একটু একটু করে বদলে যেতে লাগলে। পাণ্ডবেরা তোমার চোখের মণি হয়ে উঠল, আর আমার পুত্রেরা তোমার দু'চোখের বিষ হলো। অথচ দু'জনের সঙ্গে তোমার সমান সম্পর্ক, সমান আত্মীয়তা। তুমি তাদের শৈশব থেকে দেখছ, তবু এই পক্ষপাতিত্বের অর্থ বুঝি না। আমাকে কখনো দেখেছ পাণ্ডুপুত্রদের কোনো অযত্ন করতে ? কিংবা তাদের প্রতি বিরূপ হতে ? আমার বিশ্বাস, তোমার অনাদর, উপেক্ষা, পক্ষপাতিত্ব এত খোলাখুলি যে তাতে পুত্রেরা আমার তোমার ওপর ক্ষুব্ধ। পাণ্ডবদের ওপর তাদের আক্রোশ, বিদ্বেষের মূলে আছে তোমার বিভেদনীতি। ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘাতের বীজ বপন করেছ তুমি। নির্দোষাকে দোষীর চোখে দেখলে স্বভাবতঃই সে রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়। পাণ্ডবদের প্রতি পুত্রদের রোষ ও ক্ষোভ তো সেই কারণেই। তুমি তাদের বিবাদের মধ্যস্থ না হয়ে ইন্ধন দিয়েছ, পরস্পরকে শত্রু করেছ, অনাত্মীয় করেছ।

ধৃতরাষ্ট্রের অকপট সত্যভাষণে বিদুর চমকে উঠেছিল। গলার স্বরে তার চমকানো বিস্ময়। মহারাজ! তারপর, নিজেকে বেশ একটু সামলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল : আপনার ভর্ৎসনা এবং তিরস্কারের মধ্যে এক-রকমের চাপা নিষ্ঠুরতা আছে। আমার সততা, বিশ্বস্ততাকে বিদ্রূপ করে

আমার প্রতি আপনার জমানো অভিযোগ এবং অবিশ্বাসকেই যেন উগরে দিয়েছেন। আপনার এই নিদারুণ বাক্যে আমি একটু অপমানিত হলাম, কিন্তু ক্ষতি যা হবে তা আপনার। পুত্র স্নেহই আপনার কাল হবে। সেদিন ভ্রমসংশোধনের জন্যে বিদুর আর আসবে না। আপনার রাজসভায় আমি একবারে বেমানান। অবাস্তব। আমার প্রয়োজন আর নেই।

ধৃতরাষ্ট্র বেশ একটু উদ্বিগ্ন হলো। চাবুক খাওয়ার মতোই শরীরের ভেতরটা কেঁপে গেল। কণ্ঠস্বরে তার যুগপৎ ভয় ও উদ্বেগ প্রকাশ পেল। ব্যথিত হয়ে বলল : বিদুর তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। আমি তোমাকে অপমান করিনি। অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। আমার বোঝাতে হয়তো ভুল হতে পারে। কথাগুলো হয়তো ঠিক গুছিয়ে বলতে পারিনি। কিন্তু এ তো ভাইয়ে ভাইয়ে কথা। এর সাথে অন্য প্রসঙ্গ টেনে আনছ কেন? ভুল যদি কিছু হয়েই থাকে সে তো আমার স্নেহাস্পদ এক ভাইয়ের কাছে করেছি। আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে সদ্ভাব তো এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি, তবে, তুমি ওসব কথা বলছ কেন? আমি অন্ধ! চোখে দেখি না। আমার করারও কিছু থাকে না, শুধু থাকে ভাবনা। সারাক্ষণ ধরে সেই কথাই ভাবছি, জতুগৃহে কে আগুন লাগাল? পুরোচন যে নয় সে বিষয় আমি নিশ্চিত।

বিদুর থমথমে গলায় বলল : সব তাদের অদৃষ্ট আর তোমার কর্মফল। আমাকে শুধু নিমিত্তের ভাগী হতে হলো।

বিদুরের কথাগুলো তার কানে এখন বিদ্রূপের মতো শোনাল। যে পাণ্ডবদের সবাই মৃত বলে জানে, পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে তাদের হঠাৎ আত্মপ্রকাশ সব কেমন ওলোট-পালোট করে দিলো। লোকের অনেক কালের জানাটা মিথ্যে হয়ে গেল। তবে দুর্যোধন একটা মিথ্যের কলংক থেকে বাঁচল। আর বিদুর সব জেনেশুনে তার সাথে সত্যের আলাপ করেছে, এই অনুভূতিটা কাঁটার মতো তাকে বিঁধতে লাগল।

আচমকা পায়ের শব্দে ধৃতরাষ্ট্রের ভেতরটা থরথরিয়ে কেঁপে গেল। সমস্ত ইন্দ্রিয় চেতনার বিন্দুতে সংহত ও সজাগ হলো। থমথমে গলায় বলল :

কে কর্ণ এলে নাকি ?

হ্যাঁ, মহারাজ। কেমন করে জানলেন ?

তোমাদের পায়ের শব্দ, নিশ্বাসের শব্দ, গায়ের গন্ধ আমি টের পাই।

মহারাজ আমাকে স্মরণ করেছেন ?

হ্যাঁ বৎস। তোমার সাথে আর কেউ আছে ?

কক্ষে আমি একা। দ্বারের বাইরে আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করছেন সখা দুর্যোধন এবং মাতুল শকুনি। অনুমতি করলে—

আশ্চর্য তোমাদের সম্ভ্রমজ্ঞান। পুত্র আসবে পিতার কাছে এর জন্য অনুমতির দরকার ?

কর্ণ ইশারা করলে শকুনি এবং দুর্যোধন ঢোকে। ধৃতরাষ্ট্র বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল : আমার কাছে আসতে তোর সংকোচ হয় ?

দুর্যোধন একটু অপ্রতিভ হ'লো। বলল : পিতা, আমার সমস্যাটা একটু অন্য রকম। খুব সরল নয় বলেই হাজার জটিলতায় বিভ্রান্ত।

পুত্র ওসব কথা আলোচনা করে আমাদের কোনো লাভ নেই। এখন যে ঝামেলায় আমাদের কারো মন স্থির নেই সে প্রসঙ্গ শুরু করা যাক। পাণ্ডবেরা এখন বাস্তব সত্য। হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে তারা একটা প্রকাশ্য বিরোধে নামতে চায়। দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন থেকে তারা পরিকল্পিত উপায়ে সেই জমি প্রস্তুত করেছে। বিভ্রম উৎপাদনের জন্যে জতু-গৃহে কটা নিরীহ মানুষকে খুব শান্ত মাথায় পুড়িয়ে মেরেছে। সবরকম সন্দেহের বাইরে থেকে তারা সিংহাসনে উত্তরাধিকারী নিয়ে হস্তিনাপুরের পারিবারিক বিরোধ ও কলহকে প্রকাশ্য রাজনীতির খোলা মাঠে টেনে আনছে। রাজনৈতিক বিবাদ ও সংঘর্ষ বাধানোই তাদের উদ্দেশ্য। এহেন ঘরের শত্রু সম্পর্কে তোমরা কে কি ভাবছ অসংকোচে ব'ল ?

দুর্যোধন মুহূর্তে তার দ্বিধা কাটিয়ে বলল : পিতা! শুনেছি পুরাকালে সুন্দ-উপসুন্দ নামে দুই অসুর ছিল। তাদের দু'ভাইয়ের সম্প্রীতি, ঐক্য এবং পরস্পরের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। ভ্রাতৃপ্রেম ছিল সব শক্তির উৎস।

যা কিছু তাদের, তার ওপর ছিল দু'জনের সমান ভাগ। যা কিছু শক্তি, সম্পদ, ঐশ্বর্য তাও ছিল তাদের দুজনের। ভ্রাতৃপ্রেমে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা সন্দেহ অবিশ্বাস কিছুই ছিল না। পরাক্রমশালী দুই অসুরের ভয়ে দেবতারাও পর্যন্ত বিপন্নবোধ করতে লাগল। দেবরাজ ইন্দ্রের দুশ্চিন্তায় কাটতে লাগল প্রতিটি মুহূর্ত।

ধৃতরাষ্ট্র বেশ একটু অসহিষ্ণু এবং বিরক্ত প্রকাশ করে বলল: এখন রসিয়ে গল্প শোনার সময় নয় পুত্র।

পিতা! এ গল্প নয়, মানুষকে পথ দেখানোর কাহিনী। এই গল্প থেকেই আমরা আমাদের পরবর্তী কার্য ও নীতি স্থির করতে পারব। দেবরাজ ইন্দ্র তখন দু'ভাইয়ের ঐক্যে আঘাত করার জন্যে ভেদনীতি গ্রহণ করলেন। ললনাপ্রিয় দেবরাজ তাঁর প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে বুঝলেন পার্থিব সব সম্পদই সমানভাগে ভাগ করা যায়। কেবল যা যায় না, তা হলো রমণীর প্রেম। কোনো সুন্দরী রমণীর সুখ, সঙ্গ, ভালবাসার ভাগ অন্যকে দেওয়া যায় না। কোনো পুরুষ সিংহ তার ঈপ্সিত রমণীর ওপর অন্যের কর্তৃত্ব ও অধিকার স্বীকার করে নেয় না। ইন্দ্র তখন এক অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী মোহিনী রমণী তিলোত্তমাকে পাঠালেন তাদের কাছে। তাকে দেখে দু'ভাই মুগ্ধ হয়ে গেল। দু'জনেই তাকে ভার্যারূপে পেতে চাইল। তাদের অমন যে ভ্রাতৃ-প্রেম তাও টলে গেল। দু'জনে দুজনের বৈরী হলো। বাধল লড়াই। লাভ হলো না কারো। দু'জনেই লড়াইয়ে মারা গেল। তেমনি পাণ্ডবদের জীবনে একমাত্র রমণী দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চভ্রাতার মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা সৃষ্টি করে অনুরূপ সংকট বাধিয়ে তোলা খুব কষ্টকর কল্পনা নয় আমাদের।

দুর্যোধনের প্রস্তাব ধৃতরাষ্ট্রের মন ছুঁয়ে গেল। বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো হঠাৎ অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা তার মাথার মধ্যে খেলে গেল। চোখে মুখে একটা খুশির ভাব ফুটে উঠল। কিন্তু কাজটা যে আদৌ সহজ নয় এই চিন্তায় পরমুহূর্তে তাকে কিছুটা বিমর্ষ ও চিন্তিত দেখাল। বলল: দুর্যোধনের প্রস্তাবটা ভেবে দেখার মতোই। পাঞ্চালীর মনের ক্ষোভ, দুঃখ, বিদ্বেষ, ঘৃণার

ইন্ধন দেবার উপযুক্ত সময় এখন। অর্জুন ছাড়া অন্য পাণ্ডবদের মেনে নেওয়া নিয়ে তার মনের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঝড় উঠেছে। আমাদের লোকদের কাজ হবে তার মনের অভ্যন্তরের সংঘাত বাড়িয়ে তোলা। দেহ ও মনের দ্বন্দ্বে তার চিত্ত ক্লিষ্ট হলে অর্জুন বাধ্য হবে অন্য ভ্রাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে। একবার ঐক্য ভাঙলে আর তার গতি রোধ করতে পারবে না পাণ্ডবেরা। এখন অঙ্গরাজ কর্ণ, তুমিই বল, কী করলে পাণ্ডবদের হস্তিনা-পুরে আগমন বন্ধ হয়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নে কর্ণ চমকে উঠেছিল। একটা গভীর আচ্ছন্নতা থেকে সহসা সে যেন জেগে উঠল। তার দুই চোখে তখনও বিহ্বলতার ঘোর। তার সমস্ত চেতনা হবে তখনও দ্রৌপদীর ভাবনা। দৈবকে কোনো মানুষ অতিক্রম করতে পারেন না। মানুষ চাইলেও পারে না। দ্রৌপদী চেয়েও পায়নি। ভাগ্যই তাকে বিমুখ করেছে। বহুপতিত্ব তার ভাগ্যের লিখন। কর্ণকে সে কেমন করে স্বীকার করবে? তার জীবন বিধাতা সুখের জন্যে তৈরি করেনি। মনের আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার জন্যে সে জন্মেছে। কর্ণের সাধ্য কি তাকে প্রেমে সুখী করা? পতঙ্গের আগুনে ঝাঁপ দেওয়াটাই সুখ। দ্রৌপদীও তেমনি স্বেচ্ছায় জেনে শুনেই ঐশ্বর্যহীন, রাজ্যহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বেশী অর্জুনকে বরমাল্য দিয়ে তার দারিদ্র্যকে মনে মনে স্বীকার করে নিয়ে দুঃখ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে। কেবল অদৃষ্টের পরিহাসটা তার জানা ছিল না।

দ্রৌপদীর কথা ভেবে কর্ণের মন খারাপ হয়ে গেল। তার নিজেরও বিস্ময় লাগল। যে তাকে অপমান করল, ঘৃণা করল তার জন্যে মনটা এত নরম হয় কেন? সহানুভূতিতে হৃদয় গলে গলে পড়ে কেন? এই কেন'র কোনো উত্তর নেই। কর্ণ কেমন করে জানবে কোথায় তার শূন্যতা? কোথায় তার ব্যথা? কিন্তু এগুলোর অস্তিত্ব সে টের পায়। কেবল ভালো করে অনুভব করতে পারে না। পাছে নিজের কাছে ধরা পড়ে যায় তাই হয়ত চেষ্টা করে না। কী লাভ শূন্যতাকে জেনে? জানা মানে তো কষ্ট পাওয়া। মন যদি

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে কি তুমি পাওনি ? স্ত্রীর প্রেম, ভালবাসা, রাজার সম্মান, বাঁচার গৌরব, বন্ধুত্বের মর্যাদা ? কোন্‌টা পাওনি ? তখন অভিযোগ করার মতো কিছুই তার নেই। এরকম একটা চিন্তায় সে বিভোর হয়েছিল। চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা বিষন্ন বিহ্বলতা ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের আচমকা প্রশ্নে সে এক গভীর কৃতজ্ঞতায় তার জ্যোতিহীন স্থির দুই চক্ষুতারকার দিকে অপলক চেয়ে রইল।

কর্ণকে নিরুত্তর দেখে ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় বলল : কর্ণ, তুমি কথা বলছ না কেন ?

থমথমে গম্ভীর গলায় কর্ণ বলল : মহারাজ বড় কঠিন প্রশ্ন। জটিলও বটে। আমি কিন্তু সখা দুর্যোধনের প্রস্তাবকে যথার্থ বলতে পারছি না। ব্যাপারটা বোধহয় এত সহজ করে দেখার বস্তু নয়। সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী পুনারাবৃত্তি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তাদের জীবনে। কারণ পাঁচজনের সম্মতিতে দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা। তাকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডবের ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ বাধার কোনো কারণ নেই।

শকুনি বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল : তুমি ঠিক বলেছ। এক নারীর ওপর পাঁচজন পুরুষের অধিকার নিয়ে ভেদোৎপাদনের নীতি এখানে খাটবে না।

মাতুল, আমার বক্তব্য কিন্তু শেষ হয় নি।

বেশ বলো ?

মহারাজ, আমার সঙ্গে তার যে বিরোধই থাক না কেন, নিরপেক্ষ মন নিয়ে যখন তার কথা চিন্তা করি, শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে। তার জীবনে যে ঘটনাই ঘটুক সে মেনে নিয়েছে তাকে। সত্যি বলতে কি, পাণ্ডবদের জীবনে দ্রৌপদী বিধাতার আশীর্বাদের মতোই। পঞ্চপাণ্ডবের ভ্রাতৃপ্রেমকে সে আপন প্রণয়পাশে একসূত্রে নিবিড় করে গেঁথে রাখবে। এক নারীতে আসক্ত হওয়ার জন্যে পাঁচভাইয়ের ওপর তার একার কর্তৃত্ব ও অধিপত্য থাকবে। দ্রৌপদীর প্রেম তাদের পাঁচ ভাইয়ের জীবনে এক মহা অঙ্গীকার।

সৌভ্রাত্র অবশ্যই তাদের প্রেমের ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলবে।

ধৃতরাষ্ট্র ভগ্নোৎসাহ হয়ে মুখে একটা শব্দ করল। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল 'হুম' শব্দ। তারপর বলল : দ্রৌপদীর মনকে বিষিয়ে দিয়ে পাণ্ডবদের সত্যিই কোনো ক্ষতি হবে না। তাহলে এখন কি করলে আমাদের সকলের মঙ্গল হয়, এমন একটা উপায় উদ্ভাবন কর।

মহারাজ, মাতুল শকুনি এখানে উপস্থিত আছেন। তিনিই উপায় স্থির করুন।

কর্ণ এতই আচম্বিতে শকুনির ওপর কর্তব্য নির্ণয়ের দায়িত্ব অর্পণ করল যে, শকুনির ধুরন্ধর কূটনীতিক হয়েও বেশ একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। প্রশস্ত কপালে তার চিন্তার গাঢ় কুঞ্চন, নাসিকায় প্রচ্ছন্ন জিঘাংসা। ধনুকের মতো বাঁকা ওষ্ঠাধরে সংকট সমাধানের পাথর কঠিন আত্মপ্রত্যয়। ধীরে ধীরে তার অপ্রস্তুত ভাবটা শান্ত গভীর ভাব ধারণ করল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল : পাণ্ডবদের অন্ধকার আকাশে ভীমই একমাত্র তারকা। অর্জুনের যেটুকু দীপ্তি তা ভীমের কাছ থেকে পাওয়া। ভীম ব্যতিরেক অর্জুনের একার শক্তি কর্ণের অর্ধেকও নয়। ভীম পাণ্ডবদের শক্তির দুর্গ। আর সেই দুর্গের দুর্গাধিপতি হলো অর্জুন। অর্জুন নয় ভীমই এই মুহূর্তে আমার দুশ্চিন্তার কারণ। শুধু তাকে পাণ্ডবদের সংহতি থেকে আলাদা করার কথা ভাবছি। বলতে বলতে শকুনির অধরপ্রান্তে কুটিল হাসির রেখা বক্র হলো। কর্ণের দিকে তাকিয়ে বলল : অঙ্গরাজ, তুমি কি বলতে চাও, আমি জানি। সৃষ্টি ও বিনাশের ক্ষমতা দিয়ে বিধাতা মানুষকে একটা ছোটখাট বিধাতা বানিয়েছে। চরিত্রবলের সঙ্গে অনেক-রকম দুর্বলতা যে তার আছে সেটা মানুষ ভুলে যায়। ঐ ভুলের রন্ধ্রপথ দিয়ে শনির মতো তার জীবনের মধ্যে সর্বনাশ প্রবেশ করে। নিয়তির রূপ ধরে দ্রৌপদী প্রবেশ করেছে তাদের জীবনে। একদিন তাকে নিয়ে আগুন জ্বলবে। সে আগুনে আমরা সকলে পুড়ে মরব। কেউ বাঁচব না। তবু একটা কিছু করা দরকার। আমার মনে হয় পাণ্ডবদের মধ্যে ভীম

যেমন বলবান, তেমনি তাদের সর্বচেয়ে দুর্বলতম জায়গা। ছোটখাট ঐ বিধাতাপুরুষকে দিয়ে আমাদের আঘাত হানতে হবে। ভীমের দৈহিক বলের গর্ব খুব। ভীষণ দাম্ভিক এবং স্তুতিপ্রিয় সে। বলের প্রশংসা শুনতে ভালবাসে, না শুনলে অপমানিত হয়। রসিকতাও সে ভালো করে বোঝে না। একটুতে উত্তেজিত হয়, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করে না—এসব চিন্তা-ভাবনা মাথায় রেখে একটা কিছু করা।

শকুনির বাক্য দুর্যোধনের মনঃপূত হলো না। ধৃতরাষ্ট্রও খুশি হলো না। বেশ একটু অধৈর্য হয়ে উত্তেজিত গলায় বলল : শকুনি তোমার প্রস্তাব যে কতখানি নিরর্থক, তুমিও ভালো করে জান। এত ধীরে সুস্থে করার মতো সময় কোথায়? হস্তিনাপুরে তাদের এসে পৌছনোর আগে কিছু করতে হবে। হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকবে কৌরবদের হাতে। এখানে তারা অবাঞ্ছিত। এই সংকট মুহূর্তে এমন কূট জালে তাদের বাঁধা যে প্রাপ্তির প্রত্যাশা পূরণ হওয়া তো দূরের কথা, অদূর ভবিষ্যতে হস্তিনা-পুরের কাছে তাদের আশারও কিছু থাকবে না। কর্ণ তুমিই বলো, কী করবে দুর্যোধন?

কর্ণ আড়চোখে শকুনিকে একপলক দেখল। ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যে তার মুখ-খানা তীব্র অপমানে আগুনের মতো গনগন করছিল। প্রসন্ন আত্মতৃপ্তির যে ভাবটা তার মুখে কথা বলার সময় ফুটে উঠেছিল ধৃতরাষ্ট্রের উক্তিতে সহসা তা মুছে গিয়ে মলিন হলো। শকুনি পাছে ক্ষুণ্ণ ও অপমানিত হয় সেজন্যে কর্ণ বলল : মহারাজ, মাতুল শকুনি কথায় গোলকধাঁধায় যে কথাটা বলেছেন তার সারমর্ম হলো মুখোমুখি যুদ্ধ করে, জয়-পরাজয়ের মীমাংসা করে নেওয়া। এছাড়া চিরস্থায়ী মীমাংসার বিকল্প কোনো পথ নেই। আমিও বলি, আপনি যুদ্ধ করুন। আমার মনে হয়, যুদ্ধের এখনই সবচেয়ে ভালো সময়। পাণ্ডবেরা এখনও সবদিক গুছিয়ে উঠতে পারেনি। তাদের মিত্রবল, বাহুবল, অর্থবল কিছু নেই। যুদ্ধের জন্যে এই মুহূর্তে কেউ প্রস্তুতও নয়। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ এবং যাদব প্রধান কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সাহায্যে সংঘবদ্ধ

হয়ে কিছু করার আগেই অতর্কিতে চতুর্বাহিনী নিয়ে হীনবল পাণ্ডবদের আক্রমণ করে কারারুদ্ধ করুন। ছলনাপ্রিয়, মিথ্যাচারী, কপট খুনী পাণ্ডবদের হত্যা করে অথবা নিপীড়ন করে যোগ্য শাস্তি বিধান করুন। বিক্রম ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ে তাদের গতি রুদ্ধ করা অথবা নিশ্চিহ্ন করা অসম্ভব।

ধৃতরাষ্ট্র মনোযোগ দিয়ে কর্ণের সব কথা শুনল। ভেতরটা তার উদ্দীপ্ত হলো। যুদ্ধই সমাধানের পথ। কিন্তু যুদ্ধে পিতৃব্য ভীষ্ম এবং অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে রাজি করা খুবই শক্ত ব্যাপার। এক নিরুপায় অসহায়তায় হঠাৎ তার ভেতরটা অক্ষম ক্রোধে দপ্ করে জ্বলে উঠল। বলল : যুদ্ধ? কার সাথে যুদ্ধ? হস্তিনাপুরের তারা কে?

কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের রাগ দেখে একটু হাসল। বিস্ময়টাকে নিজের ভেতর গোপন রেখে বলল : এই আপত্তির কোনো মানে হয় না। যখন দরকার ছিল, তখন কিছুই করেন নি। এখন একথা বললে লোকে আপনাকে শঠ, প্রতারক বলবে। তাতে আপনার সম্মানহানি হবে শুধু। অধিকার একবার স্বীকার করে নিলে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন হয়। কিন্তু অধিকারকে করায়ত্ত রাখার জন্যে যুদ্ধ করা ক্ষাত্রধর্ম। দুর্যোধন তার দাবি নিয়ে যদি পাণ্ডবদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে কেউ সেটা নিন্দে বা মন্দ বলতে পারবে না। মহারাজ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দাবি নিয়ে একটা ইতরেতর প্রাণীও লড়াই করে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করে। সে হলো অস্তিত্বের লড়াই। নিজের অস্তিত্বের জন্যে দুর্যোধনেরও সে অধিকার আছে। মনুষ্যোচিত অনেক ব্যাপার থাকে যা পেতে সংগ্রাম করতে হয়। এখন যা শ্রেয়স্কর হয় আপনিই স্থির করুন।

যুদ্ধের কথাটা হঠাৎ বলতে পেরে কর্ণ বেশ একটা স্বস্তি ও সুখ অনুভব করল। বেশ বুঝতে পারল, মনের অতলে লুকোনো এক জ্বালাময়ী ঈর্ষা এবং সুতীব্র অপমানবোধ থেকে কথাগুলো উৎসারিত হয়েছে। প্রতিহিংসায় প্রতিশোধস্পৃহায় যেন জ্বলজ্বল করছে তার ভাষণ।

দুর্যোধন কর্ণের প্রদীপ্ত উজ্জ্বল মুখশ্রীর দিকে কৃতজ্ঞ ও অভিভূত চোখে তাকিয়ে রইল। ধৃতরাষ্ট্রের বুকের গভীর থেকে একটা বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস সজোরে পড়ল। বলল: তোমার মতো বিক্রম সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই এধরনের ভাষণ শোভা পায়। কিন্তু পিতৃব্য ভীষ্ম, এবং আচার্য দ্রোণ কখনই এ যুদ্ধ সমর্থন করবেন না। তাঁরা উভয়েই পাণ্ডুপুত্রদের রাজ্য ভাগ দিতে পরামর্শ করবেন।

কর্ণের মুখখানা সহসা প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার আশংকায় থমথম করতে লাগল। বলল: মহারাজ, আমার ছোট মুখে বড় কথা বলা সমীচিন নয়। তবু, আপনার ও সখা দুর্যোধনের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগবশতঃ সেই অপ্রিয় কথা না বলে থাকতে পারছি না। আপনারাই আমার একমাত্র সুহৃৎ। আপনাদের ভালো মন্দ আমার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। তাই রূঢ় কথা মুখে আসছে। যাঁদের আপনি শ্রদ্ধা করেন, যাঁদের পরামর্শ ও মত ছাড়া কোনো কাজ করেন না, তাঁরা কেউ আপনার স্বার্থের কথা ভাবে না, আপনার পুত্রদের তাঁরা মঙ্গলার্থী নয়। তবু একটা সংস্কার বশে তাঁদের মেনে চলেন। দুষ্ট মন, প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা মুখে এক, কার্যে আর এক করে, তাঁরা কেউ সাধু নয়। এদের সংস্রব থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো। পারলে, এই আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসুন। ভাগ্যে যদি সর্বনাশ লেখা থাকে তা কেউ রদ করতে পারবে না। বারণাবতে জতুগৃহে পাণ্ডবরা নিহত হলো কৈ? হস্তিনাপুরের সিংহাসন যদি তাদের অদৃষ্টে লেখা থাকে, আপনার সাধ্য কি তা থেকে তাদের বঞ্চিত করেন?

৭

কৃষ্ণার অপমানের কথাটা কর্ণ ভুলতে পারছিল না। ভেতরটা তার দুঃসহ তাপে পুড়ে যাচ্ছিল। সেই নিদারুণ মর্মযন্ত্রণার কোনো সঙ্গী নেই। মনের অভ্যন্তরে সব সময় তার একটা অস্ফুট আলোড়নের শব্দ শুনতে পায়। নিজের মনেই 'প্রশ্ন করে কেন পদ্মাবতীর নিষেধ শুনল না। শোনাটাই ভালো ছিল। শুনলে এমন ঘটনা ঘটত না।

বুকের মধ্যে হঠাৎ স্পন্দিত হলো দ্রৌপদীর কণ্ঠস্বর। 'রাজকুমারী হয়ে কোনো অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে আমি পতিরূপে নির্বাচন করতে পারি না।' কথা-গুলো কানে এবং হৃদয়ে এমনভাবে বসে গেল তা জীবনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠল। নিস্তব্ধ রাতের এই নির্জনতায় সেই কথাগুলো মনকে ছেয়ে থাকে। কিছু ভালো লাগছিল না। মনটা কেমন পাগল পাগল হয়েছিল।

অর্জুনের ভাগ্যটাই একটু অন্যরকম। বিধাতা তাকে ঈর্ষা করার মতো ভাগ্য দিয়েছে। সর্বক্ষেত্রে তাকে যে কোনো উপায়ে জিতিয়ে দেওয়া তাঁর অভিলাষ। আর তার কপাল হলো বঞ্চনার। মুখের কাছ থেকে গ্রাস কেড়ে নিয়ে বিধাতা যেন পরম কৌতুক করেন তার সাথে। বিধাতা নিরপেক্ষ নন। তাঁর বিচার সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। এক একজনের ভাগ্য এক একরকম। অনন্ত বৈচিত্র্যে ভরা তাঁর ললাট লিখন। মানুষের ভাগ্য নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা কেন? অথচ, একদিন বিশ্বাস করত বিধিলিপি নয়, সবার ওপর সত্য মানুষের পৌরুষ। পৌরুষ বলে সে অর্জন করবে তার আকাঙ্ক্ষার স্বর্গ। ব্যর্থ করে দেবে বিধাতার ছলনা, চক্রান্ত। কিন্তু পারল কি? কোন্ রন্ধ্র দিয়ে যে দৈব অকস্মাৎ ঢুকে পড়ে জীবনের অভ্যন্তরে

তা অনুমান করা মানুষের অসাধ্য।

মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। কর্ণ একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর খোলা আকাশের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। আকাশ ভরা তারা, নক্ষত্র, গ্রহ নিয়ে রাত্রির সংসার। সেখানে কোথাও বিরোধ নেই, সংঘর্ষ নেই। কেউ কাউকে ছুঁয়ে নেই। পাশাপাশি একটা দূরত্ব নিয়ে রূপের ছটায় জ্বলজ্বল করছে। ওরা সমস্ত জীবন ধরে চেষ্টা করলেও একে অন্যকে ছুঁতে পারবে না, কাছেও আসতে পারবে না। কিন্তু মানুষ তো বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার জন্যে হয় নি।

আচমকা একটা নরম কোমল হাতের স্পর্শে কর্ণের ভেতরটা কেঁপে উঠল। এ হাত তার অত্যন্ত চেনা। তবু একটা দুরন্ত অপরাধবোধে সে নিশ্চল হয়ে রইল। পাছে তার ভেতরের অস্থিরতা পদ্মাবতী টের পেয়ে যায় তাই সমস্ত শরীরটা সে শক্ত করে রাখল।

পদ্মা তার কাঁধের ওপর হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। কর্ণের বুকের ভেতরটা উথালপাথাল করতে লাগল। এক ধরনের অপ্রকাশ্য ভালোলাগাও সেই নীরবতার সঙ্গে মিশে ছিল। একটা শরীরের ছোঁয়াতে এমন অদ্ভুত আশ্চর্য অনুভূতি হয় কেমন করে!

পদ্মাবতীই নীরবতা ভঙ্গ করল। ধীর শান্ত গলায় বলল: অনেক রাত হয়েছে শোবে চল। রাতের পর রাত জেগে কিছু সুরাহা করতে পারলে? মিছি-মিছি নিজেকে শুধু কষ্ট দেওয়া। তোমার সাথে আমিও কত ভোগ করছি বল তো?

বাইরের দিকে চেয়ে বলল: প্রকৃতি কত শান্ত, নির্বিকার, কেবল আমার ভেতরটাই অশান্ত। কিছুতে ঘুম আসে না।

শোবে চল।

পদ্মা, রাতের আকাশেও ছাখ রাত জাগা একটা পাখী অন্ধকারে একা একা উড়ে চলেছে! কোথায় চলেছে, কেন চলেছে ও বোধহয় জানে না। হয়তো মনের নিঃসঙ্গতা ভোলবার জন্যে ওর অবিরাম উড়ে চলা।

পদ্মার বুকে অভিমানের সমুদ্র উথলে উঠল। বলল : তোমার কাছে আমি পুরনো হয়ে গেছি। আমার সব দাম ফুরিয়ে গেছে। আমাকে তুমি একটুও বোঝ না। বুঝলে, এমন করে কষ্ট পেতে হতো না।
পদ্মা, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। পুরুষের মনের কথাটা নারী হয়ে তুমি বুঝবে না। কর্ণ মিথ্যে কথা বলে না। কৃষ্ণাকে বধূরূপে পেলাম না বলে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। কিন্তু সে আমার পৌরুষকে অপমান করল। নিশ্চিত জয়ের গৌরব থেকে বঞ্চিত করল। তার এই স্পর্ধাকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না। লজ্জা অপমানে আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে।
কর্ণের কৈফিয়ৎ শুনে পদ্মা অদ্ভুত হাসল। সে হাসি অবিশ্বাসের। কী জানি! আসলে যা দামী, তোমার মতো পুরুষ মানুষরা তার কোনো দাম না দিয়ে, যা দুর্লভ, অপ্রাপ্য, সস্তা তাকেই মহামূল্য মনে কর। মেয়েদের সম্বন্ধে চিত্তের এই দুর্বলতা এবং মোহকে গোপন করার জন্যে বোকা বোকা কথা বলো। এসব কৈফিয়তের কোনো মানে হয় না। তারপর একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : ভগবান শক্তিমান পুরুষদের যে এত দুর্বল করে গড়লেন কেন, তা তিনিই জানেন। শুধু মানুষরাই নারীর কাছে এলে দুর্বল হয়ে পড়ে, আবার তাকে না পেলে বর্বর হয়ে ওঠে। তাই না? জন্তু জানোয়ারদের কিন্তু এসব দুর্বলতা নেই।
কর্ণ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে পদ্মার দিকে চেয়ে রইল। এসব পদ্মার অন্তরের কথা নয়। এক সুতীব্র অভিমান থেকে তার কথাগুলো উৎসারিত হয়েছে। এই আঁধার রাতের রহস্যের মতোই নারী মনের রহস্য জটিল। পাঞ্চালীর প্রতি তার জমে ওঠা বিদ্বেষটা উগরে দিতে গিয়ে একরকমের চাপা নিষ্ঠুরতা তার কৌতুকে প্রকাশ পেয়েছে। নিছক কৌতুকে বিদ্ধ করতে চেয়েছিল পদ্মাবতী।

এত অনুভব করার পরেও, কথা বলার সময় কর্ণের আহত সম্ভ্রমবোধ তাকে অসংযত করল। বিরূপ গলায় বলল : পুরুষের ব্যথা তুমি কি বুঝবে? তোমার চোখে মেয়ে মানুষ মানে আদর করা, রমণ করা। কিন্তু এসব

ছাড়াও কিছু কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকেই। সেই ব্যক্তিসত্তা নিজের নিজেরই একার। তোমার জগৎ আমার জগৎ সেখানে আলাদা। তাই কোনোদিন তুমি সেখানে পৌঁছতে পারবে না।

পদ্মাবতীর দুই চোখে কৌতুক, মুখে হাসি। বলল : একদিন মনের আবরণ খুলে তুমি আমাকে চিনতে শিখিয়েছিলে নিজেকে এবং তোমাকে। আমার সে জানার কোনো ভুল নেই। মুখে তুমি যাই বলো, আমার মতো ছোট্ট একটা মেয়েমানুষের মধ্যে তোমাকে ধরে না বলেই তুমি অন্য একটি মেয়ের দিকে দৌড়ে গেছ। দ্রৌপদী তোমাকে অপমান করলেও, তুমি তার চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারছ না। নিজের করে না পাওয়ার জ্বালায় তোমার ভেতরটা জ্বলছে। তাই, নিশিদিন এক ধরনের অব্যক্ত নিষিদ্ধ সঙ্গ সুখের কল্পনায় বিভোর হয়ে আছ। তোমার এই ভ্রষ্টামি চোখে দেখাও পাপ। আমার সম্ভ্রমবোধে প্রচণ্ডভাবে লাগছে। নিজেকে ভীষণ অপমানিত মনে হচ্ছে। তবু তোমার জীবনটা এইভাবে আমি শেষ হতে দেবো না।

পদ্মাবতী! থমথম করে উঠল কর্ণের গলা।

চমকে উঠল পদ্মাবতী। কর্ণের এমন গলা বেশি শোনে নি সে। তাই চুপ করে রইল।

গভীর অপমানে আর লজ্জায় কর্ণের ফর্সা মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। বলল : এমন করে কাউকে জড়িয়ে কথা বলো না। নিজেকে কেন তুমি ছোট করবে? আমার নিজের কথাটা হয়ত ঠিক গুছিয়ে বলতে পারিনি তোমাকে, সে দোষ আমার। আবার আমার নয়। কিছু কিছু কথা থাকে যা একান্ত নিজের। একেবারে একার। যা নিজে বোঝা যায়, কিন্তু বোঝানো যায় না ঠিকভাবে। আমার কথাটাও বোধহয় সেরকম।

পদ্মাবতী গভীর আগ্রহ নিয়ে কথাগুলো শুনল। কর্ণের কথায় জাদু আছে। কানে এলে মনটা খুশিতে ভরে যায়। কে জানে? কী আছে তার গলার স্বরে। অভিভূত গলায় বলল : তোমার সব কথার অর্থ বুঝতে পারি না। থাক সে কথা। শোবে চল।

আকাশভরা তারার রাজ্য ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। গাছেরা, তারারা আমাদের দিকে চেয়ে আছে। ওদের মধ্যে আরো একটুক্ষণ দু'জনে ধরা-ধরি করে থাকি না। দমবন্ধ ভরা ঘরে একঘেয়ে ক্লান্তিকর বিষণ্ণতার মধ্যে থাকতে তোমার ভালো লাগে? এখানে কত বড় আকাশ, কী বিরাট খোলা জায়গায় এত হাওয়া, এত মুক্তির উল্লাস আর কোথাও নেই।

পদ্মাবতী দারুণ মুগ্ধ বিস্ময়ে চমকে উঠল। থরথর করে তার হাঁটু কেঁপে উঠল, ভেতরটা অনুরণিত হলো। ডাক ভুলে যাওয়া পাখীর মতো বিভোর চোখে কর্ণের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কী যে বলবে কর্ণের কথার প্রত্যুত্তরে ভেবে পেল না। কর্ণের মুখের ওপর চাঁদের স্নিগ্ধ আলো এসে পড়েছে। ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। পদ্মা তার দুই চোখের তারায় নিজের হারানো মুখখানা খুঁজে পেল। কেমন একটা অদ্ভুত সুখের আবেশে তার দুই চোখের পাতা বুজে এল। সেই ভালো লাগার মুহূর্তটা সে একটুও নষ্ট হতে দিলো না। কর্ণের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। পদ্মার গায়ে কর্ণের নাকের উষ্ণ শ্বাস লাগছিল। কর্ণকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে পদ্মা তার খোলা বুকের নরম লোমের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গায়ের ঘ্রাণ নিল। মুখ ঘষল।

কর্ণ তাকে বুকে টেনে নিল। পদ্মার মাথার ওপর মাথা রাখল। তারপর রদ্মার মুখখানা দু'হাতে তার নিজের মুখের খুব কাছে অভিভূত গলায় শ্বাসরুদ্ধ স্বরে বলল : পদ্মা, জীবনের সব কথা অকপটে বলা যায় দু'একজনকে। তেমন একজন তুমি। কিন্তু তোমার কাছে মন খুলে সে কথা বলতে ভয় করে।

পদ্মা অবাক গলায় বলল : আমাকে তোমার ভয় কিসের?

পাছে তোমাকে হারাই। তোমার ভালবাসার পুকুর যদি শুকিয়ে যায়, তা হলে কী নিয়ে আমি থাকব? আমার তো থাকার মধ্যে আছ তুমি। এই আশ্রয়টুকু কোনো কিছুর বিনিময়ে হারাতে চাই না।

পদ্মার দু'চোখে অতল বিস্ময়! কথা বলতে গিয়ে তার গলার স্বর কেঁপে গেল। বলল : আমার ওপর বিশ্বাস থাকলে এমন কথা কখনও বলতে

পারতে না তুমি।

কর্ণ মুখে তুলে পদ্মার স্নিগ্ধ দুই চোখের ওপর তার তৃষিত দু চোখ রাখল। তারও গলা কাঁপছিল। বলল : আমার বিশ্বাসের মূল্য কি? যাদের আমি বিশ্বাস করেছিলাম তারা কেউ এতটুকু সহানুভূতি দেখায় নি। আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে তাদের কেউ ভর্ৎসনা করেছে, কেউ অভিশাপ দিয়েছে। আমার ওপর তাদের আক্রোশ কেন, জানিনা? আমাকে নিয়ে একটা গভীর রহস্য হয়ত কোথাও আছে! তাই নিজেকে নিয়ে আমার কত প্রশ্ন? আমি কে? কি আমার পরিচয়? কোথা থেকে আমি এসেছি? কে আমার পিতা মাতা? অধিরথ, রাধা তা-হলে কে? আমাকে নিয়ে বিধাতার এত কৌতুক কেন? শত শত মানুষের বিষ সন্দেহই-বা আমাকে ঘিরে রয়েছে কেন? আমার অপরাধ কী? জন্মে যদি কোনো রহস্য থাকে তার দোষ তো আমার নয়। অন্যের দোষ, অপরাধ, পাপ, আমার ঘাড়ে পড়বে কেন? জান পদ্মা, শিক্ষার জন্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যে আমি কারো অনুকম্পা চাইনি কখনও। নিজের কৃতিত্বের জোরে আমি যা চেয়েছি তা নিজেই অর্জন করেছি। কেউ আমাকে কিছু দেয় নি। তবু ছোট করার একটা হীন চক্রান্ত আমাকে নিয়ে হচ্ছে। কে আমার শত্রু তার মুখোশটা খুলে ধরতেই পাঞ্চালে গিয়েছিলাম। পাঞ্চালে না এলে আমার গভীর ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুদের চেনা হতো না। বিশ্বাস কর একজন মহিলাকে দিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত আমাকে অপমান করল। এই লজ্জা অপমানের গ্লানি আমি ভুলতে পারছি কৈ?

পদ্মার চোখে জল এল। একটা মানুষ ভেতরে যে কাঁদছে, তা যদি মায়ের মতো, সে সত্যিই কাঁদার আগে নাই বুঝতে পারল তা-হলে কেমন সহধর্মিণী সে? বাইরের কান্না চোখে দেখা যায়, কিন্তু কর্ণের এ কান্না নয়। এ যে বুকের ভেতর রক্তক্ষরণ। এই বোবা কান্না বুকে করে যে দিবরাত্র কাজ করে হাসে গল্প করে, কর্তব্য করে তার জন্যে কারো কোনো দরদ সহানুভূতি নেই। কর্ণের জন্যে পদ্মার ভীষণ কষ্ট হলো। দমবন্ধ ঐ ভারী পাথরের ভার থেকে তার মনকে মুক্ত করতে সে তার আদুল গায়ে আঙুল

বুলিয়ে দিতে দিতে বলল : স্বামী, এই লজ্জা, অপমান তো তোমার নয়। পাঞ্চালীর। যারা তাকে দিয়ে একাজ করেছে, অপরাধ তাদেরই। এতে পাঞ্চালীরও গৌরব বাড়েনি কেবল ষড়যন্ত্রটাই প্রকাশ পেয়েছে। সে নিজেই তার শিকার হয়েছে। ঈশ্বর তার শাস্তি তাকে দিয়েছেন। মেয়েমানুষের জীবনে একাধিক পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করা, তাদের মনোরঞ্জন করা, দেহদান করার মতো বড় সাংঘাতিক শাস্তি আর কিছু নেই। নিজের শরীরের মধ্যে নব নব আনন্দ রচনা করে পঞ্চপতির প্রেম ও মনকে ধরে রাখার যে প্রাণান্তকর চেষ্টা তাকে করতে হয়, তা যে কোনো নারীর জীবনে বড় লজ্জার অপমানের এবং যন্ত্রণার। পুরুষ হয়ে তুমি কেমন করে বুঝবে সে কথা? অতি বড় শত্রুকেও কোনো রমণী এত বড় অভিশাপ দেয় না।

গভীর এক ভালো লাগার চমকে স্তব্ধ হয়ে রইল কর্ণ। ফুলের গন্ধের মতন পদ্মার মনের গন্ধও ছড়িয়ে গেল মনের অভ্যন্তরে। স্বস্তি ও সুখের তৃপ্তিতে ভরে গেল তার অন্তর। হতভম্ব চোখে সে পদ্মার মুখের দিকে কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল : আমি কিন্তু এসব কিছু ভাবিনি। রমণীর মন নিয়ে তুমি তার যে যন্ত্রণা ব্যাখ্যা করলে তা তো একটা সংস্কার আর অভ্যাসের ব্যাপার। ও নিয়ে কোনো চিত্তসংকট হয় না। এটা পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাবুঝি আর মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপার। মুনি-কন্যা ব্রাহ্মী তো দশজন স্বামীকে নিয়ে ঘর করেছে একসাথে। গৌতমী, জটিলা এরাও সাতজন ঋষিকে স্বামীরূপে বরণ করেছে। কাজেই তুমি যাকে শাস্তি বলে মনে করছ সেটা আদৌ কোনো অশান্তিকর কিছু নয়। সংস্কার আর প্রথা ভাঙার ব্যাপার।

পদ্মা বিস্মিত হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : তোমার মনের মধ্যে এমন কিছু জিনিস শেকড় গেড়ে বসেছে, যে তা সহজে ওপড়ানো যাবে না। মনের অতলে নিঃশব্দে শেকড় ছড়িয়ে যাচ্ছে স্বয়ম্বর সভার ঐ অপমান আর দ্রৌপদীকে না পাওয়ার বিড়ম্বনা। আমার কোনো কথারই তা হলে মূল্য নেই। একটা বিরাট বিশ্বাসের অপচয় হলো।

কর্ণ রাগ করল না। আকস্মিক এক দুর্বলতাবশে পদ্মাকে একটু কাছে টেনে নিল। চিবুকটা মুখের সামনে তুলে ধরে বলল : রাজনৈতিক চক্রান্তকে রাজনৈতিক ভাবে মীমাংসা করতে হয়। না হলে, ঐ সমস্যার কোনো নিষ্পত্তি হয় না। ও সব জটিলতার মধ্যে তোমার না থাকাই ভালো।

কী লাভ ও সব চিন্তা করে? জীবনটা একটা খেলা হিসাবে নাও তাহলে দেখবে আর কোনো বিরোধ নেই নিজের সাথে। সব তখন সহজ হয়ে যাবে। মনে শান্তি পাবে।

কর্ণ সামান্য একটু হাসল। একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বলল : ভুলে যাওয়া কি এত সহজ ব্যাপার? বিরোধের মূল উন্মূল না হওয়া পর্যন্ত বিরোধ থেকেই যায়। কুন্তী, পাঞ্চালী অর্জুন যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন তাদের শত্রুতা আমার মনে থাকবে।

এত রাগ, বিদ্বেষ ঘৃণা নিয়ে সারা জীবন কি পথ চলা যায়?

এসব ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা থাকে যাদের, ভগবান বোধহয় তার ভার বহনের এক ধরনের যোগ্যতা তাদের দেন। নইলে, এত মনের জোর কোথা থেকে আসে? জ্ঞান হওয়া থেকে নিজের প্রতিষ্ঠা আর মর্যাদার জন্যে লড়ছি নিজের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে, আমার অদৃষ্টের সঙ্গে। এ লড়াই বোধহয় মৃত্যুর আগে থামবে না। তুমি শুতে যাও পদ্মা। আমার চলার পথে আমি একা নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী। আমাকে নিয়ে তুমি ভেব না। তাতে তোমার কষ্টই বাড়বে। মাঝে মাঝে আমার যখন ভীষণ কষ্ট হবে; ভীষণ শূন্য লাগবে তখন তুমি একটু কাছে এসে বসো। তোমার প্রেমে স্নিগ্ধ করো। যখন মনটা পাগল পাগল লাগবে তখন তোমার কোলে একটু মাথা রেখে কাঁদতে দিও—তা-হলেই হবে।

পদ্মাবতী কর্ণের হাতখানা শক্ত করে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে বলল : না গো না! এ তোমার মনের কথা নয়। তোমার বুকের মধ্যে যে ঝড় বইছে এ তারই অস্থিরতা।

তুমি ঠিক বলেছ পদ্মাবতী।

তুমি তো এত অশান্ত ছিলে না কোনোদিন ? তোমাকে দেখলে আমার ভীষণ ভয় করে। মনে হয় এরকম একটা জ্বালাধরা অপমানের মধ্যে থাকলে তুমি পাগল হয়ে যাবে। দর্পণে নিজের চেহারাখানা দেখেছ কখনও ? তোমার সে পৌরুষের দীপ্তি কোথায় ? পুরুষের সত্যিকারের সৌন্দর্য এটা নয়। পৌরুষ এমন বস্তু যার সামনে নারী পুরুষ নির্বেশেষে মাথা নোয়ায়। তোমার দীপ্ত পৌরুষের উজ্জ্বল দ্যুতি আজ ক্ষ্যাপামিতে গ্রাস করেছে। আমি তোমার এ রূপ দেখতে চাই না।

কর্ণ মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। পদ্মার খুব কাছে বসে তার কাঁধে থুতনি রেখে মুখের দিকে অপলক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। এমন অদ্ভুত কথা পদ্মার মুখে আগে কোনোদিন শোনেনি। তার শরীর মন, অনুভূতি সব অন্যরকম হয়ে গেল। হৃৎস্পন্দন একটু দামামার মতো বেজে গেল তার। ভেতরটা তাতেই কঠিন হলো। দানা বেঁধে উঠল প্রতিরোধ। নিজের মনেই বলল : এত সহজে হার মেনে নিতে বলছ তুমি ? এ ভাবে আমার হেরে যাওয়া কিংবা সরে যাওয়া তুমি সইতে পারবে ? আমার পরাজয় দেখলে তোমার কষ্ট হবে না তো ? আমার প্রশ্নের কিন্তু তুমি জবাব দিতে পারলে না, পদ্মা ! এর মানে তুমিও চাও না আমি হেরে যাই। তুমি ভালো করেই জান দ্রৌপদীর অপমান, অর্জুনের অবমাননা, ভীমের ঘৃণা, ভীষ্ম-দ্রোণাচার্যের বিদ্রূপ তিরস্কার নিষ্ঠুর ভর্ৎসনার রন্ধ্রপথ ধরে বিরূপতা বিদ্রোহ, আমাব অন্তরে নানাবিধ অনুভূতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়াশীল। এই সবের তাপে মনটা আমার পুড়ছে। তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহায় সত্যিই এলোমেলো হয়ে গেছে আমার অন্তরটা। নিজের কব্জায় সমস্ত ব্যাপারটা এনে কেমন করে তার শোধ নিতে পারি তার কথা ভেবে ভেবে আমি স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্র থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি। পদ্মা আমার এ বুকে একটা প্রতিশোধের আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয়েছে। ঐ গলিত লাভা যতক্ষণ আমার সকল অপমান লাঞ্ছনার প্রতিশোধের রূপ ধরে বেরিয়ে না আসছে ততক্ষণ আমি শান্ত হব না। দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমোতে পারব

না। আমার ভেতরটা যত অস্থির হবে ততই ওদের রাতের ঘুম নষ্ট হবে। দুঃখ করো না পদ্মা। কাঠকে তো পুড়তে হয়। দাউদাউ করে জ্বলাটাই কাঠের পোড়ার আনন্দ। আমার সুখও এই অহরহ জ্বালায়।

৮

জঙ্গলের মধ্যে চড়াই-উতরাইভরা পাহাড়ী রাস্তা ভেঙে কর্ণের রথ শন শন করে বাতাস কেটে হস্তিনাপুরে শান্তিগৃহের দিকে ছুটল। দুর্যোধনের নব-নির্মিত শান্তিগৃহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে যোগ দিতে দেশ দেশন্তর থেকে বহু অতিথি বন্ধু, আত্মীয় এবং রাজন্যবর্গ এল। কর্ণ তাদের মতোই আমন্ত্রিত এক অতিথিবিশেষ। দুর্যোধনের পরম বন্ধু।

রথে সময়টা ফুরফুর করে কোথা দিয়ে কেটে গেল কর্ণ টের পেল না। কিন্তু সর্বক্ষণ কেমন একটা উদাস অন্যমস্কতায় আচ্ছন্ন ছিল। কর্ণ তীক্ষ্ণ চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে নানাবিধ পথ চলতি দৃশ্য দেখছিল। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ মনোনিবেশ করে থাকতে পারছিল না। নিজের অজান্তে সে অন্য এক চিন্তায় সমাহিত হয়ে গেল। নিজের মনেই প্রশ্ন করছিল আর নিজেই তার উত্তর দিচ্ছিল।

দুর্যোধনের নবনির্মিত শান্তিগৃহে সত্যি কোনো শান্তি লুকোনো আছে কি? —অপমানের বীজ থেকে যে গৃহের উদ্ভব সে গৃহ কখনও শান্তির হয়! শান্তিগৃহ কি তবে অশান্তির গৃহ হয়ে উঠবে?— ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে যে অপমান করেছিল শান্তিগৃহে দুর্যোধন তার শোধ নেবে। এর মানে শান্তিগৃহে শান্তি যদি কোথায় থাকে সে আছে দুর্যোধনের একার অন্তরে। শুধু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে দুর্যোধন বহু অর্থব্যয় করে ইন্দ্রপ্রস্থের মতো এক রমণীয় শান্তিগৃহ নির্মাণ করল। বৃহৎ বৈষ্ণব যজ্ঞের আয়োজন করল। যজ্ঞটা ছিল পাণ্ডবদের আকর্ষণের একটা উপলক্ষ্য শুধু।

রথে চুপ করে একা বসে থাকতে থাকতে এই ভাবনাটাই তাকে পেয়ে বসল। বর্তমান থেকে অতীত এবং অতীত থেকে বর্তমানের মধ্যে তার চিন্তা

যাওয়া আসা করছিল।

ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবেরা দুর্যোধন এবং তার ভাইদের যেভাবে অপদস্থ এবং অপমান করেছিল একজন আত্মীয় আর এক আত্মীয়কে তা করে না। শুধু কি তাই? অতিথির সঙ্গে শিষ্টাচারের সৌজন্যটুকু পর্যন্ত তারা করল না। তাদের উপহাসাস্পদ করে এক নির্মল কৌতুক উপভোগ করল। শত্রুর মতোই তাকে অপমান লাঞ্ছনা করল যুধিষ্ঠির। শান্তিগৃহে এবং বৈষ্ণবযজ্ঞ সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের এক পাল্টা ব্যবস্থা। বিষ্ণুভক্ত পাণ্ডবদের কাছে বৈষ্ণবযজ্ঞের আকর্ষণ ত্যাগ করা ছিল কঠিন। অন্ততঃ ভক্তিবশে তারা ভালো-মন্দ, লাভক্ষতির বিবেচনা করবে না। মাতুল শকুনির এই হিসাব ছিল নির্ভুল।

শত্রুকে নিজের অস্ত্রে পরাজিত করার কৌশলটি যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকেই শিখল দুর্যোধন। আত্মীয় শত্রু হলেও সে শত্রু। তার সাথে শত্রুর মতো আচরণ করাটাই নিয়ম। কোনো অবস্থাতেই শত্রুকে বুঝতে দিতে নেই দুর্বলতার কোনো রন্ধ্রপথ ধরে তাকে অকেজো করে দেওয়াই হলো শ্রেষ্ঠ কুটনীতি। যুধিষ্ঠিরের নিজস্ব দুর্বলতার ফাঁদে জব্দ করার কৌশলরূপে তাকে শান্তিগৃহে দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করা হলো। যুধিষ্ঠির লোভী। প্রবল তার রাজ্যক্ষুধা, ক্ষমতালোভ, এবং সিংহাসন আসক্তি। পণ রেখে দ্যূতক্রীড়া করে কৌরবদের রাজ্য, ঐশ্বর্য, সম্পদ সব জিতে নেওয়ার প্রলোভন যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ত্যাগ করা খুব শক্ত। তা ছাড়া পণ রেখে দ্যূতক্রীড়া করা ক্ষত্রিয় সমাজে গৌরবের ব্যাপার। শুধু তাই নয়, সে নিজেও একজন দক্ষ অক্ষক্রীড়ক। সুতরাং দুর্যোধনের প্রত্যাশা ব্যর্থ না হওয়াই সম্ভব। গৃহ-প্রবেশের অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে পাশা খেলার এই ব্যবস্থাকে যুধিষ্ঠির কোনোভাবে সন্দেহ করতে পারবে না।

ব্যবস্থাটা কর্ণের খুব মনঃপূত হয়েছিল। এভাবেই আপমানের শোধ নিতে হয়। দুনিয়ার নিয়মই তাই। সংসারে যে মানুষ অন্যের ক্ষতি করবার ক্ষমতা রাখে না, তাকে কেউ ভয় করে না। ক্ষতি করা কিংবা প্রতিশোধ নেওয়ার

ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে তা করে না, ক্ষমা করে তাকে 'মানুষ' বা 'পুরুষ' বলে পাত্তা দেয় না কেউ। প্রতিশোধ নেওয়াটা পৌরুষের কাজ জীবনের ধর্ম।

সখা দুর্যোধন ইচ্ছে এবং সংকল্পকে কর্ণ যথাযথ পৌরুষের কর্ম বলে মনে করল। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের প্রচ্ছন্ন শত্রুতার স্মৃতি কোনো সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। রাজসূয় যজ্ঞের সেই স্মৃতি মস্তিষ্কের কোষে কোষে জড়িয়ে থাকবে যতদিন প্রাণ থাকবে।

রথ ঝড়ের বেগে ধুলো উড়িয়ে ছুটছিল। মুকুটের পাশ থেকে ঝুলে পড়া চুলগুলো বাতাসে উড়ছিল। নিষ্পলক শূন্য দৃষ্টি মেলে কর্ণ চেয়েছিল পথের দিকে। রোদের আল্পনা আর আঁকিবুঁকি ছড়িয়ে আছে সবুজ ঘাসে। শীতের প্রখরতায় বিবর্ণ, বিশীর্ণ, পত্রশূন্য গাছপালা কালবৈশাখীর ঝাপ্টায় আবার সতেজ এবং শ্যামবর্ণ হয়ে উঠেছে।

রথটা হঠাৎ লতানো গাছে আচ্ছন্ন ঝোপের মতো সরু পথ বেয়ে দ্রুত চলতে লাগল। কর্ণ কিন্তু এসব কিছুই দেখছিল না। দু'পাশের দৃশ্য শন-শন করে দুরন্ত গতিতে তার চোখের ওপর দিয়ে খুব দ্রুত সামনে থেকে পেছন দিকে সরে সরে যাচ্ছিল। আর সে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো চুপ করে বসেছিল। ভেতরকার একটা চিন্তা সবেগে তাকে অতীতের দিকে টেনে নিয়ে গেল। মানুষের সব ভাবনা বর্তমানকে নিয়ে। অতীতের কথা বিস্মৃত হওয়া ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করাই মানুষের স্বভাব। তবু কর্ণ বহুদিন আগের একটা দৃশ্য দেখছিল। কেন দেখছিল, কে জানে? হয়ত বা এই চিন্তাসূত্রে সে বর্তমানে পৌঁছতে চাইছিল। কিন্তু তার চাওয়াটা যে কি সঠিক জানে না সে। মাথায় কুয়াশার মতো কী যেন জমে আছে। বুদ্ধি খেলতে চায় না। তাই একা একা নিজের মনে ভাবে।

ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসূয়যজ্ঞে বহু দেশ-বিদেশের রাজা ও রাজ্যের বিবিধ উপ-ঢৌকন ও উপহার গ্রহণে ব্যস্ত দুর্যোধনকে দেখছিল। মুখে তার অমায়িক হাসি, চোখে প্রসন্ন কৌতুক। পরম আত্মীয় বলে যুধিষ্ঠির তাকে উপঢৌকনাদি

গ্রহণের ভার দিয়েছিল। যুধিষ্ঠিরের প্রতিনিধি হয়ে দুর্যোধনও নিষ্ঠার সাথে যথার্থ আত্মীয়ের মতোই দায়িত্ব পালন করছিল। বিভিন্ন নরপতি, বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বণিক রাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে যে-সব আশ্চর্য সম্পদ ও দ্রব্যসামগ্রী অর্পণ করছিল তা হঠাৎ তার মনটাকে খারাপ করে দিলো। তার ভাবভঙ্গিতে আর সেই স্বাভাবিক ভাবটি থাকল না। তার মুখে চোখে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত অশান্ত অস্থির ভাব ফুটল।

দুর্যোধনের আকস্মিক ভাবান্তর কর্ণকে একটুও অবাক করল না। বরং এর-কম কিছু হবে সে পূর্বেই অনুমান করেছিল। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের তদারকি এবং দায়িত্ব পেয়ে সে যেরকম গৌরবান্বিতবোধ করল তাতে কর্ণের সব হিসাব গোলমাল হয়ে গেল। কতবার মনে হয়েছিল, দুর্যোধনকে এই দায়িত্ব দিয়ে যুধিষ্ঠির কিছু একটা করতে চাইছে কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সেকথা বলা যায় নি দুর্যোধনকে। পাছে দুর্যোধনের প্রত্যাশায় আঘাত লাগে, তাদের ভাইয়ে ভাইয়ে দূরত্ব বেড়ে যায়, তাদের সম্পর্কের উন্নতিতে বাধা ঘটে দুর্যোধন ভুল বোঝে তাই দুর্যোধনকে সাবধান করা থেকে দূরে থাকল। আসলে আত্মীয়তার ভান করে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে অপ্রস্তুত এবং অপদস্থ করতে চেয়েছিল। খুব কৌশলেই তার পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ, ঐশ্বর্য-লোভী মনটাকে উস্‌কে দিয়ে ক্ষুব্ধ এবং অপমানিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই যুধিষ্ঠির তাকে উপহার সামগ্রী গ্রহণের ভার অর্পণ করেছিল। শত্রুকে তার নিজের অস্ত্রে পরাজিত করার এই কৌশলটি কৃষ্ণের কাছে যুধিষ্ঠিরের শেখা। দুর্যোধনের ওপর তার শেখা বিদ্যে প্রয়োগ করে যুধিষ্ঠির সফল হলো। উদ্দেশ্যকে বুঝতে না দিয়ে দুর্যোধনের মনের অভ্যন্তরে খুব সংগোপনে ঈর্ষা-বিদ্বেষের বিষ ঢেলে দিয়ে তাকে অপ্রকৃতিস্থ এবং অশান্ত করে তুললো। দুর্যোধনের সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করে বুঝিয়ে দিলো শত্রু কোনোদিন আত্মীয় হয় না। শত্রুই থাকে।

রক্তপাত হলো না, যুদ্ধ হলো না তবু এক বিরাট পরাজয় আর অপমান নিয়ে দুর্যোধন হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করল। তার সেই মলিন বিষণ্ণ মুখ-

খানা কর্ণের দু'চোখের তারায় বিঁধে রইল। মানুষ গভীর ভাবে অপমানিত হলে তার ভেতরকার তাপে সে শুকিয়ে যায়, তাম্রাভ্র হয়ে ওঠে। মুখখানা আগুনের মতো গনগন করে। দুর্যোধনের মুখে চোখে সেই রকম একটা ভাব। চোখ দুটোয় পাগলের চোখের মতো অস্বভাবিকতা। স্নায়ুর অভ্যন্তরে যে যন্ত্রণা বিষের মতো ক্রীয়াশীল ছিল, তার গভীর প্রতিক্রিয়া কর্ণ তার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে টের পেল। একদিন পাঞ্চালীর প্রত্যাখ্যানের অপমানে তার ভেতরটা এরকম একটা প্রবল আত্মাধিকার আর তিক্ত আত্মগ্লানিতে খাঁ-খাঁ করছিল। সব কেমন শূন্য আর অর্থহীন মনে হয়েছিল। সেই বিদ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ এখনও বুকের মধ্যে তার জমা হয়ে আছে। পুরোনো কথা মনে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরটা উথাল-পাথাল করে উঠল। চোখ মুখ কান জ্বালা করতে লাগল।

পাঞ্চালীর প্রত্যাখ্যানের অপমান, তার রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা তাকে আজও ছেয়ে আছে। অথচ কতদিন হয়ে গেল। সাংসারিক কাজকর্ম রাজনৈতিক কোলাহলের মধ্যে জীবনস্রোত বয়ে যাচ্ছে তবু একটু পলিমাটির আস্তরণ পড়ে নি তার ওপর। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ভেতরে ভেতরে ঘূণপোকার মতো প্রতিশোধকীট তাকে ক্ষয় করে চলেছে। প্রতিহিংসার বোধহয় ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই। সাধু-সন্ন্যাসী হলেও তার ভেতরে এই বিষ থাকে। জাগতিক পরিচয়ে নয়, ভিন্ন এক অস্তিত্বে, অন্য এক অনুভবে। এই অনুভূতির মধ্যে এমন কিছু লুকোনো ছিল যা হঠাৎ তাকে উত্তেজিত করল এবং ভুলতে দিলো না। শরীরের কোষে কোষে অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট প্রতিশোধস্পৃহা শিহরিত হলো বারংবার।

কর্ণ চিত্রার্পিতের মতো চুপ করে বসেছিল রথে। মনে হলো, চারদিকের এক নিবিড় রূপের রাজ্যে ডুবে আছে যেন তার সত্তা কিন্তু কোনো কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নেই। আসলে কর্ণের ভেতরটা এতো অস্থির এবং এলোমেলো যে কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পারছিল না। একটানা অশ্বক্ষুরধ্বনি আর চাকার ঘর্ঘর শব্দ একটা বিপদ সংকেতের মতো বাজতে লাগল তার বুকে।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনির ধাক্কায় কর্ণের ঘোরলাগা আচ্ছন্নভাবটা কেটে গেল। সরল চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে শান্ত সুন্দর জায়গাটির চারদিক চেয়ে কোথায় এসেছে, কতদূরে এসেছে দেখতে লাগল। একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিমর্ষ গলায় সারথীকে বলল : আর কতদূর আছে সারথী ?
কর্ণের সাড়া পেয়ে সারথী বেশ একটু স্বস্তি অনুভব করল। বলল : শান্তি-গৃহের চূড়া দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাব।
গৃহের শিখরের ওপর দুর্যোধনের মুষল অঙ্কিত সুবর্ণরঙের পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল। পতাকার রঙ কর্ণের সব দৃষ্টি কেড়ে নিল। এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল তার মনটা। এই আনন্দের উৎস কোথায় কর্ণ জানে না। তবে ফুলের গন্ধের মতন একটা স্মৃতিভরা দিন তার মর্মে লেগে রইল। তার মনে হলো পৃথিবীর আর কোন্ পুরুষ একজনকে তার এই শান্তি-গৃহে চায়। কিংবা নারী নয়, মাত্র যে রমণী তাকে অপমান করে কোনো সুযোগ না দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অর্জুনের হাত ধরে চলে গেল তাকেই দরকার। তার প্রতি যার এত উপেক্ষা এত উদাসীনতা এবং অবহেলা তাকে সামনা-সামনি বলতে ইচ্ছে করছিল তোমার বীর্যশুল্কার শর্ত মানি না, তুমি জেনেশুনে প্রতারণা করেছ, শান্তিগৃহে নতুন করে তোমার স্বয়ম্বর হোক এবারের শর্ত মুখোমুখি যুদ্ধ। দেখব, কাকে মালা দাও তুমি ?
রথটা একবার মৃদু দুলে উঠে থামল। আচ্ছন্ন ভাবটা দূর হতেই দেখল এক স্বপ্নের পুরীর মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে। এক জোড়া বিস্মিত চোখ মেলে সে তার অপরূপ সৌন্দর্য এবং সাজ-সজ্জা দেখতে লাগল তখন দুর্যোধন শকুনি এল তার ঠিক সামনে। কর্ণ বেশ একটা খুশি খুশি ভাব নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল : করেছ কি ? ইন্দ্রপ্রস্থও হার মেনে গেছে। যুধিষ্ঠিরকে এইভাবে একটা মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া তোমার উচিত কাজ হলো কি ? বেচারা !
দুর্যোধন কর্ণের বিদ্রূপ অনুধাবন করতে না পেরে যেন বেশ একটু অবাক হয়েই বলল : সখা, তোমার মুখে এ কোন্ কথা শুনলাম ? তুমি সুখী

হওনি ?

কর্ণ দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গী করে হাসল। তার হাসিতে এমন কিছু ছিল যা শকুনিকে চমকে দিলো। বলল : ভাগ্নে সারাপথ বোধহয় ভাবতে ভাবতে এসেছ। তোমার চেহারায় ক্ষ্যাপামির একটা ছাপ বড় চোখে লাগছে।

দুর্যোধন বলল : তুমি ঠিক বলেছ মাতুল। আমার জন্যে সখার খুব চিন্তা।

কর্ণ হাসল। বলল : আসলে তোমার নিজের ভেতরটাই ওলোট-পালোট হয়ে আছে তাই আমাকেও তুমি ঐ চোখে দেখছ।

শকুনি একটু অন্যরকমভাবে চেয়েছিল তার দিকে। বলল : আমার চোখ কখনও ভুল করে না। তোমার ভেতরে যে প্রতিশোধস্পৃহা আগ্নেয়গিরির মতো টগবগ করে ফুটছে আমি আঁচ করতে পারছি।

কর্ণ গম্ভীর গলায় বলল :

মাতুল ব্যক্তিগতভাবে কে কেমন আছি, তা জানার বা জানবার সময় এখন নয়। এর জন্যে আলাদা জায়গা আছে। বাতাসেরও কান আছে। তুমি আমি টেরও পাব না। উদগ্রীব প্রতীক্ষা নিয়ে আমি চঞ্চল দিনগুলো অশান্তভাবে কাটচ্ছি। কত কি ভাবছি। এইভাবে দিন কাটানো বড় কষ্টের।

শকুনি কর্ণকে সাবধান করার জন্যে ফিসফিস করে বলল : কী ভাগ্নে তোমার গলার স্বরে, চোখের দৃষ্টিতে ক্ষ্যাপামি বড় প্রকট। কিছু করার সংকল্প তোমার চোখে মুখে প্রকাশ পাচ্ছে। পেশীতে পেশীতে তোমার দৃঢ় কঠিন অস্থিরতা সেও দৃষ্টি এড়ানোর নয়। মনের ইচ্ছেটা এভাবে বাইরে প্রকাশ পাওয়া ঠিক নয়। তুমি নিজেকে একটু স্বাভাবিক করতে চেষ্টা কর। অন্য কথাবার্তা বল। এখনও পঞ্চ-পাণ্ডবেরা এসে পৌছয়নি।

কর্ণ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিয়ে বলল : তারা আসবে তো ?

শকুনি বলল : যুধিষ্ঠির পাশা খেলার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবে না। তার মতো লোভী মানুষ, অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আসছে। অদৃষ্ট মন্দ হলে তোমার সখাকে রাজ্য ছেড়ে বনবাসে যেতে হবে।

একথা বলছ কেন ? এত ভয়ঙ্কর কথা।
সময়ে সব জানতে পারবে। বাতাসেরও কান আছে! এখন ঘরে বসে বিশ্রাম নাও।

শান্তিগৃহ থেকে ফেরার পর একদিনও পদ্মা কর্ণের সঙ্গে দেখা করেনি কাছেও আসেনি। এমন নয় যে তাকে দেখলে কথা বলতে হবে কিংবা মুখোমুখি হলে খুব লজ্জায় পড়বে তাও নয়। তবু সে আসে না। এক পালঙ্কে তার সাথে শোয় না, তার কক্ষে ঢোকে না, এমন কি মুখদর্শন পর্যন্ত করে না। অথচ পদ্মা একদিন কর্ণকে দেখতে না পেলে হাঁফিয়ে উঠত। মুখোমুখি বসে দুটো কথা বলার জন্যে কী অধীর প্রতীক্ষায় তার কাটত। সেই পদ্মার এই আকস্মিক এবং বিপুল পরিবর্তন কর্ণকে একটুও অবাক করল না। তার কারণ, গৃহবধূ দ্রৌপদীর ওপর অপমানের প্রতিশোধ নিতে সে যে একজন শয়তানের সমতলে নেমে এসে তাকে নির্যাতন এবং অপমান করতে পারে, পদ্মা ভুলেও কল্পনা করে না। যাকে মহামানব বলে পূজা করে, দানশীলতায় যে প্রবাদ বাক্য তার ভেতর এমন একটা অমানুষকে বাস করতে দেখে ভয়ে লজ্জায় ঘৃণায় তার কাছ থেকে সরে গেছে। এটা পদ্মার অপরাধ নয়। বরং তার দোষে পদ্মা কষ্ট পাচ্ছে। এই কষ্টটা তার দেওয়া। সেই কথা মনে হলে কর্ণের বুকটা হু-হু করে ওঠে। মনটা খারাপ হয়ে যায়। কিছু ভালো লাগে না।
পদ্মাকে ক'দিন চোখের দেখা দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা যে কতখানি কর্ণ সমস্ত প্রাণমন দিয়ে তা অনুভব করল। তার অতি স্পর্শকাতর মনটি পদ্মার একটু সান্নিধ্য লাভের জন্যে ভেতরে ভেতরে তাকে ভীষণ অস্থির করল। মন খারাপ হলে মনের মন কী করবে তা না জানলে বোধহয় এরকম ঝড় ওঠে। পাগল পাগল লাগে। মনের সেই হাহাকার সকলকে তো বুঝিয়ে বলার নয়। বলাও যায় না। প্রত্যেক মানুষকে তার ভার একা বয়ে বেড়াতে হয়। একা থাকাটা বড় কষ্টের, বড় যন্ত্রণার। মনের সেই নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে পৃথিবীর

আর কোনো বন্ধু, আত্মীয়, সুহৃৎ নয় পদ্মাবতীকেই কর্ণের মনে পড়ে। কারণ বোধহয় সে তার স্ত্রী। কেবল তার কাছেই কোনো লজ্জা নেই তার। সব স্ত্রী-ই স্বামীর দোষ ত্রুটি, অপরাধকে ঢেকে সব কিছুর মধ্যে মানিয়ে নিয়ে চলে। এটাই স্ত্রীদের মহৎ গুণ। অথবা, তারা কেউ নিরাপদ নয় বলেই বাধ্য হয়, স্বামীর ওপর নির্ভর করতে। কিন্তু বিরূপ মনের ঘৃণা মনের অতলে ঠিক থেকে যায়। বিশ্বাস ভেঙে গেলে প্রেম থাকে না, প্রেম মরে যায়। একসঙ্গে থাকতে থাকতে যেটুকু মায়া-মমতা জন্মায় সেটুকুই তখন স্বামীদের ভাগ্যে জোটে। অভ্যাসের বশেই স্বামীরা তাকেই স্ত্রীর প্রেম, ভালবাসা বলে ভাবে। কিন্তু এর ভেতর আছে এক ধরনের এক ঘেয়েমি। বেঁচে থাকার এক ক্লান্তিকর অধ্যায়। কর্ণের বারংবার মনে হতে লাগল, জীবনের অনেক কিছুই সে হারিয়ে বসেছে। মনের সেই নির্ভয় সাহস তার কোথায় গেল ? মাথা উঁচু করে পদ্মার সামনে দাঁড়াতে তার এত ভয় কিসের ? সত্যিকারের ভালবাসার কোনো ভয় নেই। তবু এই ভয় কেন ? কর্ণ নিজেকে প্রশ্ন করল : এর উৎস কোথায় ? আসলে, নিজের মনের কাছেই সে অপরাধী। ভয়টা তার সেই মনের অপরাধের। আর সেই ভয় যে সর্বনেশে। নির্দোষ প্রমাণ করা বড় শক্ত। বোঝানো আরো কষ্টকর।

কদিন ধরে কর্ণ মনের সাথে লড়াই করল অনেক কথাই ভাবল কিন্তু কিছুই সুরাহা করতে পারল না। সমাধানে পৌঁছতে পারল না। পদ্মার সামনে কোন্ কৈফিয়ৎ নিয়ে সে দাঁড়াবে দ্রৌপদীকে অপমান লাঞ্ছনা করার কি জবাব দেবে ? যে কারণে পদ্মার এত রাগ, অভিমান, ঘৃণা, বিদ্রোহ প্রত্যয় ভঙ্গ মনোবেদনা তার কি কৈফিয়ৎ দেবে কর্ণ ? তার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কি বোঝাবে তাকে ? একটা প্রচণ্ড সংকট ও সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে যেন থমকে গেল। সাহস করে পদ্মার ঘরে যাওয়া কিছুতে হয়ে উঠল না।

মানুষের জীবনে কত আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। দ্রৌপদীকে কর্ণ হারাতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, নিজে কিছু না হারিয়ে, এবং হেরে না গেলে

দ্রৌপদীকে হারানো সহজ হবে। কিন্তু সে হারানোটা যে তার নিজের জীবনের এক বড় পরাজয় আর আত্মগ্লানির কারণ হবে এই হিসাবটা করেনি।

পাশা খেলায় দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্যেই তার ও পদ্মার সম্পর্কের মধ্যে একটা দেওয়াল তৈরী হলো। এরকম কিছু হবে জানত না সে। জানলেও বোধহয়, কিছু করার শক্তি ছিল না তার। জীবনের দাবির চেয়ে মনের সংকল্পটা তার কাছে বড় হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীর প্রত্যাখ্যানের অপমানের জ্বালাটা তাকে একটা দিনও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। একজন মহিলা বিনা দোষে তার দীপ্ত পৌরুষকে সম্মান না করে বিদ্রূপ করল, কুল বংশ পরিচয় নিয়ে সন্দেহ এবং দুর্বাক্য বলল—এই অপমানটা কোনো পুরুষই সারা জীবন মেনে নেয় না। তা হলে কর্ণের দোষটা কোথায় হলো? স্বয়ম্বর সভায় বহুলোকের সামনে দ্রৌপদী তার দীপ্ত পৌরুষকে যেভাবে অপমান করল আর এক সভাস্থলে বহুলোকের সামনে কর্ণ তার সমান প্রতিশোধ নিল। পুরুষের পৌরুষের যেমন সম্ভ্রম-হানি করেছে দ্রৌপদী নারীর ইজ্জতের তেমনি মর্যাদাহানি করেছে সে। দুয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। ইজ্জত ও মর্যাদার লড়াইটা শোধ-বোধ করে নেবার অপরাধ তার ও দ্রৌপদীর সমান। মর্যাদার লড়াইয়েত নারী পুরুষের ভেদ থাকবে কেন? মহিলা বলেই তার অপরাধকে লঘু করে দেখার কোনো মানে নেই। দ্রৌপদী এখানে কোনো নারী নয়, মর্যাদার প্রতীক। মর্যাদা দেওয়া-নেওয়া নিয়েই তার সঙ্গে বিরোধ। অপমানের প্রতি-শোধ, অপমান করেই নিয়েছে। অপমানের রূপ ধরে দ্রৌপদী যেন তার জীবন পর্বে এসেছে। সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করা কিংবা অপমান করার মধ্যে এত নিষ্ঠুরতা ছিল যে স্বয়ম্বর সভার ব্যক্তিরা পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। এভাবে অপমান করার জন্যে দ্রৌপদীর কোনো অনুশোচনা ছিল না। কর্ণের সুরুচি ও সূক্ষ্ম অনুভূতিময় জীবনে দ্রৌপদী এক অভিশাপ। দুর্দৈবের মতো এসে তার চরিত্রকে মসী লেপন করে গেল।

অনেকক্ষণ ভূতের মতন বসে রইল মন্দিরের সিঁড়িতে। প্রদীপের আলো ছিল না এদিকটা! অন্ধকার তাই এদিকটা বেশী গাঢ় ছিল। কিছুই ভালো লাগছিল না তার। কেমন বিভ্রান্ত লাগছিল। কিছুই তেমন ভালো করে ভাবতে পারছিল না। মাথাটা অস্থির এবং এলোমেলো। একাকীত্ব প্রস্তরী-ভূত অন্ধকারে গভীর বিষাদ ও দুঃখে থমকে আছে।

পদ্মা মন্দিরে একা সন্ধ্যারতি করতে ঢোকার পর এদিকটায় কর্ণ চুপ করে বসেছিল তার সঙ্গে কথা বলবে বলে। এখান থেকে আলোকিত মন্দিরের অভ্যন্তরে অনেকটাই দেখা যাচ্ছিল। পদ্মা কি করছে আর করছে না কর্ণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। প্রদীপ জ্বালিয়ে পদ্মা আরতি করছে আর তার দু'গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা বইছে। পদ্মা মুছল না। উজ্জ্বল বিগ্রহকে যেন অশ্রু তর্পণ করছিল। কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকির মতো একটা শব্দ করছিল। প্রদীপের উজ্জল আলোয় উদ্ভাসিত অসামান্য মুখশ্রীতে যে কষ্টের ছাপ এবং বিশ্বাস ভঙ্গের যন্ত্রণায় ভয়াবহতা ফুটে উঠেছিল তার দিকে চেয়ে কর্ণের ভেতরটা টনটন করতে লাগল।

প্রদীপটা নামিয়ে রেখে বিগ্রহের দিকে চিত্রার্পিতের মতো অপলক চেয়ে রইল পদ্মা। তাতেই কান্নাটা আরো বেশি উপচে উঠল। কান্নাটা গিলতে গিয়ে বিষম খেল। খুব কাশল। ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে গেল। তারপর কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে চোখের জল মুছল। থম ধরে আসনে কিছুক্ষণ বসে রইল। বিগ্রহের দিকে দীন নয়নে চেয়ে বলল: বিধাতা তুমি একি করলে? আমার সামান্য চাওয়াটুকুও তুমি কেড়ে নিলে কেন, কি দোষ করেছি আমি? অপাপবিদ্ধ, দুর্মর সাহসী বিশ্বজয়ী সেই মানুষের মধ্যে এ কোন নরদানব ভর করল? আমি ঐ দস্যু নিয়ে কী করব? বলতে বলতে তার দুচোখ ভরে জল নামল। আগে তো কখনও এরকম ছিল না। নারীদের যে সব-চেয়ে শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে তাদের একজনের ওপর এমন বিরূপ, নির্দয় হলো কেন? আমি তো নারী। স্বামীর এই নারী নিগ্রহের অপরাধ ক্ষমা করতে পারছি না। সারা অন্তর দিয়ে ঘেন্না করেছি। ভাবতে লজ্জা করছে

আমার স্বামী এক নরাধম পশুর সমতলে নেমে এসেছে। এই মানুষটার সাথে আমি সারাজীবন বাস করব কেমন করে? ক'দিন ধরে তো এই প্রশ্নই শুধু করেছি, কেন এই লোকটিকে ছাড়া আমার বেঁচে থাকার কোনো অর্থ খুঁজে পাই না অথচ ওর ভেতরের সদগুণগুলিই নষ্ট হয়ে গেছে। ও আর মানুষ নেই। তবু কেন এই মানুষটিকে কিছুতেই আমি অস্বীকার করতে পারছি না। ওই দস্যু অমানুষ অপ্রকৃতিস্থ লোকটা কোন্ যাদুবলে আমাকে দখল করে আছ যে আমি ভুলতে পারছি না? ভগবান ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও! আমাকে মুক্তি দাও। ভুলতে দাও।

কর্ণ স্তম্ভিত। নিশি পাওয়া মানুষের মতো কেমন আচ্ছন্ন হয়ে সে গুটি গুটি পায়ে আলোকিত মন্দির গৃহের অভ্যন্তরে এসে দাঁড়াল। নিজেও সে জাগল না. কেন এল? কখন এল?

পদ্মা বিগ্রহের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। দু'হাতে পাথরের বেদী আঁকড়ে ধরে পাগলের মতো কাঁদতে লাগল। মাথা ঠুকে বলতে লাগল : বলো, বলো, আমি কি করছি?

কর্ণ পদ্মার পেছনে দাঁড়িয়েছিল। সে কান্নায় বাধা দিলো না। কিংবা তাকে ধরল না। পদ্মাই চমকে তাকিয়েছিল তার দিকে। আর তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। ঝড়ের বেগে মন্দির থেকে বেরিয়ে নাটমঞ্চের দিকে ছুটে গেল।

কর্ণের হৃদয় মথিত হলো। বড় অপমান লাগল। চোখ মুখ কান অসহ্য জ্বালা করতে লাগল। তথাপি রাগল না সে। ভেতরকার সব যন্ত্রণার শব্দকে আটকে রেখে নিরুদ্ধ গলায় ডাকল : দাঁড়াও। অমন করে চলে যেতে দেয় না।

পদ্মা থমকে দাঁড়াল। একটা থাম আঁকড়ে ধরে সে-ই হাঁফাতে লাগল। বলল : তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই আর। তোমার মুখ দর্শন করাও পাপ।

পদ্মা!

এক দারুণ মুগ্ধ বিস্ময়ে চমকে উঠল পদ্মা। এই ডাকটা শোনবার জন্যে তার

ভেতরটা ব্যাকুল হয়েছিল। কর্ণের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা তার ভেতরের সব জমানো রাগ অভিমানকে হঠাৎ করে গলিয়ে দিলো। তবু মনটাকে শক্ত করে রাখল। দাঁতে দাঁত দিয়ে সে ভেতরের আবেগটাকে চেপে রাখল। যাতে বাইরে একটুও উপচে না পড়ে। তারপর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল : পদ্মা মরে গেছে। রক্তমাংসের এই দেহটাই শুধু পদ্মার বেঁচে আছে। পদ্মার প্রেমের সাগর শুকিয়ে গেছে। এবুকে আর একফোঁটা প্রেম নেই। প্রেম গেলে মানুষের আর কিছু থাকে না। স্ত্রীর পরিচয়টুকু ছাড়া তোমার সাথে আমার আর কোনো সম্পর্কই নেই।

পদ্মা তুমি আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা কর। নইলে আমার ভীষণ লাগবে। নিজেকে ছোট লাগবে ভীষণ, বঞ্চিত লাগবে। নিজের সম্মানে, আত্ম-মর্যাদাতেও প্রচণ্ড লাগবে।

আমি তোমার বড় বড় কথা বুঝি না। একজন মানুষ জীবনে যা পায় এবং হারায় তার কৃতিত্ব এবং দায়িত্ব তার নিজের। কতকগুলো সাজানো কথা দিয়ে তাকে ঢাকা যায় না। দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনা করার প্ররোচনা তোমার। কর্ণের দিকে এক ঝলক তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে বলল : এই কাজটা কি খুব ভালো হলো? তোমার শিক্ষা, রুচির কি দাম রইল? পৌরুষের গৌরব কতটুকু রক্ষা পেল? নিজের বিবেকের কাছেই বা কি কৈফিয়ৎ দেবে? একজন অশিক্ষিত অমানুষের সাথে তোমার পার্থক্যটা কোথায়? নিজেকে তুমি যত খুশি ছোট করতে পার, কিন্তু একজন রমণীকে সর্বসমক্ষে বেইজ্জত কর কোন্ অধিকারে? দ্রৌপদীর দোষ কি? যারা তাকে দিয়ে তোমাকে অপমান করল, সব দোষও তাদের। সেই অপরাধের শাস্তি তো তার পাওয়ার কথা নয়। তবু নিরীহ, নিবীর্য এক অসহায় রমণীকে বিবস্ত্রা করার বর্বর নিষ্ঠুর কৌতুক করতে তোমার মর্যাদাবোধে, শিক্ষায়, রুচিতে একটু বাধল না। তুমি কি মানুষ? স্বামীর পৌরুষ, বল, সাহস, বীর্যাবর্তা, নিয়ে আমার গর্ব করার মতো আর কিছু থাকল না। এত শূন্যতা নিয়ে, অগৌরব নিয়ে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয়? কী আছে স্বামী-স্ত্রীর

এই সম্পর্কের মধ্যে। লোকভয় আর অভ্যাসের দাসত্ব করে বেঁচে থাকার অপমান ভোগ করার চেয়ে একা একা জীবন কাটানো ভালো। অবহেলা, বিতৃষ্ণা, ঘৃণা, বিরূপতা নিয়ে পরস্পরে একসাথে থাকার কোনো মানে হয় না। (স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক তো শুধু দেহের নয় ; মনের, প্রেমের, শ্রদ্ধার, বিশ্বাসের মর্যাদার।) মনই যদি মিলল না মনের সঙ্গে, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে, রুচির সঙ্গে, সেখানে শুধু সম্পর্কের জোরে পদ্মাও থাকবে না।

কর্ণ মাথা হেঁট করে শুনল। পদ্মার কথায় তার মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল। গলার কাছে অনুতাপ, অনুশোচনা যেন দলা পাকিয়ে উঠল। তার স্বাদ বড় তেতো। বিস্বাদ মন নিয়ে বলল : পদ্মা তোমার তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অভিযোগ সব আমার প্রাপ্য। দ্রৌপদীর অপমানটাকে ভুলতে না পারার দোষ আমার। তার প্রত্যাখ্যানের অপমান আর সাফল্য থেকে বঞ্চিত করার কষ্টটা আমাকে পাগল করেছিল। নিজেকে এমন করে এর আগে হারিয়ে ফেলতে দেখেছ কখনও ? মানুষের সমস্ত ব্যক্তিত্বটা যে এমন কাঁচ দিয়ে তৈরী। আগে জানতাম না। অথচ নিজের সামান্য অসতর্কেও সে ভাঙে। তখন আফশোষ করেও ফল হয় না।

পদ্মা একটু চুপ করে থেকে বলল : তুমি সব বোঝ না, বোঝ না কোথায়, কোন্ সময় থামতে হয়। প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ মানুষকে কিছুই দেয় না। শুধু ছোট করে। অনর্থ বাধায়। তবু মানুষ প্রতিশোধ চায়, প্রতিশোধ নেয়। প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছাতে ভয় নেই, ভয় প্রতিশোধ গ্রহণের নিষ্ঠুরতাকে, তার ভয়ংকর উন্মত্ততাকে।

কর্ণের গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল : পদ্মা, তুমিও হয় তো সব বোঝ না। প্রতিশোধ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। প্রতিশোধের ইচ্ছা আর তাকে পূরণ করার উন্মত্ততা সব সময় কি স্পষ্ট করে আলাদা করা যায় ? সাধু সন্ন্যাসীরা কি পারেন ?

এটাই তো একটা মস্ত সর্বনেশে ব্যাপার। একবার মনের ভেতর ওই পাপ

ঢুকলে আর রেহাই নেই।

আমি ভগবান নই। রক্ত মাংসের মানুষ একজন।

আমি কিন্তু প্রতিহিংসা, প্রতিশোধের খারাপ দিকের কথাটা বলছি।

এটা বলার কিছু নয়। এটা মনের ব্যাপার। শুধু মনই জানে কোথায় এর যন্ত্রণা, আর কোথায় এর ভালবাসা। প্রতিশোধ গ্রহণের পরের দিনগুলো কী দুঃসহ অবসাদে, বিষাদে, অশান্তিতে যে কাটে তুমি কোনোদিনই মন দিয়ে জানতে পারবে না। তুমি কি ভেবেছ, দ্রৌপদীকে অসম্মান করে আমি খুব সুখে আছি, আমার ভেতরটাও অনুশোচনায় পুড়ে যাচ্ছে। এতখানি বিবেকহীন, নিষ্ঠুর না হলেও চলত। কিন্তু ভেতরে বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে বৃশ্চিক যেমন নিজের মস্তক দংশন করে বিষ উগরে দিয়ে নিজেকে হত্যা করে তেমনি আমিও আমার বিবেক, মনুষ্যত্ব এবং ধর্মকে হত্যা করেছি। কিন্তু আমার সেই মনের মৃত্যুটা দেখার লোক নেই, অনুভব করার মতো মানুষ নেই। এটাই আমার দুর্ভাগ্য। সবই আমার কপালের দোষ। আমার কপালটাই এরকম। আর কেউ না জানতে পারে, কিন্তু তুমি তো সব জান, কপালের কাছে যত হেরেছি, বঞ্চিত হয়েছি, ততই একটা দুরন্ত জেদ আমার মধ্যে সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে শপথ করেছি, কপালের কাছে হেরে যাব না। তোমাকেও বলেছি, অদৃষ্ট আমাকে কিছুই দেয়নি। কিন্তু আমি জিতবই, দেখো। দেখব, কী করে হারায় আমাকে অদৃষ্ট।

পদ্মা কথা বলছিল না। কর্ণের মুখের দিকে তাকিয়েও ছিল না। এক দৃষ্টিতে কর্ণের বুকের দিকে চেয়ে তার বুকের ওঠা-নামা দেখছিল। কারণ, পদ্মা বুঝতে পারছিল কর্ণ তার চোখের ওপর চোখ রেখে অপলক চেয়ে আছে। কর্ণের কথাগুলো তার বুকের মধ্যে মথিত হতে লাগল। শুনতে যেমন অবাক লাগছিল, তেমনি একরকমের ভালোও লাগছিল তার। দাম্পত্য সম্পর্কটা বোধহয় এরকমই হয়। স্বামী, স্ত্রী যতদিন একে অন্যের ওপর মান-অভিমান, রাগ-বিরাগ করে ততদিন পর্যন্ত সম্পর্কটা মধুর

থাকে। একে অন্যের সঙ্গে যখন ঝগড়া করে তখন ঝগড়াটাকে সম্পর্কহীনতা বলে ভ্রম হয়। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তার বেশি করে বোধ হতে লাগল, এই ঝগড়া, বিরাগ, অভিমানের মধ্যে সত্যিকারের প্রেম ঘুমিয়ে থাকে। যেদিন এসব থাকবে না, সেদিন প্রেম, ভালবাসা, দাম্পত্য সম্পর্কও বোধহয় থাকবে না। এরকম একটা সুন্দর এবং আশ্চর্য অনুভূতি আগে কোনোদিন তার হয় নি। তাই কেমন এক অভিভূত আচ্ছন্নতায় পদ্মা স্থির হয়ে রইল।

কর্ণ বলতে বলতে থেমে গেল। অবাক মুগ্ধতা ও বিস্ময় নিয়ে পদ্মার মুখের দিকে অপলক চেয়েছিল। পদ্মা কথা বলছিল না। কেবল কাপড় নিয়ে আঙুলে জড়াচ্ছিল আর খুলছিল। তার ভেতরেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। ঠোঁট কাঁপছিল।

বাইরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল। জোনাক পোকার বিন্দু বিন্দু আলো অন্ধকারের মধ্যে স্পন্দিত হতে লাগল। মন্দিরের বিগ্রহ যেন তাদের দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছে। নির্মেঘ আকাশ থেকে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র শান্ত, স্নিগ্ধ চাহনি মেলে নিরীক্ষণ করছে তাদের। মাথার ওপর একপাল মশার শনশন, শব্দ যেন সানাইয়ের মতো সকরুণ সুরে একটানা বাজছিল। এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল এক তীব্র অনুশোচনা। যে অক্ষেপ তার একার। নাভি থেকে টেনে খুব জোর শ্বাস নিল কর্ণ। নিঃশ্বাস ফেলতেই বুকের মধ্যে হঠাৎ এক শূন্যতা, এবং হাহাকার তাকে অস্থির করল। মনে হলো, যা কিছু তার একার তার কিছু কিছুর সঙ্গে পদ্মারও একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। কারণ পদ্মা তার জীবনের কেন্দ্র বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। তাই কেমন একটা আক্ষেপ তার গলার কাছে দলা পাকিয়ে রইল। ভেতরটা অস্থির হচ্ছিল। ক্লান্তি লাগছিল।

কর্ণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কৈফিয়তের সুরে বলল : মাঝে মাঝে অবাক লাগে, কত কী সব ঘটছে আমার জীবনে। একের পর এক ঘটছে, অথচ এর মাথামুণ্ডু নেই কিছুরই। আমি যা কখনো ভাবিনি, যা মনে প্রাণে

কোনোদিন চাইনি, সেই সবই হচ্ছে। তাই নিজের ওপর আক্রমণ ঠেকাতে, নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। হেরে যাওয়ার ভয়ে আমি ভুগছি। এটা কি আমার দোষ ?

পদ্মা চুপ করে রইল। কর্ণ তাকে নিরুত্তর দেখে বলল : জানার জগৎটা এমন করে বদলে যায় বোধহয়। হয়ত এমন না হলে মানুষের অভিজ্ঞতা জ্ঞান, শিক্ষা, জানা একটা নিশ্চল বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকত। তোমার পুরনো কথাটা মনে পড়ল। আমার প্রতি তোমার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জানাতে কতবার বলেছ পদ্মা—নিজেকে জানা আমার কোনোদিন ফুরোবে না, সেই জানার সঙ্গে তোমাকে চেনাও। এখন আমারও মনে হচ্ছে, এর চেয়ে গভীর জীবনদর্শনের কথা হয় না।

কথাটা পদ্মার মনকে ছুঁয়ে গেল। ভীষণভাবে তার চিন্তা-ভাবনাকে নাড়া দিলো। কর্ণের সব কথার মধ্যে এমন এক যাদু আছে যে কানে এলেই যেন খুশিতে ভরে দেয় পদ্মার মন। কে জানে, কী আছে তার গলার স্বরে ! কেন এত গভীরভাবে ভালো লেগে যায়, বুকে বিঁধে যায় কথাগুলো, পদ্মা ভেবে পায় না। মনের ভেতরটা যখন গলে গলে পড়ে তখন আর কোনো নিয়ম, সংযম, শপথের দৃঢ়তা, কঠোরতা মানতে চায় না মন। পদ্মারও অবস্থা হলো তাই। সে আর থাকতে পারছিল না। তবু ভেতরে একটা কঠিন প্রতিরোধ তাকে নিষ্ঠুর করল। কিন্তু তীব্র ভালো লাগার তাপে গলে যেতে লাগল নিষ্ঠুরতার হিমবাহ। বলল : প্রতিশোধ নেওয়াটা দোষের কিছু নয়। কণ্ঠস্বরে কেমন একটা অদ্ভুত সহানুভূতি বুকের সব কিছুকে গলিয়ে দিলো। ভেজা গলায় কিন্তু যে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়, অন্যের সম্ভ্রমকে একেবারে নোংরা করে ফেলে তখন সেটাই হয় দুঃখের। কিন্তু প্রতিশোধকারীর মনের অভ্যন্তরে যাই ঘটুক না কেন, নৈতিক কিংবা সামাজিক ক্ষমা থেকে তখন বঞ্চিত হয় সে। আত্মসমালোচনা কিংবা আত্মনির্যাতনের কোনো দাম নেই সংসারে। ওটা নির্বোধ ভালমানুষের নিজের শাস্তি। তোমার মানসিক কষ্টটা বোধহয় সেই

রকমই। ওর কানাকড়ি মূল্য নেই। সমাজের চোখে তুমি যা হারালে অনুতাপে ক্লিষ্ট হয়ে তার পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদলেও হারানো মর্যাদা আর ফিরে পাবে না। প্রতিশোধ উন্মাদ হলেই এমন ঘটনা ঘটে। তোমার দুর্ভাগ্যের জন্যে সত্যি আমারও দুঃখ হয়। করুণা হয়।

কর্ণ কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। তার দু'চোখে এক গভীর বিষন্নতা নেমে এসেছিল। চমকেও উঠেছিল যেন একটু। পদ্মার মতো এমন গভীর করে ভাবেনি সে। এখন ভাবতে গেলে মনের মধ্যে ঝড় ওঠে। আর ঝড় উঠলেই বুকের ভেতরটা উথাল পাথাল করে। বড় অসহায় লাগে তখন। এক তীব্র হতাশায় চেয়ে থাকে পদ্মার মুখের দিকে। বিমর্ষ গলায় বলল : তোমার এই মানুষের সমাজ আমাকে কোনোদিন স্বীকার করেনি। মানুষ বলে গণ্য করেনি। আমার ঋজু, আড়ালহীন, সোজাসুজি মানসিকতায় তারা ধাক্কা খায়। তাই আমাকে তারা সহ্য করতে পারেনি কোনোদিন। তোমার মানুষের সমাজ আমার চোখে কুচক্রী, ক্ষুদ্রমনস্ক, স্বার্থসবস্ব এক-দল মানুষের জোট। আমাকে তারা এঁটে উঠতে পারে না বলেই ছলে বলে আমাকে অপমান করে, হারিয়ে দেয়, বঞ্চিত করে। যূথবদ্ধ একমাত্র যাদের জোর তাদের কাছে আমার কি থাকল, আর কি হারাল তার হিসাব করি না। আমার ভালত্ব, সারল্য, ঔদার্য, সততা যাদের কাছে আশা করাই যায় না, তারা আমার সব কিছু কেড়ে নিয়ে হজম করে ফেলতে চায়। কিন্তু আমাকে হজম করতে অন্য পাকস্থলীর দরকার। আমি তোমার সমাজের এই সকল মানুষের মতো ভণ্ড মুখোশধারী মানুষ নই। তাদের সাথে আমার এই পার্থক্যের জন্যে দাম দিতে হয়। পদ্মা বিশ্বাস কর, দ্রৌপদীকে কৌরবদের দাসী করে তার অহংকার চূর্ণ করে আমার অপমানের প্রতিশোধ চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনাস্রোতেই বোধহয় তার সম্ভ্রমহানির কারণ হয়েছিল। আমি নিমিত্ত। দ্রৌপদী যখন বয়ঃবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করল তখন তিনি নীরব। দ্রোণ বিদুর কেউ তার কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিলো না। সাহায্য করতে

এগিয়ে এল না। প্রতিবাদ করল না। সবাই বোধহয় চাইছিল দ্রৌপদী লাঞ্ছিত হোক, নিগৃহীত হোক। সভাস্থ লোকের নীরবতা দুঃশাসনকে দুঃসাহসী করল। আশ্চর্য, দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরল কেউ তাকে নিবৃত্ত করল। কোনো ভর্ৎসনাও করল না। একজন দর্শকও প্রতিবাদ করতে উঠে দাঁড়াল না। কেবল বালক বিবর্ণ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছিল কিন্তু তাকে কেউ সমর্থন করল না। সকলেই চেয়েছিল দ্রৌপদীর অনাবৃত দেহ সৌন্দর্য উপভোগ করতে। এটা কি কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, ধর্মপ্রাণ বিদুরের বিবেকহীনতা নয়? অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া কিংবা দ্রৌপদীর সাহায্য প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করা কি তাঁদের অপরাধ নয়? নিষিদ্ধ কৌতূহল যদি পাপ না হয়, তাহলে পাপ, নীতিহীনতা বলবে কাকে? এখন দুঃশাসন, দুর্যোধনকে পাপী বলা, কিংবা কর্ণকে তাদের সহযোগী বলে চিৎকার করলে তাদের পাপ, অন্যায়, অধর্ম, নীতিহীনতা, বিবেকহীনতা কি তাতে ঢাকা পড়বে? যে চুপ করে অন্যায় মেনে নেয়, প্রশ্রয় দেয়, প্রতিবাদ করে সেও সমান পাপী। বলো পদ্মা, আমি ঠিক বলছি তো? তুমি চুপ করে আছ কেন? ওই বয়োবৃদ্ধদের তুলনায় আমার পাপ কতটুকু; তুমি বলো? ওদের মতো ভণ্ড, মুখোশধারী হতে না পারাটাই আমার দোষ এবং ত্রুটি। কিন্তু আমি এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাবছি না। জেদের বশে দ্রৌপদীকে হারাতে গিয়ে আমি হারিয়েছি অনেক। সেই হারানোর ব্যথায়, যন্ত্রণায় মন আমার অনুতাপে অনুশোচনায় পুড়ে যাচ্ছে। আমার মনুষ্যত্ব, বিবেক, ধর্ম, রুচি, শিক্ষা জলাঞ্জলি দিয়েছি। আমার একই ভুলের জন্যেই আজ আত্মগ্লানিতে কষ্ট পাচ্ছি। এই ভুল আমার নিজের মতো হতে পারার এবং নিজের মতো থাকতে পারার দাম। এই দাম দিয়ে পৃথিবী হারালেও আমার কষ্ট হবে না। কিন্তু তোমাকে এই ভুলের অপরাধে যদি হারাই সেই হবে আমার বড় হার। তোমাকে ছাড়া আমি সব হারাতে পারি।

পদ্মার বুকের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। কী সব গলে গলে পড়তে লাগল।

বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা তীব্র ভাললাগার শিহরণ পর্দার বুক চিরে দিয়ে চলে গেল কর্ণের দিকে। তার সমস্ত অপ্রাপ্তিতে প্রাপ্তির সুখে, আনন্দে ও গর্বে ভরিয়ে তুলতে। হঠাৎ, সে কর্ণের বুকের ওপর মাথা রাখল। তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরল। বুকের ওপর মুখ ঘষল। চোখ ভরে জল নামল। শব্দ করে কাঁদল। কান্নাটা তার হাহাকারের মতো শোনাল। বলল : না গো তোমাকে আর আমি হেরে যেতে দেবো না। তুমি আমার বিশ্ববিজয়ী বীর রাধেয়। এক সুন্দর অপাপবিদ্ধ মহাপুরুষ। আমার ভুল আমি বুঝেছি। চাঁদের কলঙ্কই তার গৌরব। দ্রৌপদীর অসম্মান তোমার সম্মান না বাড়ালেও অগৌরবের কালিমায় তোমার চরিত্রকে কালিমা লেপন করবে না। কারণ ধর্মত একার্থক নয়। চোরের ধর্ম, গৃহীর ধর্ম, শত্রুর ধর্ম, মিত্রের ধর্ম কখনও এক হয় না বলেই ধর্মজ্ঞ পিতামহ ভীষ্ম, মহামতি বিদুর অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য ধর্মবোধেই নীরব ছিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও পারেন নি দ্রৌপদীর ধর্ম রক্ষার সদর্থক জবাব দিতে। ধর্ম যে এক বহুরূপী ধারণা তা তোমার কথায় জানলাম।

পদ্মার মুখে ধর্মের এরকম একটা অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনে কর্ণ আশ্চর্য হলো। বিস্ময় তাকে এক দৃপ্ত ঔজ্জ্বল্য দান করল। ধর্মের এমন আশ্চর্য বিশ্লেষণ এক অন্তঃপুরচারিণী নারীর মুখে শুনবে ভাবেনি। পদ্মার মনে ঘন কালো মেঘ সরে গিয়ে নির্মল নীল আকাশ এক ঝলক রোদের উজ্জ্বলতায় ঝক ঝক করতে লাগল। ভীষণ ভালো লাগল কর্ণের। এই প্রথম মনে হলো তাকে না পেয়ে পদ্মার মধ্যেও এক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। চাতকের মতো বুকে দুরন্ত তৃষ্ণা নিয়ে ফটিক জলের প্রতীক্ষা করছিল। শূন্যতা পূরণ হলেই তবেই মনের ব্যাপ্তি হৃদয়ের গভীরতা টের পাওয়া যায়। ধর্ম সম্পর্কে পদ্মার অভিনব বিশ্লেষণ তার কাছে নিজের দাম বাড়াতে এক গভীর সুখবোধ হয়ত। কয়েকদিন আগেও যে তার মুখ দর্শন করতে ঘৃণা করত যার সান্নিধ্য ছিল বিষবৎ হঠাৎ-ই সে কেন এত বদলে যায়? মানুষের মনের অয়নপথ বড় বিচিত্র। মন একবার তার নিজের জায়গা থেকে সরে এলে

পুরনো পথে আর ফেরে না। হয়ত হারানোর ভয়েই ফেরে কম জনই। নর নারীর সম্পর্ক কোনো লিপ্ততা নয়, কোনো বিলাসও নয়, এই সম্পর্ক বিধাতার সৃষ্টি। পূর্ণতার প্রয়োজনে পরস্পরকে কাছে চায়। মনের শূন্য কলসের দানই হয়তো তাদের এই পূর্ণতা দিতে ঠেলে দিলে তাদের মিলিত করল। এমন ভরন্ত উচ্ছল অভিজ্ঞতা নিয়ে বাঁচার যে কী আনন্দ এবং সুখ পদ্মার আমন্ত্রণই দুই চোখের দিকে চেয়ে প্রথম অনুভব করল। পূর্ণতা কর্ণকে এমন এক নির্লিপ্ততা দান করল যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো কথা বলতে পারল না।

পদ্মার দুই চোখে বিভোর বিহ্বলতা। মুখে হাসি হাসি ভাব। কর্ণের চোখে চোখ রেখে বলল : অমন করে কী দেখছ ?

কর্ণ একটু চমকে গিয়েছিল। কয়েকবার পলক পড়ল চোখের। মুখে অপ্রস্তুত হাসি। বলল : তোমাকে দেখছি। মুহূর্তে মানুষ কত বদলে যায়। তুমিও বদলে গেলে আমাকে খুশি করার জন্যে। ভালবাসার প্রয়োজনে আমাকে ভুল বুঝো না। আমার মধ্যে একটা ক্ষ্যাপা বাস করে। তাকে পুরোপুরি আমারও জানা হয়নি। হবেও না কোনোদিন। নিজের ভেতর নিজেকে পুরোপুরি জানার এই খোঁজ যেদিন থামিয়ে দেবো, সেদিন বেঁচে থেকেও মরে যাব। আমার এই ক্ষ্যাপামি নিয়ে আমাকে বাঁচতে দাও লক্ষ্মীটি।

এমন করে বলছ কেন ?

আমার সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি পদ্মা। বলতে পার সবে শুরু। এর শেষ কোথায় জানিনা। অপমানের বদলা যদি অপমান হয় তাহলে এই শোধ-বোধের ব্যাপারটা এক জীবনে মিটবে না।

তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না।

সোজা অঙ্ক। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ এখনও বাকী। মধ্যম পাণ্ডব শপথ করেছে দুঃশাসন যে হাতে দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরেছে সেই হাত দুটো তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। বুকের রুধির পান করে তার হৃদয়জ্বালা জুড়োবে। এই ভয়ংকর প্রতিজ্ঞার মধ্যে এক মহাযুদ্ধের সম্ভাবনার বীজ

লুকনো আছে। এযুদ্ধ বাঁধবেই। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ছাড়া এই মহাযুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাই বোধহয়, বিধাতাই তাকে লাঞ্ছিত করল। পৃথিবীর সব বড় বড় মহাযুদ্ধের পেছনে আছে এক নারী। তাই আমি এতে খুশি হয়েছি। কেন জান? তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার বড় সাধ কিন্তু আবাল্য সে সাধ পূরণ হলো না আমার। কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধ বাঁধলে তার সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ করার সাধ এবং আকাংক্ষা আমার পূরণ হবে। তার দর্প চূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই বলতে পার এটাই হলো আমার সারা জীবনের ব্রত, পুজো এবং বিদ্রোহ।

পদ্মা কর্ণের লোমশ বুকের ওপর মুখ ডুবিয়ে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইল। কর্ণ হঠাৎই পদ্মাকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে টেনে নিয়ে আদর করল, কপালে চোখে, চিবুকে মুখ ঘষল, গলায় ঠোঁটে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল। আর পদ্মা কাতুকুতু লাগার মতো ছটফট করতে লাগল ওর তু'বাহুর মধ্যে, আর খিল খিল করে হাসতে লাগল।

পদ্মাকে কর্ণ যাই বলুক একটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা দ্বেষহীন, ঈর্ষাহীন অনুভূতি ভেতরে ভেতরে তাকে ভীষণ যন্ত্রণা দেয়। প্রতিকারহীন এক যন্ত্রণা তুর্বল করে দেয় তাকে! কিন্তু তাকে বাধা দেবার কোনো ইচ্ছা হয় না তার। বোধহয় কোনো মানুষই নিজের মনকে ভালো করে জানে না। জানার ঔৎসুক্যই তাকে মনের সব অজানা পথ অতিক্রম করে নিয়ে যেতে চায়। মানুষের কৌতূহলের প্রকৃতি অন্তত তাই বলে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক একজনের সঙ্গে এক এক রকম সম্পর্ক। প্রত্যেক সম্পর্কটাই আলাদা। কোনোটার সাথে কোনোটাকে মেলানো যায় না। অভ্যাস এবং সংস্কার তাকে পৃথক করে দেয়। প্রতিটি সত্তাই ভিন্ন। আসলে মানুষ অনেকগুলো টুকরো টুকরো সত্তার সমষ্টি। তাই একটা না একটা যন্ত্রণায় নিরন্তর তাকে কষ্ট পেতে হয়। মন খারাপ হলে, মনের মন কী করবে তা না জানলে মনের মধ্যে ঝড় ওঠে। বাইরে থেকে তা চোখে দেখা

যায় না, কিন্তু ভেতরটা বড় এলোমেলো হয়ে যায়।

কর্ণ নিজে কি জানত যে, দ্রৌপদীকে হারাতে গিয়ে তার ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের কাছেই হেরে যাবে! এই মর্মান্তিক পরাজয়টা তার মনের অভ্যন্তরে ঘটে গেল নিঃশব্দে। দ্যূতক্রীড়ায় সর্বশ্রান্ত হয়ে যুধিষ্ঠির পঞ্চভ্রাতা সহ পাঞ্চালীকে নিয়ে যেদিন ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করে সত্যিই বারো বৎসর বনবাস আর একবৎসর অজ্ঞাতবাসের জন্যে চলে গেল সেদিন এক গভীর তীব্র ভাললাগার সঙ্গে এক গভীর দুঃখ মিশে ছিল কর্ণের অনুভূতিতে। সারা রাত ঘুমুতে পারেনি সে। একটা তীব্র যন্ত্রণায় তার ভেতরটা ছটফট করেছে। মনের বলে এক অশান্ত ঝড়ের সূচনা সেই থেকে।

কর্ণের নিজেরই আশ্চর্য লাগল, রাধা নয়, কুন্তী নয়, পদ্মা নয়, অর্জুনও নয় দ্রৌপদীই এখন তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। এটাই এখন একমাত্র সরল সত্য। কর্ণের এক নতুন উপলব্ধি। পঞ্চপাণ্ডব প্রিয়া দ্রৌপদী তার স্বপ্নের রাণী; প্রিয়তম প্রেমিকা। মনের মধ্যে হঠাৎ-ই এক সুখের দপদপানি অনুভব করল। বুকের মধ্যে সুখের মতো ব্যথা বাজে এক ধরনের। কর্ণের বুকটা যেন ভেঙে যেতে লাগল। মনে মনে নিরুচ্চারে বলল: দ্রৌপদী তুমি আমার দুঃখ আমার সুখ আনন্দ, তুমি আমার মর্যাদা গৌরব। আমার জীবন-মরণ আমার অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব সব।

মনের কোণে এই দুর্বোধ্য দুর্বলতা কর্ণকে আশ্চর্য করে দিলো। চিরদিন যাকে ঘৃণা করল, যার অমঙ্গল কামনা করল, অপমান করল, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে উন্মাদ হলো সে বুকের মধ্যে বসে প্রেমের দাবিদার হয়ে উঠল কেমন করে? দ্রৌপদীর কি এরকম কোনো অনুভূতি হয়? তার জন্যে এমন মন খারাপ হয় কি?

জানালার কাছে গিয়ে জানলাটা খুলে দিলো কর্ণ। কনকনে শীত আর কুয়াশা মাখানো চাঁদের আলো হাত ধরাধরি করে ঢুকল ঘরে। রাতজাগায় কোন্ পাখি এক বুক বিরহ নিয়ে ডাকছে তার সঙ্গিনীকে। এই ডাকটায় মানুষের বুকও হাহাকার করে ওঠে। বুকের মধ্যে নরম সব অনুভূতিগুলো

শিমূল তুলোর মতো আকাশময় অবলম্বনহীন হয়ে উড়ে উড়ে বেড়ায়। মনটা তখন ভীষণ খারাপ লাগে।

বনবাসের জীবন বড় কষ্টের। দ্রৌপদীকে শুধু শুধু কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। এই দুর্ভোগের জন্যে সে নিজেই দায়ী। তার ইন্ধন না পেলে দ্রৌপদীকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির পাশা খেলত না। দ্রৌপদীর কথা ভাবলে সত্যিই মনটা খারাপ হয় তার। কিন্তু ভাগ্য যদি মানে, তা-হলে এটা দ্রৌপদীর ললাট লিখন। কারণ, পঞ্চপাণ্ডবের অন্য ভাইয়েরা কেউ তাদের সঙ্গী হলো না, কেবল দ্রৌপদী তাদের সাথী হলো। এই দুর্ভাগ্যের হেতু সে। গভীর ভালবাসায় সিঞ্চিত এক জ্বালাধরা অনুভূতি নিয়ে সে গেল পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসের জীবনের সব দুঃখ শূন্যতা এবং ব্যথাকে নিঃশেষে শুষে দিয়ে তাদের ভেতর প্রতিশোধের অঙ্গারকে গনগনে করে রাখতে।

স্তব্ধ হয়ে কর্ণ চেয়ে আছে প্রকৃতির দিকে। চাঁদের আলো পড়েছে তার মুখের ওপর। কপালের দুই পাশের চুলের ওপর লেগেছে রূপালী আলোর আভাস। কর্ণের উদাস উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি যেন বন পাহাড় ভেদ করে বাইরে চন্দ্রালোকিত পৃথিবীর দিকে প্রসারিত হয়ে গাছ-গাছালি ছাড়িয়ে কাম্যক বনের দিকে চলে গিয়েছে। কল্পনায় কর্ণ দ্রৌপদীকে দেখছিল। দ্রৌপদীর জন্যে মন এত উতলা হয় কেন? এর নাম কি প্রেম?

একা থাকলে কত অদ্ভূত অদ্ভুত কথা মনে যাওয়াআসা করে। সত্যিকারের যে প্রেমিক সে তার মানসীকে চিরদিনই মনে রাখতে চায়। সুগন্ধি কল্পনায় তার সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু মানসীরা কোনোদিনই রক্তমাংসের মানবী হয়ে ওঠে না। তারা চিরদিন কল্পনার মধ্যে ঘুমোয়। স্বপ্নে জেগে থাকে। কর্ণ চিরদিনই তার স্বপ্ন দেখবে। চাঁদের আলোয় রাতভর তার কথা ভাববে। তার সাথে কথা বলবে। কেবল তারারা চেয়েচেয়ে দেখবে।

দ্বৈতবনে দ্রৌপদী কেমন করে দিন কাটাচ্ছে? কীরকম সুখে আছে দেখার জন্যে মনটা ক'দিন ধরে তার ভীষণ অস্থির হলো কিন্তু সে ব্যাকুলতার কথা কাউকে বলতে পারে না। মনের সেই উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠার কথাটা বুঝিয়ে

বলার মানুষ নেই। বললেও কেউ বুঝবে না তাকে। অথচ, ভীষণ ইচ্ছে করছিল ব্যর্থ জীবনের সব অভিমান নিয়ে দ্বৈতবনে দৌড়ে গিয়ে তাকে দেখে আসে।

কর্ণ সত্যিই থাকতে পারল না। মনের ভেতর একটা অশান্ত অস্থিরতা নিয়ে তুর্যোধনকে বলল: সখা, পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে কেমন করে দিন কাটাচ্ছে, পাঞ্চালী তাদের নিয়ে কতখানি সুখী—এসব দেখতে খুব কৌতূহল হয়। রাজসুখের পর বনবাসের তুঃখ কষ্টের দিনগুলো নিয়ে তাদের সঙ্গে একটু কৌতুক করে এলে কেমন হয়?

তুঃশাসন তৎক্ষণাৎ বেশ একটু উল্লসিত হয়ে বলল: উত্তম প্রস্তাব। শত্রুর ওপর নজর রাখার জন্যে মাঝে মাঝে এরকম কিছু করলে ভালোই হবে।

তুর্যোধন মাথা নেড়ে বলল: এ এমন কি কঠিন কাজ? হৈ-চৈ করে সবাই মিলে কয়েকটা দিন না হয় তাদের মধ্যে কাটিয়ে আসব। ইন্দ্রপ্রস্থের সেই ঠাট্টা বিদ্রূপ এখনও ভুলিনি আমি।

স্তব্ধ হয়েছিল শকুনি। অধরে তার মৃতু হাসির আভাস। তাকে নীরব দেখে কর্ণ ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করল: মাতুল, আপনার নীরবতার অর্থ বুঝি না।

শকুনি কর্ণের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখে কৌতুকের হাসি রহস্যময় হয়ে উঠল। বলল: ভাগ্নের উৎসাহটা কিন্তু একটু অন্যরকম। দ্রৌপদী কিন্তু ঘেন্না করে রাধেয়কে। এক গভীর ঘেন্না। আমার এই কথাটা শুনে খুব খুশী হলে না তো?

কর্ণ একটু লজ্জা পেল। বিব্রতস্বরে বলল: মাতুল আমিও তাকে ভীষণ ঘৃণা করি।

শকুনি মাথা নেড়ে বলল: আমার ভয়টা সেখানে। গরলের মধ্যে যেমন অমৃত মিশে থাকে তেমনি ঘৃণার মধ্যে প্রেম মিশে থাকে। প্রেমের সঙ্গে ঘৃণা। তার মূল স্বাদটা যা একটু ভিন্ন। দ্রৌপদীও তোমাকে অনেক কারণে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। সে তোমাকে পুরোপুরি ঘৃণাও করে না, আবার পুরোপুরি ভালোও বাসে না! তুটো মিশিয়ে একটা অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতি

হয় এ খবর আমি তার গাত্র সংবাহনকারিণীর মুখে পেয়েছি।

কর্ণ কথা বলতে পারল না। তার ভেতরটা বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকাল। এক অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট আশংকা স্পন্দিত হলো। বিস্ময়ে দুই চোখ পেতে রাখল শকুনির চোখের ওপর। অবচেতনের ঘুমিয়ে থাকা সাধটা পাছে শকুনির চোখে ধরা পড়ে তাই বিরক্তি প্রকাশ করে হঠাৎ জিগ্যেস করল : মাতুল, তোমার কৌতুক বড় নির্মম। তুমি কি বিশ্বাস কর যে, দ্রৌপদীর সাথে সত্যি আমার কোনো প্রণয় সম্পর্ক হতে পারে? স্বয়ম্বর সভায় অপমান, পাশা খেলার আসরে তার বস্ত্র হরণের পরেও এই ধরনের কিছু ভাবা সম্ভব? না ভাবা উচিত। পরস্ত্রীকে নিয়ে এই রসিকতা যে শোভন হয় না, তা আপনিও জানেন।

শকুনি কর্ণের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসল।

ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত।

পাণ্ডবদের দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাস নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পরেই তারা বিরাট রাজকন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর খুব ধুমধাম করে বিয়ে দিলো। ঐ বিবাহ সভায় কৌরব পক্ষের কোনো প্রতিনিধিই ছিল না। আত্মীয়তা প্রকাশ্য শত্রুতায় পরিণত হলো।

যুধিষ্ঠির হৃতরাজ্য প্রত্যার্পণের দাবি করলে কৌরব-পাণ্ডবের বিরোধ প্রকাশ্য সংঘর্ষের মুখে থমকে দাঁড়াল। তবু সন্ধির চেষ্টা করল যুধিষ্ঠির। কিন্তু দুর্যোধনের এক কথা, অজ্ঞাতবাস শেষ হওয়ার পূর্বেই পাণ্ডবেরা আত্মপ্রকাশ করেছে। পাণ্ডবদের যুক্তি চান্দ্র মতে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার এগারো দিন পর তাদের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। বর্ষ গণনা, যেহেতু চান্দ্র মতে আর হয় না, সৌর মতে হয় সেইহেতু পাণ্ডবেরা শর্ত ভঙ্গ করেছে। এবং পুনরায় তাদের দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যেতে হবে। এই বিরোধের মীমাংসা হলো না। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের পাঁচখানি গ্রামের দাবিও প্রত্যাখ্যান করল। কপট, ছলনাপ্রিয় পাণ্ডবদের সাথে সে কোনো আপোষে রাজি হলো না। যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির দাবি-অধিকার মীমাংসা করে নিক। এরকম একটা সংকট মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরের একান্ত অনুরোধে পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ সন্ধির শেষ প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে গেল।

কৃষ্ণের আগমনে কর্ণের প্রত্যাশায় আঘাত লাগল। কারণ, কৃষ্ণের মতো কূটনীতিককে কর্ণের বড় ভয়। কৃষ্ণ ইচ্ছা করলেই অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। তার অভিধানে দুরূহ বলে কোনো শব্দ নেই।

অসাধারণ বুদ্ধিবল এবং স্নিগ্ধ বাক্যে সে অত্যন্ত সুচতুর এবং বীর্যবান ব্যক্তিকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। প্রবল অনিচ্ছা মহৎ ইচ্ছায় পরিণত হয়। অসম্ভব কার্যও অনায়াসে ঘটে যায়। দূরকে নিকট করার এক আশ্চর্য শক্তি ও বুদ্ধি তার আছে। কুরুপাণ্ডবের প্রত্যাশিত যুদ্ধ ব্যর্থ হওয়া মানে তাকে নিরাশ করা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটা। তাই কর্ণ মনে প্রাণে চায় না কৃষ্ণের দৌত্য সফল হোক। কৃষ্ণের সাফল্য মানে অর্জুনের সঙ্গে আকৈশোর সংগ্রামের স্বপ্ন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিলাষ ব্যর্থ হওয়া। একটা চিরন্তন বিরোধ অমীমাংসা থাকা। তার ও অর্জুনের মধ্যে কে বড়, কার কৃতিত্ব বেশি এই কূট তর্কের মীমাংসা তা-হলে আর এ জীবনে হবে না। তাই, এক উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠার মধ্যে তার সময় মুহূর্তগুলো কাটতে লাগল। আর এই সময়টুকু সে, প্রতিমুহূর্ত কামনা করতে লাগল—হে বিধাতা কৃষ্ণের দৌত্য ব্যর্থ কর। সারা জীবন ধরে শুধু বঞ্চিত করেছ আমায়। আর বঞ্চিত করো না। একটাই তো সাধ : অর্জুনের সঙ্গে আমরণ যুদ্ধ। এ সাধ পূর্ণ হয় না কেন? আমি তোমার কী করেছি? কোন্ পাপে পূর্ণ হচ্ছে না সাধ? কেউ না চাইলেও আমি যুদ্ধ চাই। কৃষ্ণ ব্যর্থ হলে আমি সবচেয়ে খুশি হব।

কুরুজাঙ্গালের সীমানা পর্যন্ত কৃষ্ণকে পৌঁছে দিয়ে কর্ণ হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করল। হঠাৎ-ই মনটা ভীষণ এলোমেলো হয়ে গেল। কিছুই ভালো লাগল না তার। কোথায় যেন একটা প্রলয় ঘটে গেছে। তার জন্যে একটুও তৈরি ছিল না। নানা কথা তার মনের মধ্যে ঝড় তুলল। পাগল হয়ে যাবার আগে কী মানুষের মনের অবস্থা এরকম হয়? কে জানে।

অশান্ত মন নিয়ে কর্ণ বেপরোয়া রথ চালাতে লাগল। ঝড়ের বেগে ধুলো উড়িয়ে রথ চলল। ধুলো উড়ছিল চাকায় চাকায়। পথের পাশে নিরীহ গাছগুলোর পাতা ভরে গেল ধুলোয়। ঝরা পাতারা হাহাকার করতে করতে রথের পেছনে দৌড়ে গেল হাওয়ার সওয়ার হয়ে। ঘুরে ঘুরে হতাশ হয়ে

মাটিতে পড়ে গেল এক সময়।

হেমন্তের শেষ বিকেলের হলুদ রোদে মাখামাখি হয়ে গেছে চারদিক। হাওয়ায় শৈত্যের ভাব ছিল। চোখে মুখে জড়িয়ে ধরছিল। ভেতরটা একটু শীত শীত করছিল। কিন্তু এসব কিছুই কর্ণকে স্পর্শ করল না। সে ছিল ভীষণ নির্লিপ্ত।

বেলা পড়ে এল দ্রুত। একটু পরেই বিকেল নামবে। তারপর গুটি গুটি করে সন্ধ্যা নামবে কুয়াশার পেছন পেছন। হস্তিনাপুরের পথ এখনও অনেক বাকি। বড় রাস্তা ছেড়ে কর্ণ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত সমতলের দিকে নামতে লাগল। ঐ পথটাই হস্তিনাপুরের দিকে গেছে। রথ যেভাবে চলছিল তাতে যে কোনো মুহূর্তে অশ্বের পদস্খলনের ভয় ছিল। কিন্তু কর্ণ সে সব কিছুই গ্রাহ্য করল না। মনের ভেতর তখন তার উত্তাল ঝড়। সেই ঝড় তাকে শান্ত থাকতে দিলো না। অস্তিত্বের শেকড় ধরে টান দিলো যেন। মাঝে মাঝে জীবনের বনে এমন ঝড় ওঠে। তখন জীবন কাকে কোথায় নিয়ে যায় কে জানে? কর্ণও জানে না ভাগ্য তাকে কোথায় হাত ধরে নিয়ে চলেছে?—সারা জীবন ধরে নিজের সাথে যুদ্ধ করছে। এবারের যুদ্ধ মনের সঙ্গে বিশ্বাসের, সংস্কারের সঙ্গে বাস্তব সত্যের। পরিণাম অজানা?

সাঁ-সাঁ করে রথ বাতাস কাটছিল। নিঃশব্দ কান্নার শব্দের মতো বিষণ্ণ করুণ দীর্ঘশ্বাস আপসোস আর হতাশা হয়ে যেন বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। কর্ণের ভেতরটা সত্যি কুঁই-কুঁই করে কাঁদছিল। সে কান্না বাইরে থেকে কেউ দেখতে পায় না। এ হলো বুকের রক্তক্ষরণ। এই বোবা কান্না বুকে করে যারা কাজ করে, কর্তব্য করে তাদের বড়ই কষ্ট।

এই যন্ত্রণার স্রষ্টা কৃষ্ণ। কৃষ্ণ তার মনের অভ্যন্তরে খুব কৌশলে বিশ্বাস অবিশ্বাসের এক বীজ বপন করল। কিন্তু তা কতখানি সত্যি-মিথ্যে কর্ণের জানা নেই। কিন্তু মনটাকে উত্তেজিত রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। রথে যেতে যেতে কৃষ্ণের কথাগুলো তার বুকের ভেতর তোলপাড় করতে লাগল। ঈশ্বর সত্যিই তাকে শান্তি দেননি। সুখের দিনও বোধহয় তার

শেষ হলো। এখন তাকে অনেক দুঃখ নদী পেরিয়ে, অনেক চড়াই-উতরাই পথ ভেঙে নতুন অচেনা রঙের জীবনের দিকে একা যেতে হবে। চলার পথে এবারও সে একা ; এক নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী। কর্ণের ভীষণ আশ্চর্য লাগল, জীবনের সব প্রাপ্তিকে এক মুহূর্তে এক ভীষণ অপ্রাপ্তিতে এমন করে গড়িয়ে দেয় কী করে? যা কিছু মানুষ দীর্ঘদিনের ভালবাসায়, বিশ্বাসে এবং চেষ্টায় অর্জন করল, যা দিয়ে তার সম্পর্ক গড়ে উঠল, যা কিছু ছিল তার গর্বের, আত্মশ্লাঘার তার সব কিছুই কৃষ্ণের একটা কথায় হঠাৎ-ই মূল্যহীন হয়ে গেল। কানের মধ্যে কৃষ্ণের কথাটাই অহরহ ধ্বনিত হচ্ছিল। কর্ণ, অন্যদের মতো আমি তোমার বাইরেটা তো দেখি না, তোমার আত্মাকে দেখতে চাই। তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি কে তুমি? যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের মতো তুমিও কৌন্তেয়। অর্জুন তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সহোদর। তুমি সর্বাগ্রজ।

এক দারুণ বিস্ময়ে চমকে উঠেছিল কর্ণ। মুহূর্তে মুখের ভাব বদলে গিয়েছিল এক নিষ্ঠুর ভাষাহীন যন্ত্রণায়। নীড়ে ফেরা পাখীর ডানা ঝাপটানোর মতো কি যেন তার বুকের গভীরে ঝটপট করছিল।

কৃষ্ণ এক আশ্চর্য সুন্দর মুগ্ধতা নিয়ে কর্ণকে নিরীক্ষণ করল। কর্ণকে ভীষণ মলিন, বিষণ্ণ এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। দুঃসহ যন্ত্রণায় তার হৃদয় মথিত হচ্ছিল। পিতামাতার স্নেহ বঞ্চিত চির ভাগ্যাহত কর্ণকে দেখে তার হৃদয় করুণায় ভরে উঠল। মুখে ঈষৎ কৌতুক হাসি খেলে গেল। বলল : কর্ণ, তুমি কুন্তীর প্রথম পুত্র। প্রথম যৌবনের অনাঘ্রাত কুসুম। লোকনিন্দা, সমাজ নিন্দার ভয়ে, কুমারীত্বের লজ্জা ঢাকার জন্যে নিরুপায় এক রমণী বাধ্য হয়ে জীবনের মাল্য থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিলো তার সন্তানকে। কাজটা বড় নিষ্ঠুর। কিন্তু এ অন্যায় কার? কুন্তীর, না সমাজের অনুশাসনের? সে প্রশ্ন এখন নিরর্থক। তবু একদিন কুন্তীকে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই অপ্রিয় হৃদয়হীন কাজ করতে হয়েছিল। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে তাকে সারাজীবন অনুতাপ আর অনুশোচনা ভোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু

তার ভেতরের কান্নাটা কে দেখতে পায় বলো ? এখন তোমার ক্ষমা পেলে কুন্তীর বাকী জীবনটা শান্তিতে কাটে।

হঠাৎ-ই কর্ণের ভেতরটা দুরন্ত প্রতিবাদে গর্জে উঠল। বলল : তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না বাসুদেব। আমাকে নিয়ে তোমার এ বানানো গল্প বন্ধ কর।

কর্ণ, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর ?

তুমি প্রতারক, কপট। এই যুদ্ধের এক খলনায়ক।

এ তোমার রাগের কথা।

বাসুদেব, কৌরব-পাণ্ডবের এই যুদ্ধ তুমি চেয়েছ বলেই হচ্ছে। তুমি না চাইলে এ যুদ্ধ হতো না।

তোমার কি হয়েছে বল তো ? আমার ওপর তুমি এত ক্ষেপে গেলে কেন ? তোমার মাতৃপরিচয় জানানো কি আমার অপরাধ হয়েছে ?

বাসুদেব কথা ঢাকার চেষ্টা কর না। দুর্যোধনের আন্তরিক আমন্ত্রণকে তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ, তার সততাকে অবিশ্বাস করেছ, তার আত্মীয়তাকে এবং আত্মমর্যাদাকে নিষ্ঠুর ভাষায় অপমান করেছ। তুমি জেনে শুনেই করেছ। কারণ, তুমিও চাও এ যুদ্ধ হোক।

আমি সত্যি কথাই বলেছি। পাণ্ডবদের দূত হয়ে তাদের কার্য সম্পন্ন করতে এসেছি। দুর্যোধন পাণ্ডবদের মিত্র নয়। তাকে মিত্র ভাবে কেমন করে গ্রহণ করি বলো। শত্রুর সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করা কি অন্যায় ?

ন্যায় অন্যায় বোধ এক একজনের এক একরকম। দুর্যোধনের আন্তরিক চাওয়াকে অপমান করে তুমি যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করেছ একথা অস্বীকার করবে ? দুর্যোধনের গৃহে তুমি অতিথি হও এই সামান্য চাওয়াটা কি খুব অন্যায় হয়েছে ? তোমার সাথে তার বৈবাহিকী সম্পর্ক। সংকট সময়ে একজন আত্মীয়ের গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে তোমার কর্তব্যের হানি হতো না কিন্তু বরং মিত্রতার পরিবেশ তৈরি হতো। সন্ধিও হতে পারত। কিন্তু তুমি সন্ধি প্রস্তাবের আলোচনায় বসার আগে তার পরিবেশটাকে বিষিয়ে

দিলে। আত্মীয়তার সম্পর্ককে তিক্ত করে তুললে যাতে সন্ধি না হয়। পরোক্ষভাবে তুমিই যুদ্ধের ইন্ধন দিয়েছ। তোমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এখন তুমি জয়ী।

তোমার সঙ্গে কোনো তর্কে যাব না। তবে তোমার সব কথা সত্যি নয়। বাসুদেব আমার অনুমানকে মিথ্যেও বলতে পারলে না তুমি। আমার মন ভাঙার জন্যে এই মিথ্যে গল্পটা করলে কেন, জানতে খুব ইচ্ছে করছে।

তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না। কিন্তু একদিন বিশ্বাস করবে। তুমি সত্যিই কৌন্তেয়। যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ।

কথাটা কর্ণকে পুনরায় চমকে দিলো। অস্ত্র-পরীক্ষার রণভূমিতে কুন্তীর সেই মূর্ছিত মুখখানা কল্পনায় দেখতে লাগল। পরশুরামের সন্দেহের কথা মনে পড়ল। বিশ্বাসের ভূমি হিমবাহের মতো গলতে শুরু করল। হু হু করে মনের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে গেল। সত্যিই কী কুন্তীর কানীন পুত্র সে! কুন্তীর মুখের আদলে তার মুখ, পায়ের গড়ন পর্যন্ত তার মতো। বুকের গভীর থেকে এই সব সাদৃশ্যগুলো কেমন একটা মুগ্ধতার মন্ত্র নিয়ে আসে। তাকে অবহেলা কিংবা হেলাফেলা করার মতো জোর ফুরোয় মনে। কেমন হয়ে যায় সে। বুকের মধ্যে অস্ফুট ব্যথা বাজে এক ধরনের। তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। বহিরঙ্গে না হলেও অন্তরঙ্গে যে সে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল এটা স্পষ্ট অনুভব করল। নিজের ভেতরের অস্থিরতাকে সামাল দেবার জন্যে কর্ণ জোর দিয়ে বলল: আমাকে যাদু করা মুশকিল। নিজে থেকে যাদু হতে রাজি না থাকলে কেউ যে আমাকে যাদু করবে এমনটি হবার জো নেই।

এ কথা বলছ কেন?

এতদিন কেন বলো নি, আমি কৌন্তেয়? কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ যখন আর এড়ানো গেল না; তখন হঠাৎ এরকম অদ্ভুত কথা বলে চমকে দেওয়ার মানে কি? যে জন্ম-পরিচয় চিররহস্যাবৃত ছিল, আরো কিছুকাল রহস্যে ঢাকা থাকলে তো কারো কোনো ক্ষতি হতো না। সত্যি করে বলো বাসুদেব,

কি চাও আমার কাছে ?

কোনো প্রার্থনা নিয়ে আসিনি। কোনো দাবিও তোমার ওপর নেই। আমি যা জানতাম, তোমায় বললাম।

কেন বললে ?

কৌন্তেয় হয়ে সহোদরের সাথে যুদ্ধ করবে। ভাই হয়ে ভাইকে অস্ত্রাঘাত করবে ?

এ তো কোনো নতুন ঘটনা নয়। চিরদিন হয়ে আসছে। ভাইয়ে-ভাইয়ে শত্রুতা, যুদ্ধ, হত্যা কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়। সহোদরের সাথে এরকম লড়াই তো প্রায়ই ঘটে থাকে। আরো একটা ঘটনা যদি তার সংখ্যা বাড়ায় তাতে দোষ কি ?

ঠিক। তবু মানুষের মন তো তাছাড়া পাণ্ডবদের সাথে সিংহাসন, রাজ্য নিয়ে তোমার নিজের কোনো বিবাদ কিংবা বিরোধ নেই। পরের স্বার্থে নিজের নির্দোষ ভাইকে অস্ত্রাঘাত করার ঘটনা পৃথিবীতে বিরল। কৌরবেরা জিতলে তোমার লাভ কি ? কিন্তু কৌন্তেয়রা জয়ী হলে জ্যেষ্ঠের অধিকারে তুমি সিংহাসন পাবে, রাজ্যের অধীশ্বর হবে। একি কম কথা !

বাসুদেব, আমি যুধিষ্ঠিরের মতো লোভী, কিংবা তোমার মতো কপট নই। বন্ধুর বিশ্বাস ভেঙে ইন্দ্রের অমরাবতীও চাই না।

একে তুমি লোভ দেখানো বলো ? জ্যেষ্ঠের অধিকারে তুমি সিংহাসনে বসবে। জননী কুন্তী তোমার অধীর প্রতীক্ষায় আছে। আমি শুধু তাঁর ইচ্ছেটা তোমায় জানালাম।

এই শুভবুদ্ধির উদয় জননীর আরো আগে যদি হতো তা-হলে কোনো সংশয় থাকত না আমার। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক না করে জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে জননী কুন্তী আমার অভিষেক করলেন না কেন ? এই কথাটা আমার হয়ে বাসুদেব জননীকে শুধাতে পার একবার ?

কর্ণ, এখন অভিমানের সময় নয়।

তুমিও মিছিমিছি আমাকে অপমান করছ কৃষ্ণ। গোড়ায় বলেছি আমাকে

যাহু করা মুশকিল। তোমার কোনো কথাই আমি বিশ্বাস করি না। জন্মের সঙ্গে যে বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে, সেই ছিন্নসূত্র আর কোনোদিন জোড়া লাগবে না। আমি অধিরথ পুত্র, জননী—রাধা। এটাই আমার সত্য পরিচয়। এই পরিচয় নিয়ে মরব। কৌন্তেয় পরিচয় বড় লজ্জার, বড় অপমানের কৃষ্ণ। জোড়াতালি দেওয়া মিথ্যা, গোলমেলে বিভ্রান্ত জীবনের প্রতি লোভ নেই আমার।

কৃষ্ণ কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কর্ণের দিকে। মুখে তার রহস্যময় কৌতুক হাসি। পাছে কর্ণের চোখে ধরা পড়ে যায় তাই খুশী খুশী ভাবটা চট করে লুকিয়ে কৃষ্ণ চোখের দৃষ্টি নিরীহ এবং মুখে একটা সপ্রতিভ মধুর স্মিত হাস্যভাব সঞ্চার করে বলল : অথচ কর্ণ কৌন্তেয় বলে জানবে লোকে। এই পরিচয়টা চেষ্টা করলেও, মুছবে না, আবার ছোট করে দেখার চেষ্টা করলেও কুন্তীর গৌরব হানি হবে না। কৌন্তেয় পরিচয়টা তোমার শাঁখের করাত। যেতেও কাটবে, আসতেও কাটবে। এ থেকে তোমার যখন নিষ্কৃতি নেই তখন ফিরে চলো পাণ্ডব শিবিরে। সেইটা তোমার নিজের জায়গা। যুধিষ্ঠির তোমার মস্তকে রাজচ্ছত্র ধরবেন। দ্রৌপদী তোমার সেবিকা হবে। অর্জুন তোমার দেহরক্ষী হবে।

কৃষ্ণ তুমি চুপ কর। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত চির অভাগা আমি। আমাকে নিয়ে তোমার কৌতুক করা সাজে না। আমাকে ভ্রাতৃপ্রীতিতে দুর্বল করে দিও না। কর্তব্যে এন না সংশয়। আমি দুর্যোধন সখা। আমি রাধেয়। কর্ণের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। দীর্ঘকাল পরে কী যেন একটা নেই-এর তীব্র শূন্যতা অনুভব করল। সেই সঙ্গে ভেতরে একটা তীব্র জ্বালা হতে লাগল। সেই জ্বালাটা যেন চাবুক হয়ে ঘোড়ার পিঠে সপাসপ পড়তে লাগল। বেচারা ঘোড়াটাই বা কী করে। মার খেয়ে চিহিঁহিঁ করে কেঁদে ওঠে শুধু।

কৃষ্ণের ওপর একটু আগে যে ভীষণ রাগ এবং বিদ্বেষ ছিল তা আর নেই। এখন তার কারো ওপর রাগ করার অধিকারই যেন নেই। নিজের সম্পর্কে

গৌরব বোধটা যেন তার হারিয়ে গেল। ভেতরটা তার এত অস্থির যে কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হচ্ছিল না। বিচ্ছেদ নয়, দুঃখ্যও নয়, জন্ম-পরিচয়ের রহস্যের কথা ভেবে বড় ভয় করছিল তার। এসব কথা শুনলে রাধার কি হবে ? তাকে জিগ্যেস করা কতখানি উচিত হবে, ভেবে ঠিক করতে পারছিল না।

কুয়াশামাখা অন্ধকার ধীরে ধীরে যখন গড়িয়ে আসছিল চারদিক থেকে, জলস্থল অন্তরীক্ষের সব ছবি যখন হারিয়ে যাচ্ছিল এক রহস্যময় আঁধারে ঠিক তখনই কর্ণের রথ হুড়মুড় করে একেবারে প্রাঙ্গণে এসে ঢুকল। মুখখানায় তার গভীর বিষাদ এবং দুশ্চিন্তা থমথম করছিল।

রথ থেকে নেমে কর্ণ একটা মুহূর্ত দাঁড়াল না। কোনোদিকে তাকালও না। তরতর করে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে রাধার ঘরে হাজির হলো।

কর্ণের আচমকা আগমন রাধাকে একটু অবাক করল। তার উস্কখুস্ক ধূলো-মলিন চুল, উদ্‌ভ্রান্ত চাহনির দিকে চেয়ে রাধার বুকটা ধড়াস করে উঠল। উদ্বিগ্ন গলায় বলল : কর্ণ তোর একি চেহারা হয়েছে ? শরীর খারাপ করেনি তো ? অমন করে হাঁপাচ্ছিস কেন ? কিছু বলবি ? আয়, আমার কাছে এসে বোস।

রাধার মধুর আপ্যায়নে কর্ণের ভেতরে সব রাগ-উত্তেজনা মুহূর্তে গলে জল হয়ে গেল। যা বলবে ভেবে এসেছিল সব গোলমাল হয়ে গেল। তবু তার দু'চোখের দৃষ্টি স্থির। রাধার মুখের দিকে অপলক চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। আর রাধা তার দিকে চেয়ে মুখ টিপে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। হাতছানি দিয়ে ডাকল : পাগল ছেলে, আমার কাছে আয় !

কর্ণ পুতুলবৎ তার দিকে হেঁটে গেল। রাধার বিছানায় শরীরটাকে টান টান করে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। বালিশের ওপর থুতনি রেখে বলল : তোমরা আমার কে ?

রাধা তার গায়ে হাত রাখতে গিয়ে হঠাৎ চমকে গেল। তার ভেতরকার গনগনে রাগের আঁচ টের পেয়ে ভয়ে চুপসে গেল। থতমত খেয়ে গিয়ে

বলল : তার মানে ?

কর্ণ তড়াক করে বিছানায় উঠে বসল। রাধার বড় বড় দু চোখের ওপর নিজের মুখখানা স্থিরভাবে রেখে বেশ একটু উষ্মা প্রকাশ করে গম্ভীর গলায় বলল : বললাম তো তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক কি ?

রাধা বেশ ভয় পেয়েছিল। বুকের ভেতর তার ধুক্‌পুক্ ধুক্‌পুক্ করছিল। থমকানো জিজ্ঞাসা নিয়ে কিরকম বিভোর হয়ে চেয়ে রইল কর্ণের দিকে। মৃদুস্বরে বলল : মা ও ছেলের।

কর্ণ থমকাল। রাধার মুখের থমথমে ভাব লক্ষ্য করে হঠাৎ কোনো শক্ত কথা বলতে সাহস পেল না। পাবে কোথা থেকে ? গর্ভধারিণী হয়েও কুন্তী জননীর কোনো কর্তব্য করেনি ; আর রাধা গর্ভে না ধরেও মায়ের সেবা-যত্ন, আদর, ভালবাসা, স্নেহ মমতা উজাড় করে দিয়ে বড় করেছে। সত্যিকার মা তো সেই। রাধার মমতায় ভরে আছে মন, তার পবিত্র স্নেহে ধন্য হয়ে গেছে জীবন। কোন্ প্রাণে রাধার ওপর নিষ্ঠুর হবে ? কিন্তু তার চিরকালের জানাটা যে কৃষ্ণ মিথ্যে করে দিলো তার কি উপায় হবে ? কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যে তাকে তো জানতে হবে। রাধা এবং কুন্তীর মধ্যে তার সত্যিকারের গর্ভধারিণী কে—এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন রাধা ছাড়া করবে কে ? ইচ্ছে না করলেও তাকে জিগ্যেস করতে হবে। শুরু করাটাই কেবল কঠিন। নিষ্ঠুর হওয়াটা আরো কঠিন।

কর্ণ অনেকক্ষণ নিরুত্তর রইল। রাধা পালঙ্ক থেকে নেমে তার পেছনে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে পিঠে হাত রাখল। অভিভূত গলায় বলল : এতকাল পর তোর মনে হঠাৎ এ ঝড় তুলল কে ? কেউ কিছু বলেছে ?

কর্ণ মাথা ঠাণ্ডা রেখে শান্ত গলায় বলল : সন্দেহের বীজ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। আর বাতাসেই সব বার্তা সবাই জানতে পারে। কিন্তু আমি ওসব বিশ্বাস করি না। তবু একটা মিথ্যে বার বার শুনলে সন্দেহ হয়। কেবল তুমিই পার আমাকে সন্দেহ মুক্ত করতে।

রাধার ভেতরটা একটু চমকাল। কিন্তু কথাটা গায়ে মাখল না। কর্ণের মন

থেকে সংশয়টা ঝেড়ে ফেলার জন্যে বলল : মাঝে মাঝে তোর যে কি হয় বাপু বুঝি না। আজ আবার সেই পুরনো পাগলামিটা শুরু হয়েছে।
মা, তুমি কিছু গোপন করতে চাইছ। চিরদিন আমাকে অন্ধকারে রেখে তোমার কী সুখ বলো তো? আজ তুমি আমাকে কোনো কথা লুকতে পারবে না। যদুপতি কৃষ্ণ আমাকে বলেছে। আমি তোমাদের কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। তুমি আমাকে পেটে ধরনি, মানুষ করেছ। কথাটা সত্যি?
কর্ণের কথা শুনে রাধার মাথাটা ঘুরে গেল। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল বিছানায়। কর্ণই তাকে হাত ধরে বসাল। রাধার মুখ সাদা হয়ে গেল। শূন্য দৃষ্টি। কাঁপা গলায় বলল : এসব কী বলছিস। কর্ণ আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। অবরুদ্ধ কান্নায় থমথম করছিল তার গলার স্বর।
কর্ণ রাধার গা ঘেঁষে বসল। বলল : জননী, চুপ করে থেক না। সত্যি বল, কী হয়েছিল? সংশয়ে রেখ না আমায়।
অল্পসময়ের ভেতর রাধা নিজেকে অনেকখানি সামলে নিল। বলল : কৌতূহল এক অদ্ভুত জিনিস। নিজের সর্বনাশের ভয়কেও মানে না। আমার আজ আর কিছুই হারানোর ভয় নেই। শুধু তোর কষ্ট বাড়বে এই ভেবেই এড়াতে চাইছিলাম। এতকাল পর সত্য জেনে কী লাভ?
কর্ণ থমকে গেল। একটা অজ্ঞাত ভয়ে সে মাথা হেঁট করল। জোর গলায় বলার মতো কিছুই পেল না। চোখ, মুখ, কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। কেমন একটা অদ্ভুত অসহায় দৃষ্টিতে হতবুদ্ধির মতো রাধার দিকে তাকিয়ে রইল।
রাধা নিজের মনে বলল : কী জানতে চাস বল। কী শুনলে তুই খুশি হবি, শান্তি পাবি, আমাকে বল। আমি তোর মা। আমাকে সব কথাই খুলে বল।
কর্ণ অস্থিরভাবে মাথা নাড়তে লাগল। দুঃসহ যন্ত্রণা বুকে চেপে আর্তস্বরে বলল : আমি জানি না। নিজের চোখে যা দেখেছি, দু'হাত ভরে যা পেয়েছি তার চেয়ে বড় সত্য আমার জীবনে আর কিছু নেই। তবু মাঝে মাঝে বিভ্রম হয়। খুব জানতে ইচ্ছে করে আমি কে? কিভাবে আমার জন্ম?

কৃষ্ণ যা বলল, তা সত্যি-কি ?

রাধা কেমন একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। নাভি থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এসে সজোরে বাতাসে আছড়ে পড়ল। আর তাতেই তার বুকটা হাহাকার করে উঠল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চোখের অবশ্যম্ভাবী জলটুকু মুছে নিল আঁচলে। ক্লান্ত স্বরে বলল : তোর মতো আমিও লড়াই করছি নিজের সঙ্গে। খুব সাংঘাতিক ভাবে। তবু সেটা লড়তে হবে আমাকে। শুধু সেটার জন্যেই আমার ভেতরে কিছু দ্বিধা, সংশয়, অস্বাভাবিকতা আছে। কিন্তু অন্য কিছু নেই। মিছিমিছি তুই দুঃখ পাবি, তোর কষ্টটা শুধু বাড়বে।

কর্ণ উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল : মাগো, আর কেউ না জানলেও আমি জানি তোমার মনের অবস্থাটা। আমার কষ্টটা আমার চেয়েও বেশি তোমার লাগে। তবু আমার পিপাসিত অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে আমি সেই মহান তুফানকে বরণ করবার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পৃথিবীর আর কারো কথা নয়, শুধু তোমার কথাই বিশ্বাস করি। মাগো, আমার এক পিঠে তুমি আর এক পিঠে পাণ্ডব জননী কুন্তী। আমার সমস্ত সত্তাকে ছিন্নভিন্ন করছে। মনে হচ্ছে আমি এখন দ্বিখণ্ডিত। কৃষ্ণের কাছে আমার জন্ম রহস্য জানবার আগে যে জীবন দিলো, তোমার কথা শোনবার পর আর এক জীবনের সূচনা হবে। কেমন হবে এই দ্বিতীয় জন্ম কে জানে ?

কর্ণের প্রমত্ত বিলাপ, তার অশান্ত অস্থিরতা রাধাকে চমকে দিলো। তার বুকের ভেতর একটা ব্যথা স্পন্দিত হতে লাগল। কর্ণ সত্যি সহ্য করতে পারবে তো? তার কথা ভেবে রাধার মন অস্থির এবং মাথাটা কেমন পাগল হলো। ধরা গলায় বলল : সত্যি তোকে আমি পেটে ধরিনি। এখনও জানি না। পাণ্ডুমহিষী কুন্তীর বলে ভাবলে কুন্তীর, কিন্তু যদি না ভাবি তবে কার জানি না ?

এই কথাটাই কতবার কতভাবে তোমার কাছে জানতে চেয়েছি। কিন্তু তুমি এড়িয়ে গেছ মা। কোনোদিন সত্যিকথাটা বলোনি।

তাতে হয়ত সত্যটা প্রকাশ পেত কিন্তু প্রতিকার কিছু হতো না। পেটে না

ধরলে কি মা হওয়া যায়? যেখানে সন্তানের সঙ্গে জননীর স্নেহের সম্পর্ক নেই, ভালবাসা নেই, অধিকার বোধ নেই, আবেগ নেই, মায়া নেই, মমতা নেই, আছে শুধু একটা সম্পর্ক। সম্পর্কের সেই সংস্কারটাই বড়!

এরকমই একটা আবেগ কর্ণের ভেতরে মাথা কুটে কুটে একটা বেরোবার পথ খুঁজছিল। রাধা সেই আবেগকে মুক্ত করে দিলো। গদ্‌গদ হয়ে বলল: না, মা। না। যার কাছ থেকে সারা জীবন উপেক্ষা, অবহেলা, অপমান আর নিষ্ঠুরতা পেলাম, সে কোনোকালে মা হয় না। পাণ্ডুমহিষী কুন্তী আমার কেউ নয়। সে আমার পরম শত্রু। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সত্যি একটা সংস্কার ছাড়া কিছু নয়। দুর্ভাগ্য কাঁটার মতো ঐ সম্পর্কটা বিঁধে থাকবে বাকী জীবনটা। এটা যে কত কষ্ট আর একটা মানুষের জীবনে কত বড় অপমান তা যদি জানতে—? মা-গো জীবন কী বিচিত্র! ঘটনার কী আকস্মিক পরিবর্তন। যার সাথে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই, যাকে কিছুমাত্র জানি না, চিনি না, দেখি না, সে এক দুর্লভ আসনে সমাসীনা আমার গর্ভধারিণী জননী। আর যে তুমি প্রাণ উজাড় করে দিয়ে আমায় ভালবাসলে, বাঁচালে পালন করলে তার সাথে আমার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। তবু কি আশ্চর্য, গার্ভধারিণীর প্রতি কোনো টান কিংবা মমতা অনুভব করছি না, বরং এক দুরন্ত ঘৃণা, আর বিতৃষ্ণায় ভরে যাচ্ছে মন। মা-গো, আমি চিরদিন রাধেয় আছি, রাধেয় হয়েই থাকব। এর অধিক গৌরব আর কিছু নেই। রাধাকে দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে কর্ণ কথাগুলো বলল।

রাধা পিপাসার্তের মতো মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল কর্ণের মুখের দিকে। বলল: আজ আমি ভারমুক্ত হলাম। এক দুর্লভ আনন্দের মধ্যে পেলাম আমার চিরঅপরাজেয় বীর পুত্র কর্ণকে। যে লক্ষ লোকের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সত্যকে সত্য বলতে ভয় পায় না, ঘৃণাকে ঘৃণা করে, সুন্দরকে সুন্দর বলে, শুভকে অভিনন্দন জানায় তার জননী হওয়ার এই গর্ব সুখ আমার কোনোদিন যাবে না। আমার সব গর্ব আজ তোকে নিয়ে। কর্ণ কৌন্তেয় হয়েও রাধেয় অথচ।

১০

নিজেকে নিয়ে কর্ণের বিস্ময়ের কোনোদিন শেষ হবে না। এবং সেই সঙ্গে তার জানাটাও। কখন কীভাবে যে ঘটে যায় তার জীবনে সে নিজেও জানে না। অতর্কিতে এত দ্রুত সব ঘটে যায় যে তার কিছু করার থাকে না। সত্যিই থাকে না। নিজে একটা ঘটনার জন্যে কতখানি দোষী বা অপরাধী সেই বিবেচনাটুকু আর কারো কাছে নয় পিতামহ ভীষ্মের কাছে প্রত্যাশা করেছিল। অথচ, কার্যকালে দেখা গেল পিতামহ তার প্রতি সুবিচার করল না। আসন্ন কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁর যা কিছু ভালো লাগা, মন্দ লাগা, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, আবেগ-উত্তেজনা তা শুধু তাকে ঘিরেই। সেজন্যেই কর্ণের মনটা ভালো ছিল না।
বিশেষ করে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার সময় সব কিছুই যখন দ্রুত করার আয়োজন চলছে তখন এই যুদ্ধ বাধার সব দোষটা তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে পিতামহ ভীষ্ম বলল: রাধেয় তোমার প্রবল অর্জুন-বিদ্বেষ এই অশান্তির হেতু। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের কারণ হলে তুমি। দুর্যোধনও এযুদ্ধ চায়নি।
ভীষ্মের কথার ঝাঁঝের মধ্যে তার মনের বিরূপতা গোপন ছিল না। বিতৃ-ষ্ণার হাওয়া লেগে দপ্ করে জ্বলে উঠল। বুক জুড়ে রাগের ঝড় বয়ে গেল। ভেতরে উত্তুঙ্গ সেই পিশাচ রাগ লুপ্ত করে দিলো তার কাণ্ডজ্ঞান। উচিত অনুচিত বোধ। বলল : পিতামহ, কোনোদিন প্রীতির চোখে দেখেন না। চিরদিন তাঁর অবহেলা আর নিষ্ঠুর বিদ্রূপ পেয়ে মনটাই বিদ্রোহ হয়ে গেছে! শ্রদ্ধা বিনয় ভালো কথা আমার মুখে আসে না আর। তাঁর এধরনের অভিযোগ এবং দোষারোপ লাভ করা আমার কাছে কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু যেটা সত্যিই বিস্ময়ের তা হলে জেনে শুনে তিনি সত্যের অপমান

করেছেন।

ক্রোধে ভীষ্মের ভুরু বঙ্কিম হলো। দুই চোখ বিস্ফারিত হলো। মুখে থম-থমিয়ে উঠল অপমান। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলল : সত্যব্রতধারী ভীষ্মকে কথার কৌশলে তুমি মিথ্যেবাদী বললে।

কর্ণ তৎক্ষণাৎ বলল : এই যুদ্ধ যে পাণ্ডব দূত কৃষ্ণ মনেপ্রাণে চেয়েছিল আপনার চেয়ে সেকথা ভালো কেউ জানে না। আত্মীয় জ্ঞানে দুর্যোধন কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করলে সে নিষ্ঠুর বাক্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করল। দুর্যোধনকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু অপমান করে আর দুর্বাক্য বলে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলল। এই যুদ্ধ বাঁধার জন্যে আর কেউ নয়, কৃষ্ণই শুধু দায়ী। কৃষ্ণ একটু চাইলেই এ যুদ্ধ কিছুতে হতো না। কৌরবদের নানাভাবে অভিযুক্ত করে সে যদি দোষী এবং অপরাধী না করত তা-হলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও সন্ধি প্রস্তাবে রাজি হতেন। সেটুকু বোঝার মতো ক্ষুরধার বুদ্ধি আপনার যে নেই এটা জানা ছিল না।

ভীষ্ম থমথমে মুখে কিছুক্ষণ সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল। তারপর কর্ণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল : প্রকৃত সত্য গোপন করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে তোমার কোনো লজ্জা হলো না। শোন দুষ্ট, এই যুদ্ধের বীজ বপন হয়েছিল শান্তিগৃহে বৈষ্ণবযজ্ঞে। যজ্ঞের অগ্নি সাক্ষী রেখে প্রতিহিংসা-বশে তুমি কী শপথ করেছিলে, মনে আছে? অর্জুনকে বধ না করা পর্যন্ত পা ধোবে না, জলগ্রহণ করবে না। এতেও তোমার অন্তর তৃপ্তি হলো না। অর্জুনের হিংসায় উন্মাদ হয়ে আসুর ব্রত উদ্‌যাপন শুরু করলে অর্জুনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তুমি এই ব্রত করবে। যে কোনো প্রার্থী যা চাইবে, তাকে তাই দান করবে। দানশীলতার ভাবমূর্তি দিয়ে তোমার ভেতরের অসুরটাকে লোকচক্ষে ঢেকে রাখতে চেয়েছ। দান হলো তোমার প্রবল অর্জুন বিদ্বেষ গোপনের ছলনা। পাছে অর্জুন হত্যার শপথ ভঙ্গ হয় তাই তুমি কৃষ্ণকে রজ্জুবদ্ধ করতে দুর্যোধনকে প্ররোচিত করেছ। তুমি হলে মূর্তিমান পাপ। কৌরবের দুষ্টগ্রহ। দুর্যোধনের শনি।

আচমকা একটা রাগ চড়ে গেল কর্ণের মাথায়। নিজেকে তার ভীষণ অপমানিত মনে হলো। দুঃখে, ক্ষোভে ভেতরটা তার পাগল পাগল লাগল। দুর্যোধনের অযাচিত বন্ধুত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে এ কোন্ কলংক তাকে মাথায় নিতে হলো ? ভীষ্ম যাই বলুক, সে চিরকাল দুর্যোধনের ভালো চেয়েছে, ভালো করেছে, নিজের প্রাণ দিয়ে তাকে আগলে রেখেছে। সে চাওয়াটা এতই সত্য ছিল যে তার জন্যে নিজের সুখ, আরাম, শান্তির দিকে এমনকি পরিবারের দিকে ফিরেও তাকায় নি। তবু কৌরবংশের স্তম্ভ স্বরূপ পিতামহ ভীষ্ম তাকে এমন কলংক এবং দুর্নাম দিলো যে, তা মুছবে না। কৌরব পাণ্ডবের আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে সে নিরুৎ-সাহবোধ করল। তার অসীম গুরুত্ব কর্ণের কাছে অর্থহীন হয়ে গেল। নিরুদ্ধ অভিমান আর অপমানে তার ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। অকস্মাৎ ঝড় উঠলে গাছপালাগুলো যেমন অস্থির হয়ে পড়ে তার ভেতর-টাও তেমনি এলোমেলো হয়ে গেল। হাহাকার বেজে উঠল। চারদিক থেকে উন্মাদ বাতাস ছুটে এসে সব কিছু যেমন উড়িয়ে নিয়ে যায় ধুলো বালিতে আচ্ছন্ন করে দেয় তেমনি ভীষ্মের কথাগুলো তার অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। বুদ্ধি বিবেচনা লুপ্ত হলো। একটা উন্মাদ রাগে হারিয়ে গেল তার সত্তা। এমনকি অহংবোধ পর্যন্ত। কর্ণের কানে ঝড়ের উন্মাদ শব্দের মতো ভীষ্মের কথাগুলো ঝংকারে বাজতে লাগল। অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে ভীষ্মের শেষের অভিযোগগুলি তার মর্মে প্রবেশ করছিল। কিছু-ক্ষণ সে স্তব্ধ, বাক্যহারা হয়ে থমথমে মুখে চেয়ে রইল। ব্যথাহত বেদনায় দিশাহারা হয়ে বলল : বেশ, আমি যখন কুগ্রহ, সখা দুর্যোধনের শনি, তখন কুরু-পাণ্ডবের মহা সমরের সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াব না। আমার কোনো স্বার্থই যখন নেই তখন ভাইয়ে ভাইয়ের এই যুদ্ধে আমি থাকব না। কোনোরকম অংশগ্রহণ করব না।

কর্ণের এরকম একটা অদ্ভুত প্রতিজ্ঞায় ভীষ্মও দারুণ আশ্চর্য হলো। দুর্যোধন আঁৎকে উঠল। বলল: সখা, রাগের বশে তুমি এ অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা

করলে কেন? পিতামহের তিরস্কারটা দেখলে তাঁর অনুরক্তিটা দেখলে না। এরকম একটা সংকল্প করার আগে আমার কথাটা একবারও ভাবলে না। রাগের মাথায় তুমি যে কথা বলেছ সে তোমার মনের কথা নয়। ফিরিয়ে নাও তোমার সংকল্প।

কর্ণের বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় দেখা দিল। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর একটা অভিভূত আচ্ছন্নতা নিয়ে বলল : সকলের মধ্যে আমাকে অপদস্থ করা পিতামহের কি খুব ভালো কাজ হলো? এতে যে আমাকে অপমান করা হয় একথাটা তিনি বুঝলেন না?

ভীষ্ম ভুরু কুঁচকে যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল। তবু অভি-যোগ থেকে উৎপন্ন এক ক্রোধে অকপট বিস্ময় প্রকাশ করে বলল : সুন্দর অভিনয় করতে জান। তুমি কি মনে করেছ যুদ্ধে তুমি না থাকলে দুর্যোধন ভীষণ দুর্বল এবং অসহায় হয়ে পড়বে? নিজেকে এতবড় বীর ভাবার কোনো কারণ নেই। কৌরবপক্ষে তোমার চেয়ে অনেক বড় যোদ্ধা এবং বীর আছে এখনও। তাদের কাছে তুমি কিছু নও। মিছেই আত্মশ্লাঘা কর। দুর্যোধন তোমাকে যে সম্মানই দিক, আমি তোমাকে এক অর্ধরথীর বেশি ভাবি না। তুমি ভেব না, দুর্যোধনের উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা শুনে ভীষ্ম গলে গিয়ে তোমার পিঠ চাপড়ে বলবে, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। তোমার কথা ফিরিয়ে নাও। সংকটের সময় ঐক্য চাই জানি। তবু নিজের সম্মানের বিনিময়ে কখনো সেরকম সংহতি চাইব না। একা ভীষ্মই পারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মোকাবিলা করতে।

কথাগুলো কর্ণের বুকের ভেতরে টনটন করে গিয়ে লাগল। দুর্যোধনের কথায় যে আগুন নিভে গিয়েছিল হঠাৎ রাগের বাতাস লেগে তা দপ্ করে জ্বলে উঠল। বলল : আপনার এত অহংকার। নিজেকে নিয়ে আপনার যখন এত গর্ব! তাহলে শুনে রাখুন পিতামহ, যতদিন আপনি জীবিত থাকবেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ অস্ত্র ধরবে না। আপনার মৃত্যুর পর সখা দুর্যোধনের স্বার্থে অস্ত্র ধরব।

যুদ্ধের দিন যত নিকট হতে লাগল কুন্তী ততই অস্থির হলো। কারণ তার ভয় কর্ণকে। কর্ণের বুকে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। পাণ্ডব বিদ্বেষে গনগন করছে। সে আগুন নেভানোর সাধ্য নেই কারো। কৃষ্ণও পারে নি। কেবল মনের অভ্যন্তরে তার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বীজ বুনেছে, অনুরাগের দীপ জ্বেলে দিয়েছে। কুন্তীকে তার ফলটুকু আহরণ করে আনার পরামর্শ দিয়েছে কৃষ্ণ। পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণের জন্যে এটুকু কুন্তীকে যে কোনো মূল্যে আদায় করতে বলেছে কৃষ্ণ। কিন্তু কোন্ মুখে তার সামনে দাঁড়াবে? কি বলবে তাকে? কর্ণ কী রকম অবজ্ঞার চোখে তাকাবে তার দিকে, কে জানে? জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যাকে ত্যাগ করেছে, যার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই গড়ে ওঠে নি, তার কাছে মায়ের দাবি নিয়ে দাঁড়ানোর মতো নির্লজ্জ ঘটনা পৃথিবীতে আর হয় না। জননীর অভিনয় করে তার প্রাণের মূল্যে পঞ্চ-পাণ্ডবের প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার মতো নিষ্ঠুর বিবেকহীন কাজ করতে কৃষ্ণ তাকে বলছে কেন? মাতৃস্নেহ বঞ্চিত চির অভাগা কর্ণ জননীর কাছে পায়নি কিছুই। কোন্ প্রাণে তাকে আজ ঠকাবে? কর্ণকে পাওয়ার যোগ্যতা তার নেই হয়ত, কিন্তু ঠকিয়ে আঘাত করলে তাকে পবিত্র মাতৃত্বের সম্পর্ক নোংরা হয়ে যাবে। পৃথিবীর সব জননীরা ছিঃ ছিঃ করবে তাকে।

কি যে করবে কুন্তী ভেবে পেল না। ভাবতে গেলে মাথার ভেতর ঝাঁ-ঝাঁ করে। ভেতরটা ছিন্নভিন্ন হয়। তার অবস্থা দেখে কৃষ্ণ বলেছিল : এভাবে ছায়ার সঙ্গে লড়ে লড়ে ক্লান্ত হওয়া কোনো মানে হয় না। এক জীবনে তো কত ঘটনাই ঘটে। তার সব কিছু কি মনে থাকে? মনে রাখার মতো ঘটনা খুবই কম। তবু জীবনে যা কিছু ঘটে তা নিজ কৃতকর্মেরই ফল। তার ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, পারা-না পারা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামানো কিংবা দুঃখিত হওয়ার মতো কিছু নেই। এটাই বাস্তব, এবং একান্ত সত্য। আবেগ নিয়ে মাথা ঘামায় দুর্বল মানুষেরা।

কৃষ্ণের কথাগুলো তার বুক আলোড়িত করল। কথা বলতে পারল না। চুপ করে থাকল। কথাগুলোর একটা নিজস্ব দ্যুতি ছিল যা তার মনের

আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠল। নিজেকে নিয়ে কুন্তী ধাঁধায় পড়ল। নিজের অজান্তে তার বিবেকবান জননীর অন্তঃকরণ যে কখন পঞ্চপাণ্ডবের কল্যাণ কামনায় হেরে গেল, নিজেই জানল না। কর্ণের কাছে যেতে সত্যিই তার লজ্জা করছিল ভীষণ। কিন্তু একটা দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি এবং শান্তি চাই- ছিল ভীষণ ভাবে। সেই চাওয়াটা বিবেকের দরজা বন্ধ করে দিয়ে মনের মুক্তির দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কুন্তী জানতেও পারল না।

তখন সবে ভোর হয়েছে। নিঃশব্দে সূর্য প্রণামরত কর্ণের সামনে এসে দাঁড়াল কুন্তী। চক্ষুমুদিত কর্ণের ধ্যান সমাহিত স্তব্ধ, শান্ত, গম্ভীর, সৌম্য মূর্তির অপরূপ কান্তি ও তেজের দিকে বিমোহিত হয়ে চেয়ে রইল কুন্তী। অনন্তকাল ধরে দেখলেও এ দেখার যেন তৃপ্তি হয় না।

এই প্রথম কুন্তী তাকে খুব কাছ থেকে চোখ ভরে দেখল। কর্ণ তার গর্ভজ- পুত্র। কিন্তু তাকে দেখে বুকের মধ্যে কোনো উথলে ওঠার ভাব হলো না। আত্মজা আবেগে বুকটা থরথর করে কেঁপেও উঠল না। কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না তার ভেতরে। কেবল দেখার একটা তীব্র ভালো লাগার আবেশ চোখে লেগে রইল। আসলে, কর্ণের সঙ্গে পুত্রের কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি তার। সে তার গর্ভজপুত্র এই বিশ্বাস ও সংস্কার প্রতি রোমকূপ দিয়ে অনুভব করার মতো কোনো অনুভূতি সঞ্চারিত হলো না। পুত্র বলে ভাবলেই তবে পুত্র, কিন্তু যদি না ভাবে তবে কেউ নয়। সন্তানের সঙ্গে জননীর যে স্থায়ী কোনো সম্পর্ক নেই, আত্মজা একটা সংস্কার মাত্র এই বোধ ও অনুভূতি কর্ণের মুখোমুখি না দাঁড়ালে কোনোদিন জানাই হতো না। নকুল, সহদেব গর্ভজপুত্র নয়। তবু তাদের জন্যে অন্তরে যে স্নেহ-মমতা, উৎকণ্ঠা উথলে ওঠে—কর্ণের জন্যে তার কিছুই হয় না। অথচ কর্ণ প্রথম সন্তান তার। প্রথম সন্তানের প্রতি জননীর সবচেয়ে মমতা বেশি। সবচেয়ে প্রিয়। তবু চোখের আড়ালে অন্যের আশ্রয়ে মানুষ হওয়ার জন্যে কোনো আবেগ তৈরি হয় নি। সে যে তার পুত্র এই অনুভূতিটা

কেবল তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে একটু একটু করে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। হঠাৎ ঝড়ে ঘরের ছাদ উড়ে গেলে যেমন অসহায় লাগে, কিংবা অঙ্গচ্ছেদ হলে মানুষ যেরকম হতভম্ব এবং বিহ্বল হয়ে পড়ে ঠিক তেমনই একটা বিস্ময়বোধ আপ্লুত করে রাখল তাকে।

কর্ণের সূর্য স্তব শেষ হলে ধীরে ধীরে চোখ মেলল। সম্মুখে অবগুণ্ঠিতা বয়স্কা এক রমণীকে তার মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে ভরে গেল তার অন্তর।

আকাশ থেকে সূর্যের পবিত্র আলো চুঁইয়ে এসে পড়ে রমণীর মুখের ওপর। কিন্তু একটা গভীর বিষাদ এবং উৎকণ্ঠা থমথম করছিল তার চোখে মুখে। রমণীর চোখে পলক পড়ল না। অনড় এক পুতুলের মতো যেমন চেয়েছিল তেমনি চেয়ে রইল। একটু নড়ল না। কর্ণ অস্বস্তিবোধ করল। খুব সহজ কণ্ঠে বলল : জননী কোথা হতে এত ভোরে কোন্ প্রার্থনা নিয়ে এলে অভাগা সন্তানের কাছে? দাতা কর্ণ বড় রিক্ত আজ। বলো, কী প্রার্থনা তোমার?

পুত্র, কুন্তী আমি।

চমকানো বিস্ময়ে কর্ণ বলল : তুমি অর্জুন জননী!

আমি জননী তোমার।

কর্ণের অধর বঙ্কিম হলো। বুকের মধ্যে নানারকম বিস্ফোরণ ঘটে গেল। কত রকম অভিযোগ অনুযোগ উথলে উঠল। এক সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে যেন বেরিয়ে আসতে চাইল। নিরুচ্চারে মা-মা করল। ইচ্ছে করল মা বলে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে—মা-গো সেই ফিরলে আমার কাছে, কিন্তু বড় দেরী করে এলে। এখন বোধহয় এই ফেরার কোনো মানে হয় না। বড় স্বার্থপরের মতো এসেছ। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না। এক জ্বালাধরা অভিমানে তার মুখ গনগন করতে লাগল। জ্বালাভরা চোখে কুন্তীর দিকে চেয়ে রইল।

কর্ণের বিস্ময় কুন্তীকে বিব্রত কিংবা অবাক করল না। কোনোরকম লজ্জায় সে আড়ষ্ট হলো না। কোনো অনুশোচনাও ছিল না তার ভেতর। কিংবা হারানো পুত্রকে ফিরে পাওয়ার কোনো অনুভূতি হলো না। মাতা পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন একটা দূরত্ব তৈরী হয়েছিল। দু'জনের কেউ সেই বাধাটা কাটিয়ে পরস্পরের কাছে সহজ হতে পারছিল না। তাই কথা বলার সময় কুন্তীর গলার স্বরটা অস্বাভাবিক ভাবে কেঁপে গেল। বলল : পুত্র কতরকম বাধা আর লজ্জা থাকে জীবনে। সে সব এড়িয়ে তোমার কাছে পৌঁছতে শুধু দেরী হয়ে গেল। এ আমার দোষ নয়। সবই অদৃষ্টের। জীবনের সব কিছুই একটা নির্ধারিত সময়ে হয়। সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। গাছের কুঁড়ি ধরা, ফুল ফোটা, ফল হয়ে ওঠা, তারপর ঝরে পড়া সব কিছুর জন্যে ঋতু এবং সময়ের অপেক্ষা করতে হয়। পাতা ঝরার দিনে ডালে কুসুম ফোটাতে চাইলে কি তা ফোটে কখনও ?

কর্ণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আহত অভিমানে বলল : সহজ কথাটা সহজ করে বলতে এত কথার জাল বোনার কোনো দরকার ছিল ? এ তো একটা নাটক হলো। সম্পর্কটা স্বাভাবিক এবং সুস্থ না হলে কথা দিয়ে ফাঁক ঢাকতে হয়।

কর্ণের কথাগুলো সূঁচের মতো বিঁধল কুন্তীকে। অসহায়ভাবে বলল : পুত্র, এ তোমার অভিমানের কথা। তোমার সঙ্গে আমার নাড়ীর বন্ধন। এর ভেতর কোনো ফাঁক, ফাঁকি কিছু নেই। নিজেকে বোঝাতেই কথাগুলো বলেছি। তোমার কাছে আমি অচেনার মতোই।

কর্ণ বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে বলল : সে কথাটা যদি জেনেই থাক তা-হলে এমন সুন্দর সকালে নিজেকে কোন্ স্বার্থে চেনাতে এলে ? কী দরকার ছিল তার? জীবন সায়াহ্নে এই চেনাচিনি, জানাজানির কোনো প্রয়োজনও ছিল না।

পুত্র তুমি অসহিষ্ণু হয়ো না।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কর্ণ বলল : আমি এত নাটক বুঝি না। ভাগ্যের হাতে মার

খাওয়া এক ডানা ভাঙা পাখি। ওড়বার জন্যে মস্ত আকাশটা চোখের সামনে পড়ে আছে, কিন্তু সেখানে ডানা মেলে উড়ব সেই শক্তিটুকু আমার নেই।

বৎস, তোমার সব আছে, কিছুই হারাওনি তুমি। আমার সব উজাড় করে দিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

কথাগুলো শুনে কর্ণের বুকের মধ্যে নিঃশব্দ হৃদয় ভাঙা হাহাকার উঠেছিল। পঞ্চপাণ্ডবের তীব্র অপমানকর কথাগুলো, তাদের অজস্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, তিরস্কার এ জীবনে আর কোনোদিন ভুলতে পারবে না। গর্ভধারিণী কুন্তীর প্রতিও সন্তানের কোনো বিশেষ বোধও আর নেই তার অন্তরে। স্বার্থের সময়, চাইবার সময়, সব মানুষই আসে। তখন বদলে যায় তার ভেতরটা। সুন্দর সুন্দর কথা বলে। মুগ্ধ করে। কিন্তু এ সব কথায় কর্ণ তার অতীতকে ভুলে যাবে না। কুন্তী তাকে কি দিয়েছে? তার মমতা মাখানো কথায় গলে যাওয়ার সময় নয় এটা। এখন তার শক্ত হবার, নিষ্ঠুর হবার সময়। মনকে শক্ত করে বলল: এড়িয়ে যাবার যারা, তারা এড়িয়েই যায় চিরকাল। আমার শিক্ষা যা হওয়ার তা তো হয়েছেই, তবু কেন তুমি ফেরাতে এলে। কোন্ অধিকারে এসেছ?

পুত্রের দাবিতে।

আমি তো কোনোদিন তোমার পুত্র ছিলাম না। কোনো সম্পর্কও ছিল না আমার তোমার সঙ্গে। যা ছিল না, তা আছে বলে মনে করে নিজেকে বিভ্রান্ত করার মতো মূর্খতা আমার নেই। তোমার সাথে আমার যে সম্পর্ক সেটাকে সম্পর্ক বলা যায় কিনা জানি না। তবে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্যে নিশ্চয়ই কোনো একটা সম্পর্ক তো ছিল। কিন্তু তার কোনো বন্ধন ছিল না। তুমি আমি দু'জনেই মুক্ত ছিলাম যে যার নিজের মতো। বিনিসুতোর মালার মতো মাতা পুত্রের সেই সম্পর্কটা থাকবে কিসের ওপর? কেউই আমরা কাউকে কিছু দিতে পারব না। তুমি ফিরে যাও মা। তোমাকে দেখে আমি যে মুগ্ধ হয়েছিলাম, অর্জুন জননী জানার পরেই সে মুগ্ধতা

আমার কেটে গেল। যে মাকে দেখে মুগ্ধ হওয়ার পরিবর্তে ক্ষোভ জাগল সমস্ত অন্তর ভরে, তার কাছে ফিরে যাব কোন্ প্রত্যাশায় ?

কুন্তী লজ্জায় মাথা হেঁট করল। মানুষ গভীর ভাবে অপমানিত হলে ভেতর-কার তাপে সে শুকিয়ে যায়। তাম্রাভ হয়ে ওঠে। কুন্তীর মুখচোখে সেই রকম একটা ভাব। চোখের কোণ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গাল বেয়ে পড়তে লাগল। তাতেই কর্ণের মনটা নরম হলো। তার বুকের ভেতর কি যেন সব গলে গলে পড়তে লাগল। কেমন একটা কষ্ট হলো কর্ণের। বলল : জননী, আমাকে ছাড়া আর যদি কোনো প্রার্থনা থাকে তোমার, বলো। একেবারে অসাধ্য না হলে, অবশ্যই পূরণ করব তোমার সাধ।

কুন্তী চমকে তাকাল কর্ণের দিকে। কর্ণের মতো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, অত্যন্ত সাবধানী আত্মসচেতন মানুষেরও কিছু কিছু দুর্বোধ্য দুর্বলতা থাকে, যা তার নিয়তির দিকে তাকে নিঃশব্দে টেনে নিয়ে গেল। জননী সম্পর্কে সেই দুর্বলতাই বোধহয় কুন্তীর প্রতি তাকে সহানুভূতিশীল করে তুলল। কুন্তী মুখ নামিয়ে নীচের দাঁতের ওপর ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আহত গলায় তার অভিমান, অনুশোচনা একসাথে হাহাকার করে উঠল। বলল : চাইবার কোনো অধিকার আমার নেই। তোমার কাছে নিজেকে কোনো দিক দিয়ে আর ছোট করতে ইচ্ছে হয় না। মানুষের মনকে দেখানোর কোনো আয়না নেই, থাকলে দেখতে পেতে কী দুঃসহ যন্ত্রণায় আর অনুশোচনায় আমার ভেতরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কী সাংঘাতিক অপরাধবোধে আমার হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে। অথচ, সেই বিরাট একটা ভুল আর পাপের ওপর আমার কোনো হাত ছিল না। মানে সেই অপরাধের পেছনে।

দুর্ভাগ্য হলো একজন অপরাধ করে, আর তার ফলভোগ করে আর একজন।

বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল কুন্তীর। চোখ বুজে বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে সে লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল! বলল : এ ভগবানের লীলা। অদৃষ্টের

খেলা। এটা জানার ক্ষমতা বা যোগ্যতা যদি থাকত সবার তাহলে কোনো জটিলতা থাকত না। এক সুখের পৃথিবীতে মানুষ জীবনটা কাটাত।

কর্ণ নিস্পৃহ গলায় বলল : বেলা বাড়ছে। সূর্যের তেজ প্রখর হচ্ছে। চলো তোমাকে পৌঁছে দিই।

আশাভঙ্গতায় ছাই হয়ে গিয়ে বলল : পুত্র শূন্য হাতে ফিরে যাব। আমি যে অনেক আশা করে এসেছি।

মাথা হেঁট করে হাসল কর্ণ। ।বলল : স্নেহ-ভালবাসা, মমতার আসন কার ঘরে পাতা থাকে তা অলক্ষ্যে থেকে সব যিনি দেখেন, তিনিই এসব জানেন। যেখান থেকে পাওয়ার ছিল, সেখান থেকে শূন্যতা নিয়ে ফিরতে হলো, আর যেখানে প্রত্যাশার কিছুমাত্র ছিল না সেখান থেকে পূর্ণ হয়ে উঠলাম।

গভীর বিষাদ নেমে এল কুন্তীর মুখে। দু'চোখের কোণে জল চিকচিক করে এল। বলল : আমাকে ক্ষমা করে দাও পুত্র। আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। তোমার কাছে আমার অনেক অপরাধ।

কর্ণ তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলানোর জন্যে বলল : যা হয়ে যায় ক্ষমা করলে কি তা শোধরানো যায়? ওসব কথা থাক। তুমি অন্য কথা বলো।

কুন্তীর চোখে মুখে কেমন একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠল। অপত্যস্নেহে নয়, সে যেন আরো অন্য কোনো শক্তি, সাহস আহরণ করছিল জীবনের সব শেকড় থেকে। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল : তোমার সব ঝগড়া আমার সঙ্গে। আমি তোমার শত্রু। আমাকে তুমি ঘেন্না কর। আমার ও তোমার সম্পর্কটাও স্বীকার কর না। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সৌভ্রাত্রের বন্ধুত্বের থাকবে এই প্রতিশ্রুতি দাও। বল, তাদের সব অপরাধ দোষ তুমি মার্জনা করবে। বিপদের দিনে, জীবনের চরম দুঃসময়ে ভাই বলে বুকে টেনে নেবে। কথা দাও।

কর্ণ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল কুন্তীর মুখের দিকে। এ কোন্ মায়াবিনী-নারীকে কুন্তীর মধ্যে দেখল? কুহকিনী মায়ায় ভুলিয়ে যে তার বিবেক, মনুষ্যত্ব ধর্ম হরণ করতে এসেছে তাকে জননী বলবে কি করে? কুন্তীর

সঙ্গে তার সন্তানের কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তাই এত স্বার্থপর।
কর্ণের একটা সত্তা মুছে ফেলে আর একটা সত্তায় যেতে কর্ণের একটু সময় লাগল। কারণ তার সমস্ত মনটা যখন কুন্তীর দিকে ফিরতে ব্যগ্র তখন আচমকা কুন্তীর স্বার্থপরের মতো প্রার্থনা তাকে বেশ অবাক করল। মনে হলো এ কুন্তী শত্রুপক্ষের কোনো ছলনাময়ী রমণী। জননীর ভূমিকায় অভিনয় করছে। সে তার কেউ নয়। পঞ্চপাণ্ডবের জননী। পাণ্ডবের মধ্যে অগ্রজের অধিকারে ফিরিয়ে নিতে আসাটা তার মিথ্যে কথা। পঞ্চপাণ্ডবের জন্যে তার উদ্বেগ এবং দুর্ভাবনা ছিল কিন্তু তার নিরাপত্তার কোনো চিন্তা ছিল না। থাকবে কেন? সে শুধু তার শরীর থেকে জাত। সেই অধিকারেই এসেছে পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণ ভিক্ষা করতে। আত্মার কোনো টান নেই তার প্রতি। বরং কুন্তীর ভেতরে এক কঠিন উপেক্ষা ও বঞ্চনাকে খুব স্পষ্ট ও গভীর করে টের পায়। মনটা বিদ্রোহ হয়। নিজের গর্ভজ পুত্রকেই কুন্তী পরম শত্রু ও পঞ্চপাণ্ডবের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরে নিয়েছে। শুধু তার ক্ষমা পেলেই তারা নিরাপদ। কুন্তীর নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা তার কাছে খুব বিরক্তিকর লাগল। অপমানে মুখ তার লাল হলো। তবু দাঁতে দাঁত চেপে সে তার ভেতরের অপমান এবং যন্ত্রণা রুখতে লাগল। কেমন এক গভীর শূন্য চোখে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর একটা শ্বাস ছেড়ে বলল: এই কথাটা বলার জন্যে এসেছ! কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কোনোদিন ছিল না, যা আছে বৈরিতার সম্পর্ক। সে তো মন থেকে কথা দিয়ে মুছে দেওয়া যায় না। মুছে ফেলতে সময় লাগে। অন্য মানুষ হয়ে উঠতে হয়। সে সুযোগ কিংবা অধিকার তুমি কি দিয়েছ?
ওরা কথা না বলে পাশাপাশি হাঁটছিল। কুন্তীকে হতাশ এবং নিরাশ হতে দেখে কর্ণের বড় কষ্ট হচ্ছিল। বুকের পাষাণভার তখনও সবটুকু নেমে যায় নি। নানা ঘটনার পাল্টা স্রোত তাকে অনেক দূর ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে প্রত্যয়ের ভূমিতে ফিরতে একটু সময় লাগল। চলতে চলতে মনে হলো কুন্তী জীবনে সহ্য করেছে কম নয়। কুমারীর জীবনেই তার মনে

এক ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, বিবাহও সুখের হয় নি, স্বামীর সাথে নির্বাসনের কষ্ট ভোগ করেছে, চোখের ওপর স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু দেখেছে, বহু পুরুষের কামনার শিকার হয়েছে, পুত্রদের সঙ্গে দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসের দুর্ভোগ সহ্য করেছে, এখনও এক অনিশ্চিত ভাগ্যফলের দিকে চেয়ে আছে। তার মতো দুঃখী কেউ নয়। সবচেয়ে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিন্দিত, ধিকৃত এই জননীর প্রতি সে হঠাৎ এক অপরিমেয় দুর্বলতা অনুভব করল। যা ব্যাখ্যার অতীত, যা যুক্তিহীন। এই দুর্বলতা ঠিক মাতা-পুত্রের সম্পর্কের নয়। অন্য কিছু। দুঃখী মানুষের প্রতি করুণা এবং সহানুভূতিবোধ থেকে উৎসারিত এক ধরনের দরদ। এই দরদটুকু না থাকলে মানুষ হওয়া নিরর্থক।

যদিও কুন্তীর সব ইচ্ছেকে কাদার মতো অবহেলায় মাড়িয়ে যাওয়ার একটা সুখ ছিল মনে, তবু অভাগিনী জননীর মলিন বিষণ্ণ আশাহত মুখখানির দিকে তাকাতে তার ব্যথা বাজছিল বুকে! এক পরিব্যাপ্ত হতাশার মধ্যে বেঁচে থাকার সত্যি কোনো জৌলুস নেই। যুদ্ধের পরিণাম অনিশ্চিত। একটা প্রতিশ্রুতিতে যদি সে পাণ্ডবদের কাছে বড় হয়ে যায়, তার দয়ায় যদি তাদের জীবন ধন্য হয়, উদ্ভাসিত হয়, তাদের কৃতজ্ঞ করে তাহলে মহান হওয়ার এতবড় সুযোগ ছেড়ে দেবে কেন? মরণের প্রতিশ্রুতিতে তার গায়ে যদি জৌলুসের চিহ্ন একটু লাগে, কুন্তি যদি একটু সুখী হয়, শান্তি পায়, মহান হওয়ার সুযোগ যদি ঘটে যায় তার, তাহলে সেটুকু করবে না কেন? লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : দাতা কর্ণ কোনো প্রার্থীকে ফেরায়নি কোনোদিন। তোমাকেও বিমুখ করবে না। রণক্ষেত্রে একমাত্র অর্জুন ছাড়া আর কাউকে আমি হত্যা করব না, তীর স্পর্শও করব না।

কুন্তী চমকে তাকাল কর্ণের দিকে। চমকানো বিস্ময়ে বলল : পুত্র অর্জুন তোমার অনুজ সহোদর।

কর্ণের মুখে উজ্জ্বল হাসির দীপ্তি। বলল : আমার পরম বৈরী সে। অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে জীবন মরণ লড়ব। অর্জুন

এবং কর্ণের মধ্যে একজনকে তোমায় হারাতে হবে। তুমি চিরদিন পঞ্চ-পুত্রের জননী থাকবে।)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আজ এগারো দিন।
(যুদ্ধে কৌরবপক্ষের প্রথম সেনাপতি ভীষ্ম।) এই বৃদ্ধ বয়সেও বীর বিক্রমে এক অসাধারণ যুদ্ধ করছে। তাকে সাহায্য করছে কর্ণ ছাড়া আর সকলেই। তার নির্দেশেই যুদ্ধ হচ্ছিল। সেই ভয়ংকর যুদ্ধ সামাল দিতে পারছিল না পাণ্ডবেরা। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যে তাদের বিপুল সৈন্য, রথ, অশ্ব, হস্তী হারাতে হলো। অর্জুন ও কৃষ্ণের পক্ষে যুদ্ধ সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ভীষ্মের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে অর্জুনের সব প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়ে গেল। অবশেষে তাকে রক্ষা করতে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না এই ভীষণ শপথ ভঙ্গ করে ভীষ্মকে উন্মাদের মতো আক্রমণ করল।)
যুদ্ধের প্রতিটি দিন ভীষ্মের পরাক্রম এবং অসাধারণ সমর পরিচালনা এবং রণকৌশল স্মরণীয় হয়ে রইল। এতবড় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারা ভাগ্যের কথা। কিন্তু কর্ণের ভাগ্য তাকে সেই গৌরব থেকে বঞ্চিত করে রাখল। আপসোসে কর্ণের বুক ফেটে গেল।
ভীষ্মদ্যুতি মলিন করার সাধ্য পাণ্ডবপক্ষের নেই। ভীষ্মকে পরাভূত করার শক্তি কৃষ্ণার্জুনেরও নেই। ভীষ্মের পরাজয় কিংবা মৃত্যুরও কোনো সম্ভাবনা নেই। ভীষ্ম একাদশ দিনের সমরে যে কোনো বীর্যবান যুবকের চেয়ে শক্তি-শালী, ক্ষিপ্রগতি সম্পন্নও কষ্ট সহিষ্ণু। একটানা যুদ্ধে এখনও অক্লান্ত। এত-বড় শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও বিরাট গোধন হরণের যুদ্ধে অর্জুনের শরে ভীষ্ম মূর্ছা গেল কী করে সেটাই কর্ণের কাছে রহস্যের। আর সেই কারণেই ভীষ্মকে যুদ্ধে অশক্ত অক্ষম এক বৃদ্ধ মনে করে কিছুদিন আগে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং হেয় করার জন্যে তার ভীষণ অনুশোচনা হতে লাগল। ভীষ্মকে ছোট করতে গিয়ে সে নিজেই তার কাছে অনেক ছোট হয়ে গেল। হেরে গেল। নিজের সম্পর্কে অতিরিক্ত গর্ববোধই তার এই দুর্ভাগ্যের হেতু।

আসলে তার অদৃষ্টটাই মন্দ। অদৃষ্ট যে কখন তাকে দিয়ে কি করায় সে নিজেও জানে না। দেওয়ালের দিকে একদৃষ্টিতে কর্ণ চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। কুরুক্ষেত্রে তার প্রয়োজন এবং গুরুত্বকে বোঝাতেই পিতামহের ওপর অভিমানবশতঃ কর্ণ আচমকা শপথ করে বলেছিল, পিতামহের জীবদ্দশায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। সেটা যে তার অন্তরের কথা নয়, অভি-মানের ভাষা সেটুকু অন্তর দিয়ে কেউ অনুভব করল না। নির্বুদ্ধিতার জন্যে প্রত্যেক মানুষকে জীবনভোর দাম দিতে হয়। তাকেও দিতে হলো। নিজের মনে নিরুচ্চারে বলল : আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মানোর মতো কষ্ট আর নেই। অতি বড় শত্রুরও যেন এমন কপাল না হয়। সতর্ক থেকেও জীবনে কোনো কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। যা ঘটার ঠিকই ঘটে যাচ্ছে, আমার যেন কিছু করার নেই।

যুদ্ধ যেভাবে প্রতিদিন সমাপ্ত হচ্ছিল তাতে পাণ্ডবপক্ষ অচিরেই আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়ে সন্ধি প্রস্তাব করবে। এর অর্থ, অর্জুনের সাথে আবাল্য যুদ্ধ করার সাধ থেকে এবারও ভাগ্য তাকে বঞ্চিত রাখল। এটাই কর্ণের একমাত্র দুঃখ। এই অতৃপ্তি প্রতিদিন তাকে অসহিষ্ণু করে তুলল। কিছু ভালো লাগল না। নিজের দোষে সখা দুর্যোধনের কাছে তার গুরুত্ব অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ল। এই চিন্তাটা অনুক্ষণ যেন তাকে দংশন করতে লাগল।

নিজের অজান্তে কর্ণ পিতামহ ভীষ্মের মৃত্যু কামনা করল। ভীষ্মের পতন না হলে সে যুদ্ধ করতে পারবে না। সে যে অর্জুনের চেয়ে বড় যোদ্ধা এই প্রমাণটা বিশ্বজনের কাছে দিতে না পারা পর্যন্ত তার চিত্তে শান্তি ছিল না। ভীষ্ম জীবিত থাকার অর্থ তার মর্যাদা ও গুরুত্বে টান পড়া। পিতামহের বেঁচে থাকাটা কর্ণের আর সহ্য হচ্ছিল না। ভীষ্ম সম্পর্কে তার মনে যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল তার পাত্র দিন দিন শূন্য হতে লাগল। ভীষ্ম প্রকৃতপক্ষে কী চায়? তার দম্ভের প্রতিশোধ নিতে কি পাণ্ডব নিধনে মেতে উঠল? তাকে এভাবে হতাশ করলে কি ভীষ্মের খুব সুখ হয়? ছোট্ট একটা তো আকাঙ্ক্ষা,

সেটাও অপূর্ণ রাখবে ভীষ্ম? প্রতিশোধস্পৃহা ভীষ্মের থাকতেই পারে। হয়তো যুদ্ধে অর্জুনকে কব্জায় এনে তাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করে সেদিনকার অবহেলার শোধটা কি ভীষ্ম তুলতে চায়?

একা থাকলে এই সব কথায় মনটা তোলপাড় করে ওঠে। তাই মনটাকে নির্বিকার ও কঠিন করার চেষ্টা করল। কিন্তু একটা দুর্বোধ্য ঘৃণায়, ঈর্ষায় সে মুখ বিকৃত করল। স্বাদটা তেতো লাগল।

ভাবতে ভাবতে দিনগুলো কেটে যায়। যুদ্ধের আজ একাদশ দিন। ইচ্ছে করছিল কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। পরক্ষণেই নিজেকে প্রবোধ দিতে বলল: মনের এই চপলতা মানায় না। এখন স্থির থাকার সময়। যথাসম্ভব সংযত থাকতে হবে নিজেকে। এ তার অনুশীলনের কাল। যুদ্ধে একটানা জয় কিংবা একটানা পরাজয় বলে কিছু নেই। যে কোনো মুহূর্তে বদলে যেতে পারে অবস্থা। অহেতু এই সব উত্তেজনা মাথায় নিয়ে নিজেকে অশান্ত ও ব্যস্ত করার কোনো মানে নেই।

পদ্মার সাথে এই নিয়ে তার কত কথা কাটাকাটি, মান অভিমান হয়েছে। অকারণ তাকে তিরস্কার করল। বলল: তুমি মেয়েমানুষ। রণক্ষেত্রের বোঝ কী?

পদ্মা কিছুমাত্র রাগ করল না। শান্তভাবে বলল: আমার বুঝে কী হবে? আমি তো যুদ্ধ করব না আর। কেবল তুমি একটু শান্ত হও।

আমাকে ঘাঁটিয়ো না। ভালো লাগছে না।

লাগবে কোথা থেকে? এক এক সময় মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পায়। ভেবে কোনো কূল-কিনারা হয় না। শুধু মন খারাপ হয়, উত্তেজনা বাড়ে। তোমার এখন সেই অবস্থা। নিজে অশান্তি ভোগ করছ, আমাকেও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছ না।

তোমাকে অশান্তিতে থাকতে বলেছে কে?

বোঝার সে মন থাকলে, বুঝতে।

পদ্মার কথাটা গভীরভাবে তাকে স্পর্শ করল। হঠাৎ-ই মনের ভেতর কী

সব যেন গলিয়ে দিয়ে গেল। পদ্মার মুখের দিকে অপলক চেয়ে রইল কেমন করুণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে। কণ্ঠস্বরে কর্ণের আহত অভিমান বেজে উঠল। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল : খুব নিষ্ঠুর আমি তাই না? সারা জীবন ধরে শুধু নিজের কথা ভেবেছি ; নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি। তোমার যে একটা মন আছে, আলাদা সত্তা আছে, চেয়েও দেখলাম না। মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে তোমার পাশে একটু বসি। ছায়ার মতো তোমার সাথে ঘুরি, তোমার গায়ের ঘ্রাণ নিই ; নরম কোমল হাতের একটু স্পর্শ নিই। খুব ইচ্ছে হয়, একান্তে কাছে বসে খুব অস্পষ্ট একটু অলংকারের টুং টাং আর বসনের খসখস, শব্দ শুনি। বড় বাসনা হয় ঐ অপরূপ চোখের ওপর চোখ রেখে জীবনটা কাটিয়ে দিই। কিন্তু বিধাতা আমার কপালে সে সুখ লেখেনি। তবু সাধ হয়। কিন্তু আমার এ সাধ কখনো পূরণ হবে না। 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।'

পদ্মা কর্ণের এই সভ্য ভাষণে তার নির্লজ্জতার কোনো চিহ্ন পেল না। বরং মানুষটার লুকনো কষ্ট দেখে তার চোখ দুটো ভিজে গেল। কর্ণের চোখের ওপর চোখ রেখে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের মধ্যে কেমন এক অচেনা ব্যথা চিন চিন করতে লাগল।

পদ্মা চারদিকে চেয়ে দেখল। কেউ নেই। খুব কোমলভাবে কর্ণের বুকের ওপর হাত রাখল। কর্ণ তার হাতখানা চেপে ধরে কী এক গভীর তৃপ্তিতে চোখ বুঝল। মনে হচ্ছিল তার ভেতরটা ভরে যাচ্ছে।

স্বামী স্ত্রীর অপূর্ব মিলনে হঠাৎ বাধা পড়ল। দ্বাররক্ষীর সতর্ক ঘোষণায় তার চমকে বিচ্ছিন্ন হলো। পদ্মা একটু লজ্জা পেল।

প্রহরীর সতর্কতাসূচক ঘোষণার অল্পকাল পরে দুর্যোধনের বার্তাবাহক এসে সংবাদ দিলো, তৃতীয় পাণ্ডবের শরে জর্জরিত হয়ে পিতামহ ভীষ্ম ধরাশায়ী হয়েছেন। যুবরাজ দুর্যোধন ভেঙে পড়েছেন। আপনাকে শরণ করেছেন তিনি

সংবাদটা শুনে কর্ণ ভীষণ উল্লসিত হলো। তার অন্তরের সে উপচে পড়া

আনন্দ আর খুশী নিয়ে কর্ণ হঠাৎ মুক্তির সুখে যেন চেঁচিয়ে উঠল। বলল : পদ্মা, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। পিতামহ ভীষ্ম আর নেই। এর চেয়ে বড় মুক্তির খবর আমার কাছে কিছু নেই। আমার পথের কাঁটা এতদিনে দূর হলো। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেতে আমার কোনো বাধা রইল না আর। আমার অনন্তকালের স্বপ্ন পূর্ণ হবে এবার। পদ্মা, এক আকাশে দুই সূর্য যেমন ধরে না, তেমনি এক বসুন্ধরায় কর্ণ, অর্জুনের সহাবস্থান হয় না। হয় অর্জুন, না হয় কর্ণ একজন থাকবে পৃথিবী আলো করে।

পদ্মার ভুরু কুঁচকে গেল। কর্ণের রকম সকম দেখে মৃদু স্বরে ভর্ৎসনা করে বলল : ছিঃ। তুমি কী পাগল হলে? এরকম একটা মর্মান্তিক দুঃসংবাদে তুমি উতলা না হয়ে উৎফুল্ল হচ্ছ! তোমার মন বলে কি কিছু নেই? পিতামহ সবার নমস্য। তাঁকে শ্রদ্ধা করতে না পার, কিন্তু অশ্রদ্ধা করা তোমার মানায় না। ঈর্ষায়-প্রতিহিংসায় তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ। তুমি আর প্রকৃতিস্থও নও। প্রতিশোধের নেশা তোমাকে পেয়ে বসেছে। তোমার এই ভয়ংকর মত্ততা দেখে আমার ভীষণ ভয় করছে। তুমি অন্ধের মতো আত্মহননের পথে ছুটে চলেছ। জানি না আমার কপালে কী আছে?

কর্ণ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : তুমি যা দেখছ তাই বলছ কিন্তু আমি বড় হতভাগ্য। পাণ্ডবদের উজ্জ্বল দ্যুতির পাশে তারার মতো মিটমিট করছি। ক্ষমতা প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব থাকতেও আমি কোনোদিন তার স্বীকৃতি পেলাম না। কেউ আমাকে আমল দিলো না। চিরদিন উপেক্ষিত থাকলাম, অবহেলা পেলাম। কারো কাছে আমি কোনো আলাদা সম্মান পাইনি, দুর্যোধন ছাড়া কেউ স্বীকৃতি দেয়নি, তাই আমার বিদ্রোহ মানুষের সব অবহেলা, উপেক্ষার বিরুদ্ধে। জীবনে কোনো অভিনন্দন স্তুতি আমার জন্যে নয়। নিন্দে, অপবাদের কপাল আমার। চারপাশের মানুষরাই আমার ভেতরটা তেতো আর বিষাক্ত করে তুলেছে। কিন্তু এর সব দোষ কি আমার একার পদ্মা? যারা আমার মনকে বিষিয়ে তুলল, শান্তি কেড়ে নিল; তাদের কোনো দোষ নেই? এই মানুষের সঙ্গে আমার যদি কোনো

আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে না ওঠে তাহলে সে দোষ কার? বলো পদ্মা, কার পাপে আর দোষে এমন হয়ে উঠলাম? আমি তো ভালো চেয়েছিলাম। কিন্তু কেউ আমার ভালো চাইল না। চাইলে, কুরুপাণ্ডবের এই যুদ্ধ হতো না। ভাই ভাইকে হত্যার আনন্দে মেতে উঠত না। পিতামহের সবচেয়ে প্রিয়তম যে অর্জুন, তার নির্মম মৃত্যুবাণে তাঁকে এমন করে ভূমিতে শয্যা গ্রহণ করতে হতো না। পদ্মা, এ এক সর্বনাশা যুদ্ধ। এখানে ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের প্রেম নেই। গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা নেই। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর বিশ্বাস নেই। জননীর বুকে সন্তানের জন্যে একটু মমতা পর্যন্ত নেই। ভাল-বাসার পুকুর শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে পৃথিবীটা। শুধু কর্ণের চোখে জল। কর্ণ কাঁদে একা।